

আয়াতুল্লাহ্ মুহাম্মদ তাকী মিসবাহ্ ইয়াযদী

بسم الله الرحمن الرحيم



আক্বা'য়েদ শিক্ষা

মূলঃ
আয়াতুল্লাহ্ মুহাম্মদ তাকী মিসবাহ্ ইয়াযদী
অনুবাদঃ
মুহাম্মদ মাঈন উদ্দিন

প্রকাশনায়ঃ
আহ্‌লে বাইত (আঃ) বিশ্ব সংস্থা

আমুজেশে আক্বা'য়েদ (আক্বা'য়েদ শিক্ষা)
মুলঃ আয়াতুল্লাহ্ মুহাম্মদ তাকী মিসবাহ্ ইয়াযদী।
অনুবাদঃ মুহাম্মদ মাঈন উদ্দিন।

প্রকাশনায় ঃ
আহ্‌লে বাইত (আঃ) বিশ্ব সংস্থা।

প্রকাশ ঃ
আরাবী ১৪২৪
বাংলা ১৪১০
ইংরাজী ২০০৩

মুদ্রনে ঃ
লেইলা।

সংখ্যা ঃ ২০০০

Aqaeid Shekka (Teaching of Ideology).

Written by : Aiahtullah Mohammad Taqi Masbah yeazdi.
Translated by : Mohammad Main Uddin.
Published by : The Ahalul Bayte (a.s.) World Assembly.
Published On : 1424 Ad, 1414 Bd, 2003 En.
Printing by : Leila
Edition : First.
Copies : 2000.
ISBN: 964-7756-53-4

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড (খোদাপরিচিতি)

১ম পাঠ ঃ দ্বীন অর্থ কী ? (১৯-২৫)
দ্বীনের ধারণা/২১ দ্বীনের মৌলাংশ এবং গৌণাংশ/২১ বিশ্বদৃষ্টি এবং মতাদর্শ/২২
ঐশ্বরিক বিশ্বদৃষ্টি এবং বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি/২২ ঐশী ধর্মসমূহ এবং তাদের মূলনীতিসমূহ/২৩

২য় পাঠ ঃ দ্বীনের অনুসন্ধান (২৭-৩৩)
অনুসন্ধানের উদ্দীপকসমূহ/২৯ দ্বীনের অনুসন্ধানের গুরুত্ব/৩১
একটি ভুল ধারণার অপনোদন/ ৩৩

৩য় পাঠ ঃ প্রকৃত মানুষ হওয়ার শর্ত (৩৫-৪১)
ভূমিকা/৩৭ মানুষ উৎকর্ষে পৌছাতে চায়/৩৮
বুদ্ধিবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষ উৎকর্ষে পৌঁছতে পারে/৩৯
বুদ্ধিবৃত্তি প্রসূত বিধি-বিধান, তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল/৪০ উপসংহার/৪০

৪র্থ পাঠ ঃ বিশ্বদৃষ্টি মৌলিক সমস্যাসমূহের সমাধান (৪৩-৫০)
ভূমিকা/৪৫ পরিচিতির প্রকারভেদ/৪৫ বিশ্বদৃষ্টির প্রকারভেদ/৪৬
সমালোচনা ও ত্রুটিনির্দেশ/৪৭ সিদ্ধান্ত/৪৯

৫ম পাঠ ঃ খোদাপরিচিতি (৫১-৫৬)
ভূমিকা/৫৩ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচিতি/৫৩ ফিতরাতগত পরিচিতি/৫৪

৬ষ্ঠ পাঠ ঃ খোদা পরিচিতির সরল উপায় (৫৭-৬৩)
খোদাকে চিনার উপায়সমূহ/৫৯ সরল উপায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ/৬০ পরিচিত নিদর্শনসমূহ/৬১

৭ম পাঠ ঃ অনিবার্য অস্তিত্বের প্রমাণকরণ (৬৫-৭৩)
ভূমিকা/৬৭ প্রমাণের বিষয়বস্তু/৬৭ সম্ভাব্যতা ও অনিবার্যতা/৬৮ কার্য ও কারণ/৭০
কারণের অসীম ধারাবাহিকতা অসম্ভব/৭১ যুক্তির অবতারণা/৭২

৮ম পাঠ ঃ আল্লাহর গুণসমূহ (৭৫-৮৩)
ভূমিকা/৭৭ আল্লাহর অনাদি ও অনন্ত হওয়া/৭৮ না-বোধক গুণ/৭৮
অস্তিত্বদানকারী কারণ/৮০ অস্তিত্বদানকারী কারণের বিশেষত্ব/৮২

৯ম পাঠ ঃ সত্তাগত গুণাবলী (৮৫-৯২)
ভূমিকা/৮৭ সত্তাগত ও ক্রিয়াগত গুণাবলী/৮৮ সত্তাগত গুণাবলীর প্রমাণ/ ৮৯
জীবন/৮৯ জ্ঞান/৯০ ক্ষমতা/৯১

১০ম পাঠ ঃ ক্রিয়াগত গুণাবলী (৯৩-১০০)
ভূমিকা/৯৫ সৃজনক্ষমতা/৯৭ প্রতিপালনক্ষমতা/৯৮ প্রভুত্ব/৯৯

১১ তম পাঠ ঃ অন্যান্য ক্রিয়াগত গুণাবলী (১০১-১০৮)
ভূমিকা/১০৩ প্রত্যয় বা ইচ্ছা/১০৩ প্রজ্ঞা/১০৫ ভাষা/১০৬ সত্যবাদিতা/১০৭

১২ তম পাঠ ঃ বিচ্যুতির কারণসমূহের পর্যলোচনা (১০৯-১১৪)
ভূমিকা/১১১ বিচ্যুতির কারণসমূহ/১১১ মানসিক কারণ/১১২ সামাজিক কারণ/১১২
চিন্তাগত কারণ/১১৩ বিচ্যুতির নির্বাহকসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম/১১৪

১৩ তম পাঠ ঃ কয়েকটি ভুল ধারণার অপনোদন (১১৫-১২১)
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন অস্তিত্বে বিশ্বাস/১১৭
সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভীতি ও অজ্ঞতার ভূমিকা/১১৮
কার্যকারণ বিধি কি একটি সার্বিক বিধি?/১১৯ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সংগ্রহ/১২০

১৪ তম পাঠ ঃ বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টি এবং এর ত্রুটি নির্দেশ (১২৩-১২৯)
বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টির মূলনীতিসমূহ/১২৫ প্রথম মূলনীতির পর্যালোচনা/১২৬
দ্বিতীয় মূলনীতির পর্যালোচনা/১২৭ তৃতীয় মূলনীতির পর্যালোচনা/১২৭
চতুর্থ মূলনীতির পর্যালোচনা/১২৮

১৫ তম পাঠ ঃ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও তার ত্রুটিনির্দেশ (১৩১-১৩৮)
যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ/১৩৩ বৈপরীত্য নীতি ও এর সমালোচনা/১৩৪
দৈবাৎ নীতি ও এর সমালোচনা/১৩৬ বিপ্রতী পদ্বয়ের বিবর্তননীতি ও এর সমালোচনা/১৩৭

১৬ তম পাঠ ঃ আল্লাহর একত্ব (১৩৯-১৪৬)
ভূমিকা/১৪১ আল্লাহর একত্বের প্রমাণ/১৪৩

১৭ তম পাঠ ঃ তাওহীদের অর্থ কী ? (১৪৭-১৫৫)
ভূমিকা/১৪৯ বহুত্বের অস্বীকৃতি/১৪৯ যৌগিকতার অস্বীকৃতি/১৪৯
প্রভুসত্তার সাথে অতিরিক্ত গুণাবলী সংযোজনের অস্বীকৃতি/১৫০ ক্রিয়াগত একত্ববাদ/১৫১
স্বাধীন প্রভাব/১৫২ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত/১৫৩ একটি ভুল ধারণার অপনোদন/১৫৪

১৮ তম পাঠ ঃ জাব্‌র ও এখতিয়ার (১৫৭-১৬৫)
ভূমিকা/১৫৯ এখতিয়ারের ব্যাখ্যা/১৬১ জাব্‌রবাদীদের ভ্রান্ত ধারণার জবাব/১৬৩

১৯ তম পাঠ ঃ ক্বাযা ও ক্বাদার (১৬৭-১৭৬)
ক্বাযা ও ক্বাদারের তাৎপর্য/১৬৯ তাত্ত্বিক এবং প্রত্যক্ষ ক্বাযা ও ক্বাদার/১৭০
মানুষের এখ্‌তিয়ারের সাথে ক্বাযা ও ক্বাদারের সম্পর্ক/১৭১
একাধিক কারণের প্রভাব/১৭২ ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন/১৭৪
ক্বাযা ও ক্বাদারের প্রতি বিশ্বাসের সুফল/১৭৫

২০ তম পাঠ ঃ আল্লাহ্‌র ন্যায়পরায়ণতা (১৭৭-১৮৭)
ভূমিকা/১৭৯ ন্যায়পরায়ণতার তাৎপর্য/১৮০ প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ/১৮৩
কয়েকটি প্রশ্নের জবাব/১৮৫

দ্বিতীয় খণ্ড (পথপ্রদর্শক পরিচিতি)

১ম পাঠ ঃ নবুয়্যতের প্রসংগ কথা (১৯১-১৯৭)
ভূমিকা/ ১৯৩ বিষয়বস্তু আলোচনার উদ্দেশ্য/১৯৪ কালামশাস্ত্রে গবেষণা পদ্ধতি/১৯৫

২য় পাঠ ঃ মানুষের জন্যে ওহী ও নবুয়্যতের প্রয়োজনীয়তা (১৯৯-২০৬)
নবীগণকে প্রেরণের আবশ্যকতা/২০১ মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা/২০২
নবীগণকে প্রেরণের উপকারিতা/২০৪

৩য় পাঠ ঃ কয়েকটি প্রশ্নের জবাব (২০৭-২১৫)
অধিকাংশ মানুষ কেন নবীগণ কর্তৃক হিদায়াত প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন?/২০৯
মহান আল্লাহ কেন বিরোধ ও বিচ্যুতির পথ রোধ করেন নি?/২১১
নবীগণ কেন প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের অধিকারী ছিলেন না?/২১২

৪র্থ পাঠ ঃ নবীগণের পবিত্রতা (২১৭-২২৫)
ওহী যে কোন প্রকার বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষিত থাকার অপরিহার্যতা/২১৯
অন্যান্য ক্ষেত্রে পবিত্রতা/২২২ নবীগণের পবিত্রতা/২২৪

৫ম পাঠ ঃ নবীগণের পবিত্রতার স্বপক্ষে দলিলসমূহ (২২৭-২৩৫)
ভূমিকা/২২৯ নবীগণের পবিত্রতার স্বপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলসমূহ/২২৯
নবীগণের পবিত্রতার স্বপক্ষে উদ্ধৃতিগত দলিলসমূহ/২৩০
নবীগণের পবিত্রতার গূঢ় রহস্য/২৩৩

৬ষ্ঠ পাঠ ঃ কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার জবাব (২৩৭-২৪৭)
পুরস্কার লাভের জন্যে মা'সুমগণের কী অধিকার আছে?/২৩৯
কেন মা'সুমিন পাপ স্বীকার করেছেন?/২৪০
নবীগণের ক্ষেত্রে শয়তানের হস্তক্ষেপ কিরূপে তাঁদের পবিত্রতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে?/২৪০
হযরত আদমের (আঃ) প্রতি বিস্মৃতি ও পাপের অভিযোগ/২৪২
কোন কোন নবীর উপর মিথ্যাচারের অপবাদ/২৪২
মুসা (আঃ) কর্তৃক ক্বিবতীকে হত্যা/২৪৩
মহানবীকে (সঃ) তাঁর রিসালাতের ব্যাপারে সন্দেহ করতে নিষেধ করা/২৪৪

৭ম পাঠ ঃ মু'জিযাহ (২৪৯-২৫৬)
নবুয়্যতকে প্রমাণের উপায়সমূহ/২৫১ মু'জিযাহর সংজ্ঞা/২৫২ অলৌকিক বিষয়সমূহ/২৫৩
প্রভু কর্তৃক সংঘটিত অলৌকিক বিষয়সমূহ/২৫৩
নবীগণের (আঃ) মু'জিযাহর বৈশিষ্ট্য/২৫৫

৮ম পাঠ ঃ কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার জবাব (২৫৭-২৬৩)
মু'জিযাহ কি কার্যকারণ বিধির লংঘন নয়?/২৫৯
অলৌকি বিষয়সমূহের সংঘটন কি আল্লাহর নিয়মের পরিবর্তন নয়?/২৬০
ইসলামের নবী কেন মু'জিযাহ প্রদর্শনে বিরত থাকতেন?/২৬১
মু'জিযাহ কি বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল, না ইক্বনায়ী (পরিতৃপ্তকারী) দলিল?/২৬২

৯ম পাঠ ঃ নবীগণের বিশেষত্বসমূহ (২৬৫-২৭৩)
নবীগণের সংখ্যাধিক্য/২৬৭ নবীগণের সংখ্যা/২৬৯ নবুয়্যত ও রিসালাত/২৭০
উলুল আজম নবীগণ/২৭১ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/২৭২
১০ম পাঠ ঃ জনগণ ও নবীগণ (২৭৫-২৮৩)
ভূমিকা/২৭৭ নবীগণের প্রতি জনগণের প্রতিক্রিয়া/২৭৭
নবীগণের সাথে বিরোধিতা করার কারণ ও প্রবণতা/২৭৮
নবীগণের সাথে বিরোধিতা করার পদ্ধতিসমূহ/২৭৯
সামাজিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আল্লাহর কতিপয় রীতি-পদ্ধতি/২৮১
১১ তম পাঠ ঃ ইসলামের নবী (সঃ) (২৮৫-২৯২)
ভূমিকা/২৮৭ ইসলামের নবীর (সঃ) রিসালাতের প্রমাণ/২৯০
১২ তম পাঠ ঃ পবিত্র কোরানের অলৌকিকত্ব (২৯৩-৩০২)
পবিত্র কোরান হল একটি মু'জিযাহ/২৯৫ পবিত্র কোরানের অলৌকিক বিষয়সমূহ/২৯৭
(ক) ভাষার প্রঞ্জলতা ও বাক্যালংকার/২৯৭ (খ) নবীর (সঃ) উম্মী হওয়া/২৯৯
(গ) সুসঙ্গতি ও বিরোধহীনতা/৩০১
১৩ তম পাঠ ঃ কোরান বিকৃতি থেকে মুক্ত (৩০৩-৩০৯)
ভূমিকা/৩০৫ পবিত্র কোরানে অতিরিক্ত কোন কিছু সংযুক্ত হয়নি/৩০৬
পবিত্র কোরান থেকে কোন কিছু হ্রাস পায়নি/৩০৭
১৪ তম পাঠ ঃ ইসলামের সার্বজনীনতা ও চিরন্তনতা (৩১১-৩১৮)
ভূমিকা/৩১৩ ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম/৩১৪
ইসলামের সার্বজনীনতার স্বপক্ষে কোরানের দলিল/৩১৪ ইসলামের চিরন্তনতা/৩১৬
কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন/৩১৭
১৫ তম পাঠ ঃ নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি (৩১৯-৩২৫)
ভূমিকা/৩২১ নবুয়্যতের ধারার পরিসমাপ্তির স্বপক্ষে কোরানের দলিল/৩২১
নবুয়্যতের ধারার পরিসমাপ্তির স্বপক্ষে হাদীসের দলিলাদি/৩২২
নবুয়্যতের ধারার পরিসমাপ্তির প্রকৃত রহস্য/৩২৪ একটি ভ্রান্ত ধারণার জবাব/৩২৫
১৬ তম পাঠ ঃ ইমামত (৩২৭-৩৩৩)
ভূমিকা/৩২৯ ইমামতের তাৎপর্য/৩৩২
১৭ তম পাঠ ঃ ইমাম থাকার প্রয়োজনীয়তা (৩৩৫-৩৪১)
ভূমিকা/৩৩৭ ইমাম থাকার প্রয়োজনীয়তা/৩৩৮
১৮ তম পাঠ ঃ ইমামের নিয়োগ (৩৪৩-৩৫১)
১৯ তম পাঠ ঃ ইমামের ইসমাত ও জ্ঞান (৩৫৩-৩৬৩)
ভূমিকা/৩৫৫ ইমামের ইসমাত/৩৫৫ ইমামের জ্ঞান/৩৫৭
২০ তম পাঠ ঃ হযরত মাহদী (আঃ) (৩৫৬-৩৭৫)
ভূমিকা/৩৬৭ বিশ্বব্যাপী ঐশী শাসনব্যবস্থা/৩৬৭ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি/৩৬৯
হাদীস হতে একটি দৃষ্টান্ত/৩৭১ লোকান্তর ও এর গূঢ় রহস্য/৩৭২

তৃতীয় খণ্ড (পুনরুত্থান দিবস পরিচিতি)

১ম পাঠ ঃ পুনরুত্থান দিবসের পরিচিতির গুরুত্ব (৩৭৯-৩৮৬)
ভূমিকা/৩৮১ পুনরুত্থান দিবসের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব/৩৮১
পুনরুত্থান দিবস সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি কোরানের গুরুত্বারোপ/৩৮৩
উপসংহার/৩৮৫

২য় পাঠ ঃ পুনরুত্থানের বিষয়টি রূহের সাথে সম্পর্কিত (৩৮৭-৩৯২)
জীবন্ত অস্তিত্বে একত্বতার ভিত্তি/৩৮৯ মানুষের অস্তিত্বে রূহের অবস্থান/৩৯২

৩য় পাঠ ঃ আত্মার বিমূর্তনতা (৩৯৩-৪০০)
ভূমিকা/৩৯৫আত্মার বিমূর্তনতার স্বপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলসমূহ/৩৯৫
কোরান থেকে দলিলাদি/৩৯৮

৪র্থ পাঠ ঃ মাআদ বা পুনরুত্থানের প্রতিপাদন (৪০১-৪০৭)
ভূমিকা/৪০৩ প্রজ্ঞাভিত্তিক দলিল/৪০৩ ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক দলিল/৪০৬

৫ম পাঠ ঃ পবিত্র কোরানে পুনরুত্থান দিবস (৪০৯-৪১৬)
ভূমিকা/৪১১ পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা অযৌক্তিক/৪১১
পুনরুত্থানের সদৃশ ঘটনাবলী/৪১৩ (ক) উদ্ভিদের উদগতি/৪১৩
(খ) আসহাবে কাহফের নিদ্রা/৪১৪ (গ) প্রাণীদের জীবন লাভ/৪১৪
(ঘ) কোন কোন মানুষের পুর্নজীবন লাভ/৪১৫

৬ষ্ঠ পাঠ ঃ পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকারকারীদের প্রশ্নের জবাব (৪১৭-৪২২)
বিলুপ্তির অস্তিত্ব লাভের ক্ষেত্রে অনুপপত্তি/৪১৯
নবজীবন লাভে দেহের অযোগ্যতা বিষয়ক অনুপপত্তি/৪১৯
কর্তার ক্ষমতা সম্পর্কিত অনুপপত্তি/৪২০ কর্তার জ্ঞান সম্পর্কিত অনুপপত্তি/৪২১

৭ম পাঠ ঃ ক্বিয়ামত সম্পর্কে প্রভুর প্রতিশ্রুতি (৪২৩-৪২৯)
ভূমিকা/৪২৫ প্রভুর অনিবার্য প্রতিশ্রুতি/৪২৫ বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের প্রতি ইঙ্গিত/৪২৭

৮ম পাঠ ঃ পরকালীন জগতের বিশেষত্বসমূহ (৪৩১-৪৩৭)
ভূমিকা/৪৩৩ বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরজগতের বিশেষত্বসমূহ/৪৩৬

৯ম পাঠ ঃ মৃত্যু থেকে ক্বিয়ামত (৪৩৯-৪৪৬)
ভূমিকা/৪৪১ সকল মানুষই মৃত্যু বরণ করবে/৪৪১ সমস্ত আত্মার হরণকারী/৪৪২
সহজ ও কঠোরভাবে আত্মার হরণ/৪৪৩
মৃত্যুকালে তওবাহ ও বিশ্বাস স্থাপনের কোন মূল্য নেই/৪৪৩
পৃথিবীতে ফিরে আসার ইচ্ছা/৪৪৪ বারযাখ/৪৪৬

১০ম পাঠ ঃ পবিত্র কোরানে পুনরুত্থানের চিত্র (৪৪৭-৪৬০)
ভূমিকা/৪৪৯ ভূপৃষ্ঠ, সমুদ্র ও পর্বতসমূহের অবস্থা/৪৪৯
আকাশ ও নক্ষত্রসমূহের অবস্থা/৪৫০ মৃত্যু শানাই/৪৫০
জাগরণতুর্য এবং পুনরুত্থানের সূচনা/৪৫১
প্রভুর শাসনব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ এবং পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ/৪৫২
প্রভুর ন্যায়দণ্ড/৪৫২ অনন্ত জীবনের পথে/৪৫৩ বেহেশ্‌ত/৪৫৫ দোযখ/৪৫৭

১১ তম পাঠ ঃ ইহকাল ও পরকালের মধ্যে তুলনা (৪৬১-৪৬৭)
ভূমিকা/৪৬৩ নশ্বর পৃথিবী ও অবিনশ্বর আখেরাত/৪৬৩
আখেরাতের আযাব থেকে নেয়ামতের পৃথকীকরণ/৪৬৪ আখেরাতই মূল/৪৬৫
পার্থিব জীবনকে নির্বাচনের পরিণতি/৪৬৬

১২ তম পাঠ ঃ দুনিয়া ও আখেরাতের সম্পর্ক (৪৬৯-৪৭৬)
ভূমিকা/৪৭১ দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র/৪৭১
পার্থিব বৈভবসমূহ পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধির কারণ নয়/৪৭৩
পার্থিব বৈভবসমূহ পরকালীন দুর্দশার কারণও নয়/৪৭৪ উপসংহার/৪৭৫

১৩ তম পাঠ ঃ ইহ ও পরকালের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি (৪৭৭-৪৮২)
ভূমিকা/৪৭৯ বাস্তব সম্পর্ক না কি স্বীকৃতিমূলক সম্পর্ক?/৪৭৯ কোরানের বক্তব্য/৪৮০

১৪তম পাঠ ঃঅনন্ত সুখ ও দুঃখের ক্ষেত্রে ঈমান ও কুফরের ভূমিকা(৪৮৩-৪৯১)
ভূমিকা/৪৮৫ ঈমান ও কুফরের বাস্তবরূপ/৪৮৬ ঈমান ও কুফরের পরিমাণ/৪৮৭
অনন্ত সুখ ও দুঃখের ক্ষেত্রে ঈমান ও কুফরের প্রভাব/৪৮৮ পবিত্র কোরানের বক্তব্য/৪৯৮

১৫ তম পাঠ ঃ ঈমান ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক (৪৯৩-৪৯৮)
ভূমিকা/৪৯৫ আমলের সাথে ঈমানের সম্পর্ক/৪৯৫
ঈমানের সাথে আমলের সম্পর্ক/৪৯৬ উপসংহার/৪৯৭

১৬ তম পাঠ ঃ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (৪৯৯-৫০৬)
ভূমিকা/৫০১ মানুষের প্রকৃত উৎকর্ষ বা কামাল/৫০২ বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা/৫০৩
উদ্দীপক ও নিয়্যাতের ভূমিকা/৫০৫

১৭ তম পাঠ ঃ কর্ম নিষ্ফল হওয়া ও পাপমোচন (৫০৭-৫১২)
ভূমিকা/৫০৯ ঈমান ও কুফরের সম্পর্ক/৫০৯ সুকর্ম ও দুষ্কর্মের সম্পর্ক/৫১০

১৮ তম পাঠ ঃ বিশ্বাসীদের বিশেষ সুবিধা (৫১৩-৫১৭)
ভূমিকা/৫১৫ পুণ্য বৃদ্ধি/৫১৬ ক্ষুদ্র পাপসমূহের জন্যে ক্ষমা লাভ/৫১৬
অন্যের কর্ম থেকে লাভবান হওয়া/৫১৭

১৯ তম পাঠ ঃ শাফায়াত (৫১৯-৫২৭)
ভূমিকা/৫২১ শাফায়াতের তাৎপর্য/৫২২ শাফায়াতের মানদণ্ড/৫২৪

২০ তম পাঠ ঃ কয়েকটি সমস্যার সমাধান (৫২৯-৫৩৫)
শাফায়াতকে প্রত্যাখ্যানকারী আয়াতসমূহের উপর আলোচনা/৫৩১
মহান আল্লাহ শাফায়াতকারীগণ কর্তৃক প্রভাবিত হবেন না/৫৩১
শাফায়াতকারীগণ মহান আল্লাহ অপেক্ষা অধিকতর দয়ালু নন/৫৩১
শাফায়াত মহান আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতার পরিপন্থী নয়/৫৩২
শাফায়াত আল্লাহর নিয়মের ব্যতিক্রম নয়/৫৩৩
শাফায়াতের প্রতিশ্রুতি মানুষের ঔদ্ধত্যের কারণ নয়/৫৩৩
শাফায়াতলাভের অধিকার অর্জনের জন্যে শর্তসমূহের যোগান হল সৌভাগ্য অর্জনের পথে প্রচেষ্টা/৫৩৪

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين . والصلوة والسلام على خير خلقه محمّد واله الطاهرين . لا سيّما بقية الله في الارضين عجّل الله تعالي فرجه وجعلنا من اعوانه وانصاره.

মৌলিক বিশ্বাস ও চিন্তা সকল মূল্যবোধ ও সুশৃংখল মতাদর্শের ভিত্তি রচনা করে এবং সচেতন অথবা প্রায় সচেতনভাবে মানুষের আচার-ব্যবহারের উপর প্রভাব ফেলে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী মূল্যবোধ ও রীতি-নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহকে মানুষের হৃদয়ে জাগ্রত করতে হবে, যেগুলো এ বিশালদেহী বৃক্ষের মূল বলে পরিগণিত। আর এর মাধ্যমে সুমিষ্ট ও মনোমুগ্ধকর ফল ধারণ করতঃ দু'জগতের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধিত হয় ।

এ কারণেই ইসলামী চিন্তাবিদগণ, ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম শতাব্দীতেই বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে ইসলামী বিশ্বাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করেছেন। যেমনঃ কালামশাস্ত্রবিদগণ বিভিন্ন পর্যায়ের কালামশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। সাম্প্রতিক কালেও নবনব বিভিন্ন অনুপপত্তির উপর ভিত্তি করে (ঐগুলোর জবাব দানের জন্যে) একাধিক পুস্তক লেখা হয়েছে ও সকলের হাতের নাগালে রাখা হয়েছে । কিন্তু প্রায়শঃই এ সকল পুস্তক দু'টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্তরের জন্যে প্রণয়ন করা হয় । এর একটি হল ঃ সাধারণ স্তরের জন্যে যা অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল ভাষায় ও অধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে রচিত হয়; আর অপরটি হলঃ বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর জন্যে, যা জটিল ও তত্ত্বীয় পরিভাষায় বর্ণিত হয়। তবে মধ্যবর্তী স্তরের পাঠকশ্রেণীর জন্যে উপযুক্ত পুস্তকের স্থান শূন্য পড়ে আছে। আর এজন্যে বর্ষ পরম্পরায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এধরনের পুস্তকের অভাব অনুভব করছে।

ফলে 'ইসলামী প্রচার সংস্থার' দায়িত্বশীলদের পরামর্শক্রমে এবং 'দার রাহে হাক' নামক প্রতিষ্ঠানের একদল বিশেষজ্ঞের সহযোগীতায় এ পুস্তকটি প্রণয়নের উদ্ধোগ নিই । এ পুস্তকটির বিশেষত্ব হল নিম্নরূপ ঃ

১। পুস্তকের বিষয়-বস্তু যৌক্তিক বিন্যাস ব্যবস্থার আলোকে শৃংখলিত করার এবং যথাসম্ভব কোন বিষয়ের আলোচনা পরবর্তী পাঠের উপর ন্যস্ত না করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২। পারতপক্ষে সুস্পষ্ট ও সরল ভাষা ব্যবহার করার এবং জটিল ও সংকটময় পরিভাষাগুলো পরিহার করার চেষ্টা করেছি। আর সেই সাথে চেষ্টা করেছি সহজবোধ্য অর্থসমূহকে সাহিত্যালংকারের জন্যে উৎসর্গ না করার ।

৩। কোন বিষয়ের প্রতিপাদনের জন্য নিশ্চিত ও অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট দলিলসমূহ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি । আর একাধিক দলিলের সমাহারকরণ ও দুর্বল দলিলের আকস্মিক উপস্থিতি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছি ।

৪। অনুরূপ অতিরিক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা থেকে যথাসম্ভব দূরে থেকেছি, যা বিদ্যানুরাগীদের ধৈর্যচ্যুতির কারণ হয়। অতএব আশানুরূপ সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি ।

৫। যেহেতু এ পুস্তকটি মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই জটিল ও সুকঠিন দলিল, যেগুলোর জন্যে দর্শন, তাফসির অথবা হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকার প্রয়োজন হয়, সেগুলোর উপস্থাপনা থেকে বিরত থেকেছি। জরুরী ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়েছি এবং ঐ বিষয়ের অন্যান্য সম্পূরক অংশের জন্যে অপর পুস্তকসমূহে অনুসন্ধানের পরামর্শ দিয়েছি, যাতে শিক্ষার্থীদের মাঝে অনুসন্ধান ও গবেষণার মানসিকতা সৃষ্টি হয়।

৬। পুস্তকের বিষয় বস্তু স্বতন্ত্র পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে এবং মোটামুটি প্রত্যেকটি পাঠে সংশ্লিষ্ট বিষয় বস্তুকে স্থান দেয়া হয়েছে।

৭। কোন কোন পাঠের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে পরবর্তী পাঠে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। কখনোবা পুর্নব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কে বিষয়টি উত্তমরূপে স্থান লাভ করে।

৮। প্রতিটি পাঠের শেষে প্রশ্নমালা উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান লাভের পথে সহায়ক হবে। (অনুবাদের সময় ঐগুলো উল্লেখ করা হয় নি)। নিসন্দেহে এ বইটিও ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয় এবং আশা করি সম্মানিত শিক্ষমন্ডলীর পরামর্শ ও সমালোচনার মাধ্যমে পরবর্তী সংস্করণে ঐগুলোকে পরিহার করা হবে ।

পবিত্র ওয়ালী আসরের দরবারে (আমাদের জীবন তাঁর নিমিত্ত উৎসর্গকৃত , আল্লাহ তাঁর আবির্ভাব তরান্বিত করুন) এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু গ্রহণযোগ্য হবে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মহিমান্বিত শহীদগণের নিকট আমাদের ঋণের বোঝা হয়ত কিছুটা লাঘব হবে এ প্রত্যাশা রইল ।

কোম-মোহাম্মদ তাকী মিসবাহ্ ইয়াযদী
শাহরিয়ার ১৩৬৫ সৌর বর্ষ

প্রথম খণ্ড

খোদাপরিচিতি

পাঠ -১

দ্বীন অর্থ কী ?

- দ্বীনের ধারণা
- দ্বীনের মৌলাংশ এবং গৌণাংশ
- বিশ্বদৃষ্টি এবং মতাদর্শ
- ঐশ্বরিক বিশ্বদৃষ্টি এবং বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি
- ঐশী ধর্মসমূহ এবং তাদের মূলনীতিসমূহ

দ্বীনের ধারণা ঃ

এ বইয়ের উদ্দেশ্য হল , ইসলামী মতবিশ্বাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যাকে পারিভাষিক অর্থে 'দ্বীনের মূলনীতি' বলা হয়ে থাকে । ফলে 'দ্বীন' (دين) শব্দটি ও এতদসম্পর্কিত অন্যান্য পরিভাষাসমূহের উপর সর্বাগ্রে সংক্ষিপ্তরূপে আলোকপাত করার চেষ্টা করব । কারণ, যুক্তিশাস্ত্রের মতে কোন বিষয়ের সংজ্ঞাসমূহের স্থান সর্বশীর্ষে।

'দ্বীন' একটি আরবী শব্দ, যার শাব্দিক অর্থ হল অনুসরণ , প্রতিদান ইত্যাদি। পরিভাষাগত অর্থে, মানুষ ও বিশ্বের জন্যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন বলে বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাস সম্পর্কিত যাবতীয় বিধি-নিষেধ হল 'দ্বীন' । দ্বীনের এ সংজ্ঞানুসারে, যারা সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসী এবং সৃষ্টসমূহের সৃষ্টিকে সাংঘর্ষিক অথবা শুধুমাত্র প্রকৃতি ও পদার্থসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল বলে মনে করেন, তারা বিধর্মী বলে পরিচিত । আর যারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন, তাদের মতাদর্শ ও ধর্মানুষ্ঠানগুলো যতই সবিচ্যুতি ও কুসংস্কারাচ্ছন্নই হোক না কেন, তারা সধর্মী বলে পরিগণিত। এ মূলনীতির ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধর্মসমূহকে সত্যধর্ম ও মিথ্যাধর্মে বিভক্ত করা যায় ।

অতএব সত্যধর্ম বলতে বুঝায় ঃ যে ধর্ম সত্যানুসারে ও সঠিক মতবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যে সকল আচার-ব্যবহার পর্যাপ্ত যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে সঠিক ও আস্থাশীল বলে পরিগণিত সে সকল আচার-ব্যবহারের ব্যাপারে সুপারিশ ও গুরুত্ব প্রদান করে ।

দ্বীনের মৌলাংশ ও গৌণাংশ ঃ

দ্বীনের পারিভাষিক ধারণার ভিত্তিতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিটি দ্বীনই কমপক্ষে দু'টি অংশ নিয়ে গঠিতঃ

১। যে সকল বিশ্বাসের উপর দ্বীনের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত

২। ঐ মূলভিত্তিসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত কর্মসূচী ।

অতএব, যথার্থই বলা যায় যে,' মতবিশ্বাস ' হল, দ্বীনের মূল অংশ এবং বিধি-নিষেধ হল দ্বীনের গৌণ অংশ। যেমনঃ ইসলামী পন্ডিতগণ এ দু'টি

পরিভাষাকে ইসলামী মতবিশ্বাস ও বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন ।

বিশ্বদৃষ্টি এবং মতাদর্শ ঃ

বিশ্বদৃষ্টি এবং মতাদর্শ এ পরিভাষাগুলো প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থকে সাধারণতঃ বিশ্বদৃষ্টি বলতে বুঝায় ঃ বিশ্ব ও মানুষ সম্পর্কিত এক শ্রেণীর সামগ্রিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে অস্তিত্ব সম্পর্কে এক শ্রেণীর সামগ্রিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি। আর মতাদর্শ বলতে বুঝায় ঃ মানুষের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে এক শ্রেণীর সামগ্রিক মতামত ।

উপরোল্লিখিত অর্থানুসারে কোন দ্বীনের মৌলিক ও বিশ্বাসগত বিষয়গুলোকে ঐ দ্বীনের বিশ্বদৃষ্টি এবং দ্বীনের সামগ্রিক বিধি-নিষেধগত বিষয়গুলোকে ঐ দ্বীনের মতাদর্শ বলে মনে করা যেতে পারে। অনুরূপ তাদেরকে দ্বীনের মৌলাংশ ও গৌনাংশ রূপে বর্ণনা করা যেতে পারে । কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মতাদর্শ পরিভাষাটি আংশিক বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সেরূপ বিশ্বদৃষ্টিও আংশিক বিশ্বাসসমূহকে সমন্বয় করেনা ।

উল্লেখ্য, 'মতাদর্শ' শব্দটি কখনো কখনো সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয় । তখন বিশ্বদৃষ্টিও এর অন্তর্ভূক্ত বলে পরিগণিত হয় ।

ঐশ্বরিক বিশ্বদৃষ্টি ও বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টি ঃ

মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বিশ্বদৃষ্টি বিদ্যমান ছিল এবং এখনও বর্তমান। তবে অতিপ্রাকৃতিক বিষয়কে গ্রহণ ও বর্জনের উপর ভিত্তি করে এগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ ঐশ্বরিক বিশ্বদৃষ্টি এবং বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি।

পূর্বে বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির অনুসারীদেরকে প্রকৃতিবাদী, এ্যাথিষ্ট (Atheist) কখনো কখনো দ্বৈতবাদী (Dualist) ও নাস্তিক বলা হত। বর্তমানে তাদেরকে বস্তুবাদী বা Materialist নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বস্তুবাদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তবে, অধুনা এগুলোর মধ্যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) সর্বাধিক পরিচিত, যা মার্কসিজমের দর্শনকে রূপদান করেছে ।

ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়েছে যে, বিশ্বদৃষ্টির পরিধি দ্বীনের বিশ্বাসগত অংশ অর্থাৎ আক্বায়েদ অপেক্ষা বিস্তৃততর। কারণ, তা নাস্তিক্যবাদী ও বস্তুবাদী বিশ্বাসকেও সমন্বিত করে থাকে। অনুরূপ, মতাদর্শ পরিভাষাটিও শুধুমাত্র দ্বীনের সমগ্র বিধি-নিষেধের জন্যেই ব্যবহৃত হয়না ।

ঐশী ধর্মসমূহ এবং তাদের মূলনীতিসমূহ ঃ

বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তির স্বরূপ সম্পর্কে ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান । তবে, ইসলামী উৎস থেকে যতটুকু জানা সম্ভব, তার ভিত্তিতে বলা যায় ঃ মানুষের আবির্ভাবের সাথে সাথেই ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং মানব জাতির প্রথম সদস্য হযরত আদম (আঃ) স্বয়ং আল্লাহর নবী , তাওহীদের প্রবক্তা এবং একেশ্বরবাদী ছিলেন। আর অংশীবাদী ধর্মসমূহ সর্বদা বিচ্যুতি এবং সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত লোভ-লালসার ফলে উৎপত্তি লাভ করেছিল ।[১]

একেশ্বরবাদী ধর্মসমূহ, যেগুলো প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বরিক ধর্মসমূহও বটে, সেগুলো সত্যধর্ম বলে পরিগণিত। এ ধর্মগুলো তিনটি সামগ্রিক মূলে অভিন্ন । যথা :

(১) একক প্রভুর প্রতি বিশ্বাস।

(২) প্রতিটি মানুষের জন্যে পরকালীন অনন্ত জীবন আছে বলে বিশ্বাস ও পার্থিব কর্মের জন্যে অর্জিত কর্মফল গ্রহণের

১। বিচ্যুতির উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, কোন কোন দ্বীনের অনুসারীরা অত্যাচারী ও প্রভাবশালীদের সন্তুষ্টির জন্যে দ্বীনকে শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং দ্বীনের আহ্‌কামকে শুধুমাত্র ধর্মীয় কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপকে ধর্মবহির্ভূত কর্ম বলে বর্ণনা করেছেন। অথচ প্রতিটি ঐশী ধর্মই মানুষের ইহ ও পরকালীন কল্যাণের জন্যে সামাজিক ক্ষেত্রে ঐ সমাজের জনগণের দিকনির্দেশনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। তবে মানুষ তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানে একে অনুধাবন করতে অপারগ। এ বিষয়টির ব্যাখ্যা যথাস্থানে বর্ণিত হবে। সর্বশেষ নবী, যিনি মহান প্রভু কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন, সঙ্গত কারণেই বিশ্বজগতের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় আদেশ-নিষেধ ও পরিচিতি, তার (সর্বশেষ নবী) নিকট প্রেরণ করেছেন। আর এ কারণেই ইসলামী শিক্ষার একটা বিশেষ অংশ জুড়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আলোচনার গুরুত্ব বিদ্যমান ।

(দিবসের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

(৩) পরম উৎকর্ষ সাধন এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের পথে মানুষকে পরিচালনার জন্যে মহান প্রভুর নিকট থেকে নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন বলে বিশ্বাস স্থাপন।

এ মূলত্রয় প্রকৃতপক্ষে তিনটি মৌলিক প্রশ্ন, যা প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন মানুষের বিবেকেই বিদ্যমান তারই জবাব মাত্র। প্রশ্নত্রয় নিম্নরূপ ঃ

(১) অস্তিত্ব দান করেন কে ?

(২) জীবনের শেষে কী রয়েছে ?

(৩) কিরূপে জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট কর্মসূচীর পরিচয় পাওয়া যেতে পারে ?

প্রসঙ্গতঃ ওহীর মাধ্যমে জীবন-কর্মসূচীর যে বিষয়-বস্তু নিশ্চিতরূপ লাভ করেছে, সত্যিকার অর্থে তা-ই হল সে ধর্মীয় মতাদর্শ যা ঐশ্বরিক বিশ্বদৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত ।

অপরিহার্য বিষয়সমূহ , অবিচ্ছেদ্য বিষয়সমূহ , নির্ভরশীল বিষয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসমূহ, যেগুলি সামগ্রিকভাবে দ্বীনের বিশ্বাস সমষ্টিকে রূপায়িত করে সেগুলির সমন্বয়ে মৌলিক মতবিশ্বাস গঠিত। আর বিশ্বাসসমূহের বৈসাদৃশ্যই হল একাধিক ধর্ম, ধর্মীয় দল-উপদল ও মাযহাবের উৎপত্তির কারণ। যেমন ঃ কোন কোন নবীগণের (আঃ) নবুয়্যতের ব্যাপারে মতানৈক্যের কারণেই ইহুদি, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে এবং তাদের মতবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমনকি কোন কোন বিষয়, মৌলিক মতবিশ্বাসের (প্রকৃত) সাথেও অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছে। যেমন ঃ খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ, একেশ্বরবাদের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিহীন ; যদিও তারা এর ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেন। অনুরূপ রাসুল (সঃ) -এর উত্তরসূরী নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত হবেন, না জনগণ নির্বাচন করবে?' এ বিষয়ের উপর মতবিরোধের ফলেই শিয়া ও সুন্নী মাযহাবের মধ্যে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে ।

উপসংহারে বলা যায়, তাওহীদ, নবুয়্যত এবং পুনরুত্থান দিবস, এ তিনটি হচ্ছে প্রত্যেক ঐশ্বরিক ধর্মেরই মৌলিকতম বিশ্বাস। তবে এ মূলত্রয়ের বিশ্লেষণের ফলে অর্জিত অথবা তাদের অধীনস্থ অন্যান্য

বিশ্বাসসমূহকেও বিশেষ পারিভাষিক অর্থে মৌলিক বিশ্বাসরূপে গণনা করা যেতে পারে । যেমন ঃ খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসকে একটি মৌলিক বিশ্বাস এবং তাঁর একত্বকে অপর একটি মৌলিক বিশ্বাস হিসাবে মনে করা যেতে পারে । অথবা নবুয়্যতের বিশ্বাসকে সকল ধর্মেরই মৌলাংশ এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর নবুয়্যতের প্রতি বিশ্বাসকে ইসলামের অপর একটি মৌলিক বিশ্বাসরূপে গণনা করা যেতে পারে । যেমন ঃ কোন কোন শিয়া পন্ডিত ন্যায়পরায়ণতাকে (العدل) একটি স্বতন্ত্র মূল হিসাবে মনে করেন, যদিও এটা তাওহীদেরই একটি শাখা । অনুরূপ, নবুয়্যতের অধীন হওয়া সত্ত্বেও ইমামতকে আলাদা একটি মৌলিক বিশ্বাসরূপে গণনা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এধরনের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 'মৌলিক ' শব্দটির ব্যবহার একান্তই পারিভাষিক ও পারস্পরিক সম্মতিভিত্তিক। ফলে, এ ব্যাপারে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই ।

অতএব, 'দ্বীনের মৌলাংশ' শব্দটিকে সাধারণ ও বিশেষ এ দু'টি অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। 'মৌলাংশ' পরিভাষাটির সাধারণ অর্থ 'দ্বীনের গৌণাংশ' অর্থাৎ বিধি-নিষেধ অংশের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং নির্ভরযোগ্য সকল মতবিশ্বাসকে সমন্বয় করে থাকে। আর তার বিশেষ অর্থটি দ্বীনের মৌলিকতম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয়ে থাকে। অনুরূপ, মৌলিক বিশ্বাসত্রয়ের মত সকল ঐশী ধর্মের অভিন্ন বিশ্বাসকে (তাওহীদ, নবুয়্যত, পুনরুত্থান দিবস) দ্বীনের মৌলাংশ (নিরঙ্কুশভাবে) এবং তাদের সাথে অপর এক বা একাধিক মৌলিক বিশ্বাসের সমন্বয়ে 'দ্বীনের বিশেষ মৌলাংশ' অথবা এক বা একাধিক বিশ্বাস ,যেগুলো মাযহাব বা ফিরকার বিশেষত্ব, সেগুলোর সংযোজনের মাধ্যমে কোন মাযহাবের মৌলিক বিশ্বাসরূপে গণনা করা হয়।

পাঠ - ২

দ্বীনের অনুসন্ধান

- অনুসন্ধানের উদ্দীপকসমূহ
- দ্বীনের অনুসন্ধানের গুরুত্ব
- একটি ভুল ধারণার অপনোদন

অনুসন্ধানের উদ্দীপকসমূহ ঃ

বাস্তবতা সম্পর্কে পরিচয় লাভ এবং সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সহজাত প্রবৃত্তি ও ফিতরাতগত চাহিদা মানুষের আত্মিক বিশেষত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা প্রত্যেক মানুষের শৈশবে প্রকাশ লাভ করে এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় থাকে। সত্যানুসন্ধিৎসু এ ফিতরাতকে কখনো কখনো 'অনুসন্ধিৎসু ইন্দ্রিয়ও ' বলা হয়ে থাকে। এ ফিতরাত মানুষকে দ্বীনের কাঠামোর অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য করে এবং সত্য ধর্মকে চিনার জন্যে উদ্যোগী করে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য ঃ

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা বহির্ভূত এবং অবস্তুগত (অদৃশ্য) কোন বিষয়ের অস্তিত্ব রয়েছে কি ? যদি থেকে থাকে , তবে অদৃশ্য জগৎ ও বস্তুজগৎ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক বিদ্যমান? যদি সম্পর্ক থেকে থাকে, তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা বহির্ভূত এমন কোন অস্তিত্ব কি বিদ্যমান, যা বস্তুজগতের সৃষ্টিকর্তা ?

মানুষের অস্তিত্ব কি শুধুমাত্র এ বস্তুগত দেহের সাথেই সংশ্লিষ্ট এবং তার জীবন কি শুধুমাত্র এ পার্থিব জীবনেরও মধ্যেই সীমাবদ্ধ, না কি অপর কোন জীবনের অস্তিত্বও রয়েছে ? যদি অপর কোন জীবনের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তবে ইহ ও পারলৌকিক জীবনের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে? যদি সম্পর্ক থেকে থাকে তবে পার্থিব কোন্ কোন্ বিষয়গুলো পারলৌকিক বিষয়ের উপর প্রভাব ফেলে থাকে ? কিভাবে মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের নিশ্চয়তা দানকারী সঠিক কর্মসূচীর পরিচয় পাওয়া যেতে পারে? সর্বশেষে, ঐ কর্মসূচীটি কী ?

অতএব, সত্যানুসন্ধিৎসু সহজাত প্রবৃত্তিই হল প্রধান কারণ যা মানুষকে সকল বিষয়ের উপর বিশেষ করে ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ের উপর পর্যালোচনার এবং সত্য দ্বীনকে চিনার জন্যে উদ্যোগী করে।

অপর একটি কারণ, যা সত্যানুসন্ধানের প্রতি মানুষের আগ্রহকে বৃদ্ধি করে তা হল সত্যানুসন্ধিৎসা ভিন্ন অপর এক বা এশাধিক ফিতরাতগত কামনা সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট চাহিদাসমূহ পুরণের প্রবণতা, যা বিশেষ পরিচিতিসমূহের অন্তর্ভূক্ত। যেমন ঃ বিভিন্ন বস্তুগত ওপার্থিব বৈভব থেকে লাভবান হওয়ার প্রবণতা যা বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ও অগ্রগতির মাধ্যমে মানুষকে তার কাংখিত

চাহিদা পুরণে সহায়তা করে। অনুরূপ, দ্বীন যদি মানুষের আকাংখা পুরণের, স্বার্থ ও কল্যাণের এবং বিপদ-আপদ ও ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা দিতে পারে, তবে তার জন্যে তাও বাঞ্ছিত হবে।

লাভবান হওয়ার সহজাত প্রবণতা এবং ক্ষতির হাত থেকে পলায়ন প্রবণতা দ্বীন সম্পর্কে অনুসন্ধানের অপর একটি কারণ বলে পরিগণিত । তবে জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি এবং সকল প্রকার বাস্তবতাকে জানার জন্য পর্যপ্ত শর্ত কার্যকর না থাকার ফলে সম্ভবতঃ মানুষ এমন কোন বিষয়কে অনুসন্ধানের জন্যে নির্বাচন করে থাকে যার সমাধান সহজতর এবং যার ফল সহজলভ্য ও অনুভবযোগ্য। অপর দিকে দ্বীন সম্পর্কিত বিষয়সমূহের সমাধান জটিলতর ও কার্যকর কোন গুরুত্বপূর্ণ ফল নেই। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদেরকে বিবেচনা করা থেকে বিরত থাকে। ফলে স্পষ্টতঃই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দ্বীন সম্পর্কিত বিষয়সমূহই বিচার-বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ববহ। এমন কি কোন বিষয়ই বিচার-বিশ্লেষণের জন্যে এ বিষয়গুলোর সমতুল গুরুত্ব রাখে না।

এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, কোন কোন মনোবিজ্ঞানী ও মনোসমীক্ষক বিশ্বাস করেন যে, খোদাভীরুতা হল মানুষের একটি প্রত্যক্ষ ফিতরাতগত চাহিদা এবং তার উৎসকে ধর্মানুভূতি (حس دینی) নামকরণ করতঃ তাকে অনুসন্ধিৎসা, কল্যাণানুভূতি ও সৌন্দর্যানুভূতির পাশাপাশি চতুর্থ আত্মিক বৈশিষ্ট্যরূপে গণনা করেছেন।

তারা তাদের এ ধারণার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের জন্যে ইতিহাস ও প্রত্মতত্ত্বের শরণাপন্ন হয়েছেন এবং বলেছেন যে, খোদাভীরুতা সবর্দা কোন না কোনভাবে সর্বযুগের মানুষের মধ্যে সর্বদা প্রচলিত ছিল। আর এ সার্বজনীনতা ও চিরন্তনতাই খোদাভীরুতার ফিতরাতগত হওয়ার সপক্ষে প্রমাণ বহন করে ।

তবে ফিতরাতগত চাহিদার সার্বজনীন অর্থ এ নয় যে, এটা সর্বদা সর্বজনের মধ্যে জাগ্রত ও সজীব থাকবে এবং মানুষকে সতর্কতার সাথে আপন যাঞ্চার দিকে উদ্বুদ্ধ করবে। বরং তা পারিপার্শিক পরিবেশ ও ক্রুটিপূর্ণ পরিচর্যার কারণে নিস্প্রভ ও নিক্রিয়ও হয়ে যেতে পারে কিংবা আপন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে, যেমনি করে অন্যান্য সহজাত প্রবণতার ক্ষেত্রে এধরনের নিস্প্রভতা, বিচ্যুতি ও অবদমিত অবস্থা কমবেশী পরিলক্ষিত হয়।

এ মতবাদ অনুসারে, দ্বীনের অনুসন্ধানের উদ্দীপক হল প্রত্যক্ষভাবে ফিত্‌রাতগত এবং যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে এর অপরিহার্যতা প্রতিষ্ঠার কোন প্রয়োজন নেই ।

এ মতবাদকে দ্বীনের ফিতরাতগত হওয়া সম্পর্কিত আয়াত এবং রেওয়ায়েতের উদ্বৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করা যেতে পারে। তবে এ ফিতরাতগত চাহিদা অবচেতন অবস্থায় প্রকাশ পায়' -এ ধারণার উপর ভিওি করে কেউ কেউ তর্ক-বিতর্কের খাতিরে নিজের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে। তাই আমরা শুধুমাত্র এ যুক্তিতেই তুষ্ট হব না এবং দ্বীনের অনুসন্ধানের গুরুত্ব প্রমাণ করতে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করব।

দ্বীনের অনুসন্ধানের গুরুত্ব ঃ

স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, একদিকে বাস্তবতাকে চিনার জন্যে ফিত্‌রাতগত চাহিদা, অপরদিকে স্বার্থসিদ্ধি ও লাভবান হওয়ার, ক্ষতির হাত থেকে নিরাপদে থাকার প্রবণতা হল চিন্তা করার জন্যে এবং গভীর জ্ঞানার্জনের জন্যে শক্তিশালী উদ্দীপক। অতএব, কোন ব্যক্তি অবহিত হল যে, যুগ যুগ ধরে একশ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দাবী করেছেন যে, "আমরা ইহ ও পরকালীন কল্যাণের দিকে মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্যে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে প্রেরিত হয়েছি" সত্যের বাণী পৌঁছানোর পথে ও মানুষকে পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তারা কোন প্রকার চেষ্টা করা থেকে বিরত হন নি এবং যে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্টকে সহ্য করেছেন; এমনকি এ পথে তারা নিজ জীবনও উৎসর্গ করেছেন। তখন ঐ ব্যক্তি পূর্বোল্লিখিত উদ্দীপকদ্বয়ের দ্বারা দ্বীন সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য উদ্দীপ্ত হয়ে জানতে চেষ্টা করে যে, পয়গাম্বরগণের দাবী কতটা সত্য এবং কতটা যুক্তিযুক্ত। বিশেষ করে কোন ব্যক্তি জানতে পারল যে, তাদের (নবীগণের) আহ্বান অনন্ত সুখ ও বৈভবের সুসংবাদ এবং অনন্ত দুঃখ-দুর্দশা ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ তাদের আহবানে সাড়া দেয়ার মধ্যে চিরন্তন সুখ-সম্মৃদ্ধির সম্ভাবনা বিদ্যমান। আর তাদের আহ্বানের বিরোধিতা করার মধ্যে অনন্ত ক্ষতির সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে ঐ ব্যক্তি কোন্ অজুহাতে দ্বীন সম্পর্কে উদাসীনতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করবে এবং অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্যে উদ্যোগী হবে না ?

হ্যাঁ, সম্ভবতঃ কেউ অলসতা ও আরামপ্রিয়তার কারণে গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজে নিজেকে পরিশ্রান্ত করতে চান না অথবা দ্বীন গ্রহণ করার কারণে কিছু সীমাবদ্ধতা বা বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হবে এবং তার কিছু কিছু স্বেচ্ছাচারী কর্ম থেকে তাকে বিরত রাখবে, এ কারণে দ্বীনের অনুসন্ধান থেকে সে নিজেকে দূরে রাখে ।[২]

কিন্তু এ ধরনের ব্যক্তিরা অচিরেই এ অলসতা ও স্বেচ্ছাচারিতার শোচনীয় পরিণতি দেখতে পাবে এবং পরিশেষে অনন্ত শাস্তি ও অপরিসীম দুর্দশায় পতিত হবে ।

এ ধরনের ব্যক্তিদের অবস্থা অসুস্থ ঐ নির্বোধ শিশুর চেয়েও খারাপ যে ঔষধের তিক্ততার ভয়ে চিকিৎসকের নিকট যায় না এবং নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিজেকে ঠেলে দেয়। কারণ ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝার মত যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ উক্ত শিশুর ঘটেনি। তবে চিকিৎসকের পরামর্শের বিরোধিতা করার ফলে শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া বৈ কিছু নয়। কিন্তু একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ও সচেতন মানুষ, যে লাভ–লোকসান সম্পর্কে ভাবতে পারগ, সে তো স্বল্পস্থায়ী সুখের বিনিময়ে অনন্ত শাস্তিই ক্রয় করে থাকে ।

এ কারণেই, পবিত্র কোরান এ ধরনের উদাসীন মানুষকে চতুস্পদ প্রাণীর চেয়েও অধম বলে বর্ণনা করেছে। কোরান এ শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে বলে ঃ

اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون

– তারা চতুস্পদ জন্তুর মত বরং তা থেকেও অধম; তারাই হচ্ছে গাফেল (সুরা আরাফ-১৭৯)।

অপর একস্থানে কোরান তাদেরকে নিকৃষ্টতম প্রানীরূপে পরিচয় করিয়ে বলে ঃ

انّ شرَّ الدوابِّ عند اللهِ الصّم البكم الذين لا يعقلون

– নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই নিকৃষ্টতম জীব যারা বধির, বোবা ও যারা বিবেকহীন (সুরা আনফাল - ২২) ।

২। সুরা আল ক্বিয়ামাহ- ৫, بل يريد الانسان ليفجر امامه

একটি ভুল ধারণার অপনোদন ঃ

হয়ত কেউ কেউ এমন কোন বাহানা দাঁড় করাতে পারেন যে, কোন সমস্যা সমাধানে মানুষ তখনই প্রচেষ্টা চালায়, যখন তা সমাধানের কোন পথ খুঁজে পাবার আশা থাকে। কিন্তু আমরা দ্বীন ও দ্বীন সম্পর্কিত কোন বিষয়ের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে, কোন ফল পাবার ব্যপারে খুব একটা আশাবাদী নই। ফলে সে সকল কর্মের পেছনেই আমাদের সময় ও শ্রম ব্যয় করায় প্রাধান্য দিব, যেগুলো থেকে ফল পাওয়ার ব্যাপারে আমরা অপেক্ষাকৃত বেশী আশাবাদী।

জবাবে এ ধরনের লোকদেরকে বলতে হয় ঃ

প্রথমতঃ দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর সমাধানের প্রত্যাশা কোনভাবেই অন্য সকল বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর সমাধানের চেয়ে কম নয়। আমরা জানি যে, এমন অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় আছে যে, কয়েক দশক অবিরাম প্রচেষ্টার পর সেগুলোর সমাধান করা সম্ভব হয়েছে ।

দ্বিতীয়তঃ সম্ভাবনার (Probablity) গুরুত্ব কেবলমাত্র এক নির্বাহীর (সম্ভাবনার পরিমাণ) উপরই নির্ভর করে না, বরং সম্ভাব্যতার (Probable) পরিমাণও বিবেচনা করতে হয়। উদাহরণতঃ যদি কোন একটি ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা ৫% এবং অপর একটিতে সম্ভাবনা ১০% হয়; কিন্তু যদি প্রথম ব্যবসায় সম্ভাব্য লাভের পরিমাণ ১০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় ব্যবসায় সম্ভাব্য লাভের পরিমাণ ১০০ টাকা হয়, তবে প্রথম ব্যবসাটি দ্বিতীয় ব্যবসার উপর পাঁচগুণ বেশী গুরুত্ব পাবে, যদিও প্রথম ব্যবসায় সম্ভাবনার পরিমাণ ৫% ছিল যা দ্বিতীয় ব্যবসার সম্ভাবনার (১০%)[৩] অর্ধেক ।

যেহেতু দ্বীনের অনুসন্ধানে সম্ভাব্য লাভের পরিমাণ অসীম, সুতরাং চূড়ান্ত ফল লাভের সম্ভাবনা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন তার সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রচেষ্টার গুরুত্ব অন্য যে কোন বিষয়ের চেয়ে বেশী। কারণ, ঐগুলোর ফল সীমাবদ্ধ ।

অতএব, একমাত্র তখনই দ্বীন সম্পর্কে অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকা

৩। (১০০০ x ৫) ÷১০০ = ৫০, (১০০x ১০)÷১০০ = ১০, .: ৫০÷১০ = ৫

বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে, যখন মানুষ দ্বীনের অসারতা সম্পর্কে অথবা দ্বীন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সমাধানযোগ্য নয় বলে নিশ্চিত হবে। কিন্তু এ ধরনের নিশ্চয়তা কোথা হতে অর্জিত হবে ?

পাঠ – ৩

প্রকৃত মানুষ হওয়ার শর্ত

- ভূমিকা
- মানুষ উৎকর্ষে পৌঁছতে চায়
- বুদ্ধিবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষ উৎকর্ষে পৌঁছতে পারে
- বুদ্ধিবৃত্তি প্রসূত বিধি-বিধান, তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল
- উপসংহার

ভূমিকাঃ

ইতিপূর্বে আমরা দ্বীনের অনুসন্ধানের গুরুত্ব এবং সত্য ধর্মকে চিনার জন্যে প্রচেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তাকে সরল বর্ণনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছি, যা লাভবান হওয়ার ফিতরাতগত চাহিদা এবং ক্ষতি থেকে দূরে থাকার প্রবণতার উপর নির্ভরশীল ছিল। এ প্রবণতা প্রত্যেকেরই আভ্যন্তরে বিদ্যমান এবং পারিভাষিক অর্থে, নির্ভুল প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বলিত। [৪]

এখন আমরা ঐ বিষয়টিকে অন্যভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করব। তবে এ প্রমাণটি যথার্থ ভূমিকাসমূহের উপর নির্ভরশীল। ঐ ভূমিকাসমূহের অবশেষ হল এরূপ ঃ

যদি কেউ দ্বীন সম্পর্কে না ভাবে এবং সঠিক বিশ্বদৃষ্টি ও মতাদর্শের প্রতি বিশ্বাস পোষণ না করে তবে মানবিক উৎকর্ষে পৌঁছতে পারবে না। এমনকি তাকে মূলতঃ প্রকৃত মানুষরূপেও মনে করা যাবে না। অর্থাৎ প্রকৃত মানুষ হওয়ার শর্ত হল সঠিক বিশ্বদৃষ্টি এবং মতাদর্শের অনুসারী হওয়া ।

এ প্রমাণটি তিনটি ভূমিকার উপর নির্ভরশীল । যথা ঃ

ক) মানুষ, এমন এক অস্তিত্ব, যে উৎকর্ষে পৌঁছতে চায়।

৩। উল্লেখিত প্রমাণটির কৌশলগত প্রক্রিয়া ঃ যদি লাভবান হওয়ার ও সমূহ ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার প্রবণতা মানুষের ফিতরাতগত চাহিদা হয়ে থাকে, তবে যে দ্বীন অফুরন্ত লাভের এবং অসীম ক্ষতি থেকে রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়ার দাবিদার, সে দ্বীন সম্পর্কে গবেষণা করা অপরিহার্য (অনিবার্যতা হল কিয়াসের ভিত্তিতে কার্যের অসম্পূর্ণ কারণ)। কিন্তু লাভবান হওয়ার এবং ক্ষতি থেকে নিরাপদে থাকার প্রবণতা মানুষের ফিতরাতগত চাহিদা । অতএব, এহেন দ্বীন সম্পর্কে গবেষণা করা অপরিহার্য ।

এ প্রমাণটি যা ব্যতিক্রমী যুক্তি (قياس الاستثنائي) পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে, বিশেষ যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। আর এ বিশেষ যৌক্তিক বিশ্লেষণ হল, বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকরী বিধি-বিধান এবং তাদের মূল, কিয়াসের ভিত্তিতে অপরিহার্যতা বা কার্যের (কাঙ্খিত ফল) কারণ (ঐচ্ছিক কর্ম) সম্পর্কিত।

আমাদের বিষয়বস্তুর আলোচনায় ব্যবহৃত প্রমাণটিকেও এরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে ঃ যদি মানবীয় উৎকর্ষে পৌঁছা মানুষের ফিতরাতগত চাহিদা হয়ে থাকে, তবে যে বিশ্বদৃষ্টি মানুষের আত্মিক বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় শর্ত, তার মূলনীতির শনাক্তকরণ অপরিহার্য। কিন্তু উৎকর্ষ সাধন ফিতরাতগত চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। অতএব উল্লেখিত মূলনীতির শনাক্তকরণ অপরিহার্য।

খ) মানুষের উৎকর্ষ বুদ্ধিবৃত্তি নির্ভর ঐচ্ছিক আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে ।

গ) বুদ্ধিবৃত্তি নির্ভর কার্যকরী বিধি-বিধান বিশেষ তাত্ত্বিক পরিচিতির আলোকে রূপ লাভ করে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বদৃষ্টির মূলনীতিত্রয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ অস্তিত্বের উৎস, জীবনেরপরিণতি (পুনরুত্থান) এবং কল্যাণকামী কর্মসূচী লাভের জন্যে অনুমোদিত পথের (নবুয়্যত) শনাক্তকরণ । অর্থাৎ অস্তিত্ব পরিচিতি, মানব পরিচিতি, পথ পরিচিতি।

এখন আমরা উপরোক্ত ভূমিকাত্রয়ের প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব ।

মানুষ, উৎকর্ষ সাধনে ইচ্ছুক ঃ

যে কেউ তার আভ্যন্তরীণ ও আত্মিক প্রবণতাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, সে দেখতে পাবে যে, এগুলোর অধিকাংশের মূলে রয়েছে উৎকর্ষ সাধন। প্রকৃতপক্ষে কেউই পছন্দ করেনা যে, তার অস্তিত্বে কোন প্রকার ত্রুটি থাকুক। আর তাই সে নিজ থেকে সকল প্রকার স্বল্পতা, অপূর্ণতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে কাংখিত উৎকর্ষে পৌঁছতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্যের কাছ থেকে তা গোপন করে রাখে।

মানুষের এ প্রবণতা যখন তার আপন ফিত্‌রাতের পথে পরিচালিত হয় তখন তা তার সকল প্রকার বস্তুগত ও আত্মিক বিকাশের কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়। আর যদি কোন কারণে বা অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষের এ প্রবণতা বিচ্যুতির পথে পতিত হয় তবে তা অহংকার, অপরের তুলনায় নিজেকে বড় করে দেখা, প্রশংসাপাগল ইত্যাদি কুবৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশের কারণে পরিণত হয়।

যা হোক, উৎকর্ষ সাধনেচ্ছা হল মানব আত্মার গহীনে অবস্থিত এক শক্তিশালী ফিত্‌রাতগত কারণ। অধিকাংশ সময়ই এর বা এর শাখাসমূহের স্বরূপ সচেতনভাবে বিবেচ্য হয়ে থাকে। কিন্তু কিঞ্চিৎ চিন্তা করলেই স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হবে যে, এদের সকলেরই মূলে রয়েছে উৎকর্ষ অনুসন্ধিৎসা ।

বুদ্ধিবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষ উৎকর্ষে পৌঁছতে পারে ঃ

বৃক্ষরাজির পূর্ণতা লাভ, পারিপর্শিক অবস্থা ও বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভরশীল এবং অপরিহার্যরূপে ঘটে থাকে। কোন উদ্ভিদই স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে পারে না এবং আপন ইচ্ছানুযায়ী ফল দিতে পারে না। কারণ তারা জ্ঞান ও প্রত্যয়ের অধিকারী নয় ।

প্রাণীদের পূর্ণতা লাভের ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও পছন্দের কিছুটা স্থান রয়েছে। তবে এ প্রত্যয় প্রাণীর সীমাবদ্ধ পারিপার্শিক চাহিদা ও অন্ধ সহজাত প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক প্রাণীরই ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনুযায়ী স্বল্প বোধশক্তির আলোকে তা পরিগ্রহ করে থাকে ।

কিন্তু মানুষ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও দু'টি স্বতন্ত্র আত্মিক বিশেষত্বের অধিকারী। অর্থাৎ একদিকে মানুষের ফিত্‌রাতগত চাহিদা শুধুমাত্র পারিপার্শিক আস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অপরদিকে তা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিকে ব্যবহার করে আপন জ্ঞানের পরিধিকে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত করতে পারে। আর এ স্বতন্ত্র আত্মিক বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করে মানুষের প্রত্যয় সীমাবদ্ধ প্রাকৃতিক সীমানাকে ছাড়িয়ে অসীমে পৌঁছে যেতে পারে।

যেমনি করে উদ্ভিদের বিশেষ উদ্ভিজ্জ শক্তির মাধ্যমে তার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়; যেমনি করে প্রাণিজ উৎকর্ষ তার স্বভাবজাত প্রত্যয় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির আশ্রয়ে ঘটে থাকে ; তেমনি মানুষের বিশেষ মানবীয় উৎকর্ষ যা প্রকৃতপক্ষে তার আত্মিক বিকাশ, তাও তার সচেতন প্রত্যয়ের আশ্রয়ে এবং বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে অর্জিত হয়ে থাকে । আর মানুষের এ বুদ্ধিবৃত্তি মানুষের চাহিদার বিভিন্ন স্তরকে শনাক্ত করতে পারে এবং একাধিক চাহিদার সমাহারে, সর্বোৎকৃষ্টকে প্রাধান্য দিতে পারে।

অতএব, আচার-আচরণ, মানবীয় হওয়ার অর্থ হল, মানবীয় বিশেষ ঐচ্ছিক প্রত্যয়ের ভিত্তিতে এবং বুদ্ধিবৃত্তির দিক নির্দেশনায় কার্যকর হওয়া। আর মানুষের যে সকল আচরণ শুধুমাত্র পাশবিক প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে সম্পাদিত হয়, সে সকল আচরণ পাশবিক আচরণরূপে পরিগণিত হয়। যেমন ঃ গতিশক্তির প্রভাবে মানুষের শরীরে যে গতির সঞ্চার হয়, তা শারীরিক শক্তিরূপে

বহিঃপ্রকাশ লাভ করে থাকে ।

বুদ্ধিবৃত্তি প্রসূত বিধি-বিধান তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল ঃ

ঐচ্ছিক কর্ম হল, কাংখিত ফলে উপনীত হওয়ার জন্য একটি মাধ্যম। আর তার ঐচ্ছিক মূল্যমান বিবেচিত উদ্দেশ্যের কাম্যতার মর্যাদা এবং আত্মিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে প্রভাবের মাত্রার অনুগামী। অনুরূপ যদি কোন কর্ম আত্মিক উৎকর্ষহীনতার কারণ হয়, তবে ঐ কর্মের মূল্যমান হবে নেতিবাচক।

অতএব, বুদ্ধিবৃত্তি কেবলমাত্র তখনই ঐচ্ছিক কর্ম সম্পর্কে বিচার ও তার মূল্যমান নির্ধারণ করতে পারবে যখন মানুষের উৎকর্ষ ও এর বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে অবগত থাকবে। অর্থাৎ যখন জানবে যে, মানুষ কীরূপ অস্তিত্ব? তার জীবন-পরিধির বিস্তৃতি কতটুকু ? সে উৎকর্ষের কোন স্তরে পৌঁছতে সক্ষম? জানবে যে, মানুষের অস্তিত্বের স্বরূপ কী এবং তার সৃষ্টির পিছনে কী উদ্দেশ্য বিদ্যমান ?

অতএব, সঠিক মতাদর্শের (অর্থাৎ ঐ মূল্যমান ব্যবস্থা যা ঐচ্ছিক কর্মসমূহের মূল্যমান নির্ধারণ করে থাকে) অনুসরণ সঠিক বিশ্বদৃষ্টি ও তার বিভিন্ন বিষয়ের সমাধানের উপর নির্ভর করে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়গুলো (অর্থাৎ সঠিক বিশ্বদৃষ্টির বিষয়সমূহ) সমাধান না করতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের আচার-আচরণের মূল্যমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে না । যেমন ঃ গন্তব্য জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত তার জন্যে কোন পথ নির্ধারণ করাও অসম্ভব ।

অতএব, তাত্ত্বিক পরিচিতিসমূহ যেগুলো বিশ্বদৃষ্টির মৌলিক বিষয়সমূহকে রূপায়িত করে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো, মূল্যমান ব্যবস্থা ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রসূত বিধি-বিধানের ভিত্তিরূপে পরিগণিত ।

উপসংহার ঃ

এখন আমরা উপরোক্ত আলোচনার আলোকে দ্বীনের অনুসন্ধানের এবং সঠিক বিশ্বদৃষ্টি ও মতাদর্শকে খুঁজে বের করার জন্যে, প্রচেষ্টার গুরুত্বকে নিম্নরূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারি ঃ

মানুষ ফিত্‌রাতগতভাবেই স্বীয় উৎকর্ষ পিয়াসূ এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে প্রকৃত উৎকর্ষে পৌঁছতে ইচ্ছুক। কিন্তু যে কর্মগুলো তাকে কাঙ্খিত উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী করবে, সেগুলো সম্পর্কে জানার জন্যে সর্বপ্রথমে তাকে আপন চূড়ান্ত উৎকর্ষকে চিনতে হবে। আর এ চূড়ান্ত উৎকর্ষের পরিচিতি, আপন অস্তিত্বের স্বরূপ এবং তার শুরু ও শেষ সম্পর্কে জানার উপর নির্ভর করে। অনুরূপ, বিভিন্ন কর্মের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক সম্পর্ক ও উৎকর্ষের বিভিন্ন স্তরকে চিহ্নিত করতে হবে, যাতে স্বীয় মানবীয় উৎকর্ষ সাধনের জন্যে সঠিক পথকে বেছে নিতে পারে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে এ তাত্ত্বিক পরিচিতি (বিশ্বদৃষ্টির মূলনীতি) সম্পর্কে অবহিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক আচার ও রীতি ব্যবস্থাকে (মতাদর্শ) গ্রহণ করতে পারবে না।

অতএব, সত্যধর্মকে শনাক্ত করার প্রচেষ্টা অতি গুরুত্বপূর্ণ, যা সঠিক বিশ্বদৃষ্টি ও মতার্দশকেও সমন্বয় করে থাকে এবং এটি ব্যতিরেকে মানবীয় উৎকর্ষে পৌঁছা অসম্ভব। অনুরূপ যে সকল আচার-ব্যবহার উপরোল্লিখিত মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন না হয়, সে সকল আচার-ব্যবহার মানবীয় বলে পরিগণিত হতে পারে না। যারা সত্য ধর্মকে শনাক্তকরণের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে চেষ্টা করেন না অথবা শনাক্তকরণের পরও আক্রোশ ও অবাধ্যতাবশতঃ অস্বীকার করার চেষ্টা করেন এবং শুধুমাত্র পাশবিক চাহিদা ও ক্ষণস্থায়ী বস্তুগত আকর্ষণেই তুষ্ট থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তারা পশু বৈ কিছুই নন। যেমন পবিত্র কোরা'ন এদের সম্পর্কে বলে ঃ

يتمتّعونَ ويأكلونَ كما تأكلُ الانعام

–"চতুষ্পদ প্রাণীর মত ভোগ ও ভক্ষণ করে (সুরা মুহাম্মদ (সঃ) - ১২)।"

যেহেতু এ ধরনের ব্যাক্তিরা আপন মানবীয় যোগ্যতাসমূহের বিনাশ ঘটিয়ে থাকে, সেহেতু তারা যথোপযুক্ত কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। পবিত্র কোরানের ভাষায় ঃ

ذرهم يأكلوا و يتمتّعوا و يلههمُ الأملُ فسوفَ يعلمون

–"তাদের ভোগ ও ভক্ষণ করতে দাও এবং পার্থিব যত স্বাধ-আকাঙ্খা পূরণ করতে দাও, অচিরেই তারা (এর পরিণাম) দেখতে পাবে (সুরা হিজর-৩)।"

পাঠ –৪

বিশ্বদৃষ্টি মৌলিক সমস্যাসমূহের সমাধান

- ভূমিকা
- পরিচিতির প্রকারভেদ
- বিশ্বদৃষ্টির প্রকারভেদ
- সমালোচনা ও ত্রুটিনির্দেশ
- সিদ্ধান্ত

ভূমিকা ঃ

যখনই মানুষ বিশ্বদৃষ্টির মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান এবং সত্য ধর্মের মূলনীতির পরিচিতি সম্পর্কে জানতে চাইবে, প্রথমেই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হবে যে, কোন্ পথে এ বিষয়গুলোর সমাধান করতে হবে এবং কিরূপে সঠিক মৌলিক পরিচিতি সম্পর্কে জানা যেতে পারে? মূলতঃ পরিচিতির জন্যে কী কী উপায় বিদ্যমান? এদের কোনটিকে পরিচিতিসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্যে নির্বাচন করতে হবে ?

এ বিষয়টির কৌশলগত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও পর্যালোচনার দায়িত্ব দর্শনের পরিচিতি বিজ্ঞান (Epistemology) বিভাগের। দর্শনের ঐ বিভাগে মানুষের বিভিন্ন পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করতঃ এদের মূল্যমান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এদের সবগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাব। সুতরাং আমাদের আলোচনা -সংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলো প্রয়োজনীয়, শুধুমাত্র সেগুলোর উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। তবে ঐ বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা যথাস্থানে করা হবে।[১]

পরিচিতির প্রকারভেদ ঃ

পরিচিতিসমূহকে এক দৃষ্টিকোণ থেকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

১। অভিজ্ঞতালব্ধ ও বৈজ্ঞানিক পরিচিতি (বিশেষ পারিভাষিক অর্থে)ঃ এধরনের পরিচিতি ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে লাভ করা যায়। তবে বুদ্ধিবৃত্তিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধসমূহের বিমূর্তন (Abstraction) এবং সম্প্রসারণের (Generalization) ক্ষেত্রে স্বীয় ভূমিকা পালন করে থাকে।[২] অভিজ্ঞতালব্ধ ও বৈজ্ঞানিক পরিচিতি বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহে যেমন ঃ পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ণ

১। লেখেকের অপর একটি বই দর্শন শিক্ষাতে (আ'মুজেশে ফালসাফে) পরিচিতি (শেনা'খত) নিবন্ধে এ বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে ।

২। প্রথমে বিমূর্তন অতঃপর সম্প্রসারণ। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি প্রথমে কোন গুণকে নির্দিষ্ট করে, অতঃপর একে সার্বজনীনতা দিয়ে থাকে ।

বিজ্ঞান এবং জীব বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।

২। বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচিতি ঃ এধরনের পরিচিতি নির্বস্তুক ধারণার (মা'কুলাতুচ্ছানিয়া) মাধ্যমে রূপ পরিগ্রহ করে এবং এ পরিচিতিতে বুদ্ধিবৃত্তি মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরীক্ষালব্ধ কোন কোন বিষয়, ধারণা লাভের উৎস অথবা যুক্তিপদ্ধতির কোন কোন প্রতিজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যুক্তিবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্র, এ পরিচিতির অন্তর্ভুক্ত ।

৩। ধর্মবিশ্বাসগত পরিচিতি ঃ এধরনের পরিচিতি দ্বিস্তর বিশিষ্ট। বিশ্বস্ত উৎসের পূর্ব পরিচিতির ভিত্তিতে এবং বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বর্ণনা থেকে এধরনের পরিচিতি অর্জিত হয়ে থাকে। যে সকল বিষয়সমূহ সকল ধর্মের অনুসারীগণ ধর্মীয় নেতাগণের বক্তব্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করে থাকেন, সে সকল বিষয়সমূহ এ পরিচিতির অন্তর্ভুক্ত। কখনো কখনো এধরনের বিষয়বস্তর বিশ্বস্ততা, ইন্দ্রিয় ও পরীক্ষালব্ধ বিষয় বস্ত অপেক্ষা অধিকতর।

৪। প্রত্যক্ষ অনুভূতিভিত্তিক পরিচিতি ঃ এধরনের পরিচিতি পূর্ববর্তী সকল পরিচিতির ব্যতিক্রম এবং কোন প্রকার মস্তিষ্ক প্রসূত অনুধাবন ও আকৃতির মাধ্যম ব্যতীত অবিকল জ্ঞেয় সত্তার সাথেও সম্বন্ধ স্থাপন করে থাকে। এধরনের পরিচিতিতে কোন প্রকার ভুল-ক্রটির স্থান নেই। তবে প্রত্যক্ষ অনুভূতিভিত্তিক ও আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক পরিচিতি বলে যা সাধারণতঃ বর্ণিত হয়ে থাকে, প্রকৃতপক্ষে তা হল এধরনের পরিচিতির মস্তিষ্কে অংকিত ব্যাখ্যারূপ যা ভুল-ক্রটি বর্জিত নয়।

বিশ্বদৃষ্টির প্রকারভেদ ঃ

ইতিপূর্বে পরিচিতির যে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে বিশ্বদৃষ্টিকে নিম্নরূপে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

১। বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টি ঃ অর্থাৎ মানুষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হয়।

২। দার্শনিক বিশ্বদৃষ্টি ঃ যা যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে।

৩। ধর্মীয় বিশ্বদৃষ্টি ঃ যা ধর্মীয় নেতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাদের বক্তব্যকে গ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে।

৪। এরফানী বা আধ্যাত্মিক বিশ্বদৃষ্টি ঃ যা উদ্ভাবন, অন্তর্জ্ঞান ও এশরাক্বীয় পথে অর্জিত হয়ে থাকে।

এখন, দেখতে হবে যে, বিশ্বদৃষ্টির মৌলিক বিষয়গুলোকে কি সত্যিকার অর্থে উল্লেখিত চার উপায়ে সমাধান করা সম্ভব? অতঃপর দেখতে হবে, এদের কোন একটির বিশেষত্ব ও অগ্রাধিকারের প্রশ্ন বিবেচনার পালা আসে কিনা ?

সমালোচনা ও ত্রুটিনির্দেশ ঃ

ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতালব্ধ পরিচিতি বস্তুগত ও প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর সীমানায় কার্যকর। ফলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত বিষয়বস্তুর আলোকে বিশ্বদৃষ্টির মূলনীতিসমূহ ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদির শনাক্তকরণ সম্ভব নয়। কারণ, এধরনের বিষয়গুলো অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সীমাবহির্ভূত এবং কোন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই এ বিষয়গুলোর সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক মন্তব্য করতে পারে না। যেমন ঃ খোদার অস্তিত্বকে পরীক্ষাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা বা বর্জন (আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন) করা অসম্ভব। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার হস্ত এত ক্ষুদ্র যে, অতিপ্রকৃতির আঁচলকে স্পর্শ করতে অপারগ এবং আপন বস্তুগত বিষয়ের সীমাবহির্ভূত কোন কিছুকে প্রতিষ্ঠা বা বর্জন করতে অক্ষম।

অতএব, 'ধভিজ্ঞতালব্ধ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টি' (পারিভাষিক অর্থে বিশ্বদৃষ্টি, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) মরীচিকা বৈ কিছুই নয়। সুতরাং প্রকৃত অর্থে একে 'বিশ্বদৃষ্টি' নামকরণ করা যায় না। তবে সর্বোপরি একে 'বস্তুজগত পরিচিতি 'বলা যেতে পারে। এছাড়া এধরনের পরিচিতি বিশ্বদৃষ্টির মৌলিক প্রশ্নসমূহের জবাবদানেও অক্ষম।

কিন্তু যে সকল পরিচিতি ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে অর্জিত হয় (যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) সেগুলো দ্বি-স্তর বিশিষ্ট এবং পূর্বেই ঐগুলোর উৎস বা উৎসসমুহের উপর আস্থা স্থাপন করতে হয়। অর্থাৎ প্রথমে কারো নবুওয়াত প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে; অতঃপর তার বাণী বৈধ বলে

পরিগণিত হবে। তবে সর্বাগ্রে বাণী প্রেরক অর্থাৎ মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে হবে । আর এটা সুস্পষ্ট যে, বাণী প্রেরকের মূল অস্তিত্ব এবং তদনুরূপ বাণী বাহকের নবুওয়াতকে বানী নির্ভর দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় না। যেমন ঃ বলা যাবে না যে, যেহেতু কোরা'ন বলে 'খোদা আছেন' সেহেতু তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণিত হল। তবে খোদার অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর এবং ইসলামের নবীর শনাক্তকরণ ও কোরা'নের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর, অন্যান্য গৌণ বিশ্বাসসমূহকে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে কার্যকরী বিধি-নিষেধ সমূহও বিশ্বস্ত সংবাদদাতা ও বিশ্বস্তসূত্রের মাধ্যমে গৃহীত হতে পারে। কিন্ত মৌলিক বিশ্বাসমূহকে তৎপূর্বে অন্য কোন উপায়ে সমাধান করতে হবে।

অতএব, ধর্মবিশ্বাসগত পরিচিতিও বিশ্বদৃষ্টির মৌলিক বিষয়সমূহের সমাধানে অক্ষম। তবে এরফানী ও এশরাক্বী (اشراقی) পদ্ধতির ব্যাপারে অনেক বক্তব্য রয়েছে ঃ

প্রথমতঃ বিশ্বদৃষ্টি হল এক প্রকার পরিচিতি, যা মস্তিষ্কপ্রসূত (ذهنی) ভাবার্থসমূহ থেকে রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু অন্তর্জ্ঞানের ক্ষত্রে মস্তিষ্কপ্রসূত বোধদ্বয়ের কোন স্থান নেই। অতএব এধরনের ভাবার্থসমূহকে অন্তর্জ্ঞানের বরাত দেয়া উদাসীনতা ও এর নামান্তর বৈ কিছুই নয়।

দ্বিতীয়তঃ অন্তর্জ্ঞানের ব্যাখ্যা এবং ভাষা ও ভাবার্থের কলেবরে তাদের বর্ণনা বিশেষ মানস-দক্ষতার উপর নির্ভরশীল, যা সুদীর্ঘ সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা এবং দার্শনিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে অসম্ভব। যারা এধরনের অভিজ্ঞতার অধিকারী নন প্রকৃতপক্ষে তারা সদৃশ শব্দ ও ভাবার্থকে ব্যবহার করে থাকেন যা বিচ্যুতি ও বিপথগামিতার এক বৃহত্তর কারণ।

তৃতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে যা অন্তর্জ্ঞানের মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়, তা মস্তিষ্কে অংকিত তার কল্পিত চিত্র ও বর্ণনা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা এমনকি স্বয়ং অন্তর্জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির জন্যেও ত্রুটিযুক্ত হয়ে থাকে।

চতুর্থতঃ ঐ সকল বাস্তবতা, যাদের মস্তিষ্কপ্রসূত ব্যাখ্যা বিশ্বদৃষ্টি বলে পরিচিত; তাতে উপনীত হওয়ার জন্যে বর্ষপরম্পরায় এরফানী সাধনার প্রয়োজন। আর গভীর সাধনালব্ধ এ প্রক্রিয়ার (যা বাস্তব পরিচিতিসমূহের অন্তর্ভূক্ত) অনুমোদন, তাত্ত্বিক ভিত্তি ও বিশ্বদৃষ্টির মৌলিক বিষয়সমূহের উপর

নির্ভরশীল। অতএব, সাধনার প্রারম্ভেই এ বিষয়গুলোর সমাধান অনিবার্য। আর এ প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে অন্তর্জ্ঞানগত পরিচিতি অর্জিত হয়ে থাকে। মূলতঃ প্রকৃত এরফান তার জন্যেই প্রযোজ্য, যিনি মহান সৃষ্টিকর্তার দাসত্বের পথে বিনীতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন। আর এধরনের প্রচেষ্টা প্রভুর পরিচিতি, তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ।

সিদ্ধান্ত ঃ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, বিশ্বদৃষ্টির মৌলিক বিষয়সমূহের সমাধান যারা খুঁজে থাকেন তাদের জন্যে একমাত্র উন্মুক্ত পথ হল বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধির পথ। ফলে এর আলোকে বলতে হয়, দার্শনিক বিশ্বদৃষ্টিই হল প্রকৃত বিশ্বদৃষ্টি।

তবে মনে রাখা উচিৎ যে, উল্লেখিত বিষয়সমূহের সমাধানকে বুদ্ধিবৃত্তিক পথে সীমাবদ্ধকরণ ও দার্শনিক বিশ্বদৃষ্টিকেই একমাত্র বিশ্বদৃষ্টিরূপে পরিগণনের অর্থ এ নয় যে, সঠিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি লাভের জন্যে সকল দার্শনিক বিষয়েরই সমাধান করতে হবে। বরং কয়েকটি সরল দার্শনিক বিষয় যেগুলো প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সেগুলোর সমাধানই খোদার অস্তিত্ব (যা বিশ্বদৃষ্টির মৌলিকতম বিষয় বলে পরিগণিত) প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট। তবে এ ধরনের বিষয়সমূহের উপর পারদর্শিতা এবং সকল প্রকার সমস্যা ও দ্বিধার উত্তরদানের ক্ষমতা অর্জনের জন্যে অধিকতর দার্শনিক পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আবার মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্যে অর্থপূর্ণ পরিচিতিকে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচিতিতে সীমাবদ্ধকরণের অর্থ এ নয় যে, অন্যান্য জ্ঞাত বিষয়সমূহ, এ বিষয়গুলোর সমাধানের ব্যাপারে ব্যবহৃত হবে না। বরং অধিকাংশ বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ,ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে প্রতিজ্ঞারূপে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমনঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়সমূহ ও গৌণ বিশ্বাসগত বিষয়সমূহের সমাধানের ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসগত পরিচিতিকে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এগুলোকে কিতাব ও সুন্নতের (দ্বীনের বিশ্বস্ত উৎস) বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রমাণ করা যেতে পারে ।

পরিশেষে, সঠিক বিশ্বদৃষ্টি ও মতাদর্শে উপনীত হওয়ার পর গভীর আধ্যাত্মিক সাধনার পর্যায়সমূহ অতিক্রম করতঃ উদ্ঘাটন ও পর্যবেক্ষণের

(অন্তর্চক্ষু) স্তরে পৌঁছা যায় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত এমন অধিকাংশ বিষয় সম্পর্কে, মস্তিষ্কগত ভাবার্থসমূহের সাহায্য ব্যতীতই অবগত হওয়া সম্ভব।

পাঠ – ৫

খোদাপরিচিতি

- ভূমিকা
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচিতি
- ফিতরাতগত পরিচিতি

ভূমিকা ঃ

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, দ্বীনের মূলনীতিগুলো বিশ্ব-সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস থেকে রূপ পরিগ্রহ করে এবং ঐশ্বরিক বিশ্বদৃষ্টি ও বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির মধ্যে মূল পার্থক্যও এ বিশ্বাসের (সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব) উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে।

অতএব, সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির জন্যে সর্বপ্রথমেই যে প্রশ্নটি উপস্থাপিত হয় এবং সর্বাগ্রেই যার সঠিক উত্তর জানতে হয় তা হল, খোদার অস্তিত্ব আছে কিনা? আর এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে (যা পূর্ববর্তী পাঠে আলোচিত হয়েছে) বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়-চাই তার ফল হোক ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক।

যদি এ অনুসন্ধানের ফল ইতিবাচক হয়, তবে খোদা সংক্রান্ত গৌণ বিষয়গুলোকে (একত্ব, ন্যায়বিচার এবং খোদার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য) বিবেচনার পালা আসে। অনুরূপভাবে যদি অনুসন্ধানের ফল নেতিবাচক হয় তবে বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তখন দ্বীন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গৌণ বিষয়গুলোকে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচিতি ঃ

মহান আল্লাহ সম্পর্কে দু'ধরনের পরিচিতির ধারণা পাওয়া যায় ঃ একটি হল প্রত্যক্ষ পরিচিতি এবং অপরটি হল পরোক্ষ পরিচিতি ।

খোদার প্রত্যক্ষ পরিচিতি বলতে বুঝায়-মানুষ মস্তিষ্কগত ভাবার্থের সাহায্য ব্যতিরেকেই এক ধরনের অন্তর্জ্ঞান ও আভ্যন্তরীণ অনুভূতির মাধ্যমে খোদার সাথে পরিচিত হয় ।

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, যদি কেহ খোদা সম্পর্কে সচেতন অর্ন্তজ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকে (যেরূপ অনেক উচ্চপর্যায়ের আরেফগণ দাবী করে থাকেন তবে বুদ্ধিবৃত্তিক কোন যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু (যেমনটি ইতিপূর্বে

উল্লেখিত হয়েছে) এধরনের প্রত্যক্ষজ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞান সাধারণ কোন ব্যক্তির [১] জন্যে কেবলমাত্র তখনই সম্ভব, যখন সে আত্মগঠন ও আধ্যাত্মিক সাধনার পর্যায়গুলো অতিক্রম করবে। তবে এর দুর্বল পর্যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উপস্থিত থাকলেও যেহেতু সচেতন অবস্থায় নেই, সেহেতু তা সচেতন বিশ্বদৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়।

পরোক্ষপ রিচিতি বলতে বুঝায় যে, মানুষ সামগ্রিক ভাবার্থের (সৃষ্টিকর্তা, অমুখাপেক্ষী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞা) মাধ্যমে মহান আল্লাহ সম্পর্কে মস্তিষ্কগত পরিচিতি ও এধরনের 'অদৃশ্যগত' অর্থ অনুধাবন করে থাকে। আর এভাবে সে বিশ্বাস করে যে, এধরণের অস্তিত্ব বিদ্যমান (যিনি এ জগৎকে সৃষ্টি করেছেন)। অতঃপর, অন্যান্য পরোক্ষ পরিচিতি এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে বিশ্বদৃষ্টির সাথে সংগতিপূর্ণ একশ্রেণীর বিশ্বাস প্রবর্তিত হয়ে থাকে।

যা সরাসরি বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যবেক্ষণ ও দার্শনিক যুক্তি-প্রামাণের মাধ্যমে অর্জিত হয় তা-ই হল পরোক্ষ পরিচিতি। কিন্তু যখন এধরণের পরিচিতি অর্জিত হয় কেবলমাত্র তখনই মানুষের জন্যে সাবগতিক প্রত্যক্ষ পরিচিতি অর্জিত হয়ে থাকে।

ফিতরাতগত পরিচিতি ঃ

ধর্মীয় নেতাগণ, আরেফগণ এবং মনীষীগণের অধিকাংশ বক্তব্যেই আমরা খুঁজে পাই যে, খোদা পরিচিতি ফিত্রাতগত, অর্থাৎ মানুষ ফিত্রাতগতভাবেই খোদাকে চিনে থাকে। সুতরাং উপরোক্ত বিবরণসমূহের সঠিক অর্থ খুঁজে পাওয়ার নিমিত্তে 'ফিত্রাত' শব্দটির ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন মনে করি।

ফিত্রাত, একটি আরবী শব্দ যার অর্থ হল 'সৃষ্টি প্রকরণ' এবং কোন বিষয় ফিত্রাত সংশ্লিষ্ট (ফিতরাতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত) বলে পরিগণিত হবে

১। তবে ব্যতিক্রম কোন ব্যক্তি যিনি সচেতন অন্তর্জ্ঞানের অধিকারী, তাকে অস্বীকার করা যায় না। যেমন ঃ পবিত্র নবীগণ (আঃ) ও ইমামগনের (আঃ) সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস যে, শৈশবেও এ ধরনের অন্তর্জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ মাতৃগর্ভেও এ ধরনের পরিচিতির অধিকারী ছিলেন।

তখনই , যখন বিদ্যমান সৃষ্টি এদেরকে ধারণ করবে। সুতরাং এদের জন্যে তিনটি বিশেষত্ব বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

১। প্রত্যেক শ্রেণীর ফিতরাগত বিশেষত্ব ঐ শ্রেণীর সকল সদস্যের মধ্যে পাওয়া যায়, যদিও তীব্রতা ও ক্ষীণতার দৃষ্টিকোণ থেকে এদের মাত্রাভেদ পরিলক্ষিত হয় ।

২। ফিতরাতগত বিষয়সমূহ তাদের ইতিহাস পরিক্রমায় সর্বদা স্থির এবং এমন নয় যে, ইতিহাসের একাংশে সৃষ্টির ফিতরাত এক বিশেষত্ব বিশিষ্ট, আর অন্য অংশে অপর এক বিশেষত্ব বিশিষ্ট ।[১]

৩। ফিতরাতগত বিষয়সমূহ যে দৃষ্টিকোণে ফিত্‌রাতসম্বন্ধীয় এবং সৃষ্টিপ্রকৃতি কর্তৃক ধারণকৃত সে দৃষ্টিকোণে শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নেই, যদিও এদের দৃঢ়ীকরণ ও দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

মানুষের ফিত্‌রাতগত বিশেষত্বকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

ক) ফিত্‌রাতগত পরিচিতি, যার সাথে প্রত্যেক মানুষই কোন প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা ব্যতিরেকেই পরিচিত হয়ে থাকে।

খ) ফিত্‌রাতগত প্রবণতা ও চাহিদা যা সৃষ্টির প্রত্যেক সদস্যের মধ্যেই বিদ্যমান।

অতএব, যদি এমন এক ধরনের খোদা পরিচিতি প্রত্যেকের মধ্যেই থেকে থাকে যে, প্রশিক্ষণ ও আয়ত্তকরণের প্রয়োজন নেই তবে, তাকে "ফিত্‌রাতগত খোদা পরিচিতি" নামকরণ করা যেতে পারে। আর যদি, খোদার প্রতি এবং খোদার উপাসনার প্রতি এক ধরনের প্রবণতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকে, তবে তাকে 'খোদার ফিত্‌রাতগত উপাসনা' বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠে আমরা উল্লেখ করেছি যে, অধিকাংশ পন্ডিতগণ দ্বীন এবং খোদার প্রতি মানুষের প্রবণতাকে মানুষের মানসিক বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং একে 'ধর্মানুভূতি' বা 'ধর্মানুরাগ' নামকরণ করেছেন। এখন

১। (সুরাঃ রুম - ৩০) فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

আমরা সংযোজন করব যে, খোদা পরিচিতিও মানুষের ফিতরাতগত চাহিদারূপে জ্ঞাত হয়েছে। কিন্তু "খোদার ফিত্‌রাতগত উপাসনা'' যেমন সচেতন প্রবণতা নয় তেমনি "ফিতরাতগত খোদা পরিচিতিও" সচেতন পরিচিতি নয় যে, কোন সাধারণ ব্যক্তিকে খোদার শনাক্তকরণের জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা থেকে অনির্ভরশীল করবে।

তবে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, যেহেতু প্রত্যেকেই অন্ততঃ এক ক্ষীণ মাত্রায় ফিত্‌রাতগত প্রত্যক্ষ পরিচিতির অধিকারী সেহেতু সামান্য একটু চিন্তা ও যুক্তির অবতারণাতেই খোদার অস্তিত্বকে স্বীকার করে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে অবচেতন স্তরের অন্তর্জ্ঞান ভিত্তিক পরিচিতিকে সুদৃঢ় করে সচেতন স্তরে পৌঁছাতে পারে ।

উপসংহারে বলা যায়ঃ খোদা পরিচিতি ফিত্‌রাতগত হওয়ার অর্থ হল এই যে, মানুষের অন্তর খোদার সাথে পরিচিত এবং তার আত্মার গভীরে খোদার সজ্ঞাত পরিচিতির জন্যে এক বিশেষ উৎস বিদ্যমান, যা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হতে সক্ষম। কিন্তু এ ফিত্‌রাতগত উৎস সাধারণ ব্যাক্তিবর্গের মধ্যে এমন অবস্থায় নেই যে, তাদেরকে চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি থেকে অনির্ভরশীল করবে।

পাঠ – ৬

খোদা পরিচিতির সরল উপায়

- খোদাকে চিনার উপায়সমূহ
- সরল উপায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ
- পরিচিত নিদর্শনসমূহ

খোদাকে চিনার উপায়সমূহ ঃ

মহান প্রভুকে চিনার জন্যে একাধিক উপায় বিদ্যমান। দর্শনের বিভিন্ন বইয়ে, কালামশাস্ত্রে, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন ভাষ্যে এবং ঐশী কিতাবসমূহেও এগুলো (উপায়) সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ যুক্তি-প্রমাণসমূহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পারস্পরিকভাবে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহ প্রতিজ্ঞা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে; যেখানে অন্য কোন ক্ষেত্রে খাঁটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়সমূহ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কেউ কেউ সরাসরি প্রজ্ঞাবান প্রভুর অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন; যেখানে অন্যান্যরা শুধুমাত্র এমন এক অস্তিত্বময়কে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন যার অস্তিত্ব অপর কোন অস্তিত্বময়ের উপর নির্ভরশীল নয় (অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব) এবং তার বৈশিষ্ট্যসমূহকে চিহ্নিত করার জন্যে অপর এক শ্রেণীর যুক্তির অবতারণা করে থাকেন।

এক দৃষ্টিকোণ থেকে খোদা পরিচিতির যুক্তি-প্রমাণসমূহকে কোন এক নদী পারাপারের জন্যে বিদ্যমান বিভিন্ন পথের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এগুলোর কোন কোনটি কাঠের তৈরী সাধারণ পুল যা নদীর উপর দিয়ে চলে গিয়েছে এবং লঘু ভারবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি খুব সহজেই একে অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে। আবার কোন কোনটি হল প্রস্তর নির্মিত সুদৃঢ় এবং সুদীর্ঘ পুলের মত যার অতিক্রান্ত পথের দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশী। কোন কোনটি আবার আঁকাবাঁকা, উঁচু–নীচু এবং সুদীর্ঘ টানেল বিশিষ্ট রেলপথের মত, যা গুরুভারের ট্রেনের জন্যে তৈরী করা হয়েছে।

যে সকল ব্যক্তি মুক্ত মস্তিষ্কের (خالي الذهن) অধিকারী, তারা অত্যন্ত সহজ উপায়েই আপন প্রভুকে চিনে তাঁর (প্রভুর) উপাসনায় নিয়োজিত হতে পারে। কিন্তু যদি কেউ সন্দেহের গুরুভার স্কন্ধে ধারণ করে, তবে তাকে প্রস্তর নির্মিত পুল অতিক্রম করতে হবে। আবার যদি কেউ সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বোঝা বহন করে চলে, তবে তাকে এমন কোন পথ নির্বাচন করতে হবে যা শত উঁচু-নীচু ও আঁকা-বাঁকা সত্ত্বেও মজবুত ও দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্মিত।

আমরা এখানে সর্বপ্রথমে খোদা-পরিচিতির সরল পথের প্রতি ইঙ্গিত করব। অতঃপর কোন একটি মাধ্যম সম্পর্কে বর্ণনা করব। কিন্তু দর্শনের মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আঁকা-বাঁকা পথটি শুধুমাত্র তাদেরকেই অতিক্রম

করতে হবে, যাদের মস্তিষ্ক অসংখ্য সন্দেহের দ্বারা সন্দিগ্ধ হয়ে আছে। অথবা তাদের মস্তিষ্ককে সন্দেহ মুক্তকরণের মাধ্যমে পশ্চাদ্ধাবন ও পথভ্রষ্টতার হাত থেকে মুক্তি দেয়ার চেষ্টা করতে হবে ।

সরল উপায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

খোদা-পরিচিতির সরলপথের একাধিক বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১। এ পথ কোন প্রকার জটিল ও কৌশলগত প্রতিজ্ঞার (مقدمة) উপর নির্ভরশীল নয় এবং সরলতম বক্তব্যসমূহই এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে । ফলে, যে কোন স্তরের ব্যক্তিবর্গের পক্ষেই অনুধাবনযোগ্য।

২। এ পথ প্রত্যক্ষভাবে প্রজ্ঞাবান ও পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে থাকে, যা অনেক দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রগত যুক্তি-পথের ব্যতিক্রম। ঐ সকল কালামশাস্ত্র ও দার্শনিক যুক্তিতে সর্বপ্রথমেই 'অনিবার্য অস্তিত্ব' নামে এক অস্তিত্বময় বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং তারপর তার জ্ঞান, শক্তি, প্রজ্ঞা, সৃজনক্ষমতা, প্রতিপালকত্ব এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহকে অপর কোন যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করা আবশ্যক।

৩। এ পথ, অন্য সকল কিছুর চেয়ে ফিতরাতকে জাগ্রত করা ও ফিতরাতগত জ্ঞানের অবহিতকরণের ব্যাপারে ভূমিকা রাখে। এ (ফিত্‌রাতগত জ্ঞানের অবহিতকরণ) বিষয়গুলোর উপর চিন্তার ফলে এমন এক ইরফানী অবস্থা মানুষের দিকে হস্ত প্রসারিত করে যেন খোদার হস্তকে বিভিন্ন জাগতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অবলোকন করে থাকে -সেই হস্ত যার সাথে তার ফিতরাত পরিচিত।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং ঐশী ধর্মসমূহের প্রবক্তাগণ এ পথকে সাধারণ জনসমষ্টির জন্য নির্বাচন করেছেন এবং সকলকে এ পথ অতিক্রম করার জন্যে আহবান জানিয়েছেন; আর অন্যান্য পদ্ধতিসমূহকে, হয় বিশেষ কোন ক্ষেত্রের জন্য একান্তভাবে বরাদ্দ করেছেন, অথবা নাস্তিক্য চিন্তাবিদ ও বস্তুবাদী দার্শনিকদের সাথে তর্ক-বিতর্কের সময় প্রয়োগ করেছেন।

পরিচিত নির্শনসমূহ ঃ

খোদা পরিচিতির সরল পথ হল, এ বিশ্বে বিদ্যমান খোদার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করা এবং কোরানের ভাষায় "আল্লাহর আয়াতসমূহ সম্পর্কে চিন্তাকরণ"। বিশ্বব্রহ্মান্ডের সকল বিষয়বস্তু এবং মানব অস্তিত্বে উপস্থিত বিষয় গুলো যেন পরিচিতির কাঙ্খিত নিদর্শন এবং মানব মানসের সূচক, সে অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে পথ নির্দেশ করে, যে অস্তিত্ব সর্বদা সর্বস্থলে উপস্থিত।

পাঠকমন্ডলী, যে বইটি এখন আপনাদের হস্তে রয়েছে তাও তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনসমূহেরই একটি। যদি তা-ই না হবে তবে কেন এ বইটি পড়ার সময় এর সচেতন ও অভিপ্রায়ী লেখক সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারছেন? কখনো কি এটা সম্ভব বলে মনে করেছেন যে, এ বইটি এক শ্রেণীর বস্তুগত, উদ্দেশ্যহীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে অস্তিত্বে এসেছে এবং এর কোন অভিপ্রায়ী লেখক নেই? এটা ভাবা কি বোকামী নয় যে, কোন একটি ধাতব খণিতে বিস্ফোরণের ফলে ধাতব কণিকাগুলো বর্ণমালায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং ঘটনাক্রমে পত্রপৃষ্ঠে সন্নিবেশিত হয়ে লিখনের সৃষ্টি হয়েছে; অতঃপর অপর একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে সুশৃংখলিত ও বাঁধাইকৃত হয়ে একশত খণ্ডের একটি বিশ্বকোষের উৎপত্তি হয়েছে ?

কিন্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত রহস্যময় ও পান্ডিত্যপূর্ণ এ মহাবিশ্বের উৎপত্তির ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা বলে মনে করা উপরোল্লিখিত বিশ্বকোষের উৎপত্তির ঘটনার চেয়ে সহস্রবার বোকামীর শামিল ।

হ্যাঁ, প্রতিটি পরিকল্পিত বিন্যাস ব্যবস্থাই তার পরিকল্পনাকারীর নিদর্শনস্বরূপ। আর এ ধরনের বিন্যাস ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় এবং সর্বদা এমন এক সামগ্রিক শৃঙ্খলাই প্রকাশ করে যে, এক প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তা একে অস্তিত্বে এনেছেন এবং সর্বাবস্থায় তিনি এর পরিচালনায় নিয়োজিত ।

ফুলগুলো যে পুষ্পকাননে ফুটেছে, আর মাটি কর্দমার মাঝে রঙ বেরঙ সাজে ও সুগন্ধি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ থেকে ফলবৃক্ষ যে অঙ্কুরিত হচ্ছে এবং প্রতিবছর অজস্র সংখ্যক সুবর্ণ, সুগন্ধ ও সুস্বাদু ফল ধারণ করছে; তদ্রূপ নানা বর্ণ, নানা বিশেষত্ব ও নানারূপের অন্যান্য বৃক্ষরাজি

ইত্যাদি সকল কিছুই তাঁরই (খোদার) অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে থাকে ।

অনুরূপ, পুষ্পশাখায় বুলবুলি যে গান গেয়ে যাচ্ছে; ডিম থেকে বের হয়ে মুরগীছানা যে পৃথিবীতে বিচরন করছে; নবজাতক গোবৎস যে মাতৃস্তন চোষণ করছে; দুগ্ধ মাতৃস্তনে নবজাতকের পানের জন্যে যে সঞ্চিত হচ্ছে ইত্যাদি সর্বদা এক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বেরই প্রমাণ বহণ করে থাকে।

সত্যিই, কি এক আশ্চর্য যোগসূত্র ও বিস্ময়কর অভিসন্ধি রয়েছে যুগপৎ শিশুজন্ম ও মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চারের মধ্যে।

মৎসসমূহ যে প্রতিবছর ডিম পাড়ার জন্যে শত শত কিলোমিটার পথ প্রথমবারের মত অতিক্রম করে; সামুদ্রিক প্রাণীসমূহ যে অসংখ্য সামুদ্রিক উদ্ভিদের মাঝে আপন নীড়কে চিনে নেয়, এমনকি একবারের জন্যেও ভুলবশতঃ অপরের বাসায় প্রবেশ করে না, মৌমাছি যে, প্রত্যহ প্রাতে মৌচাক থেকে বের হয়ে যায় আর সুগন্ধযুক্ত ফুলে-ফলে বিচরণ করার জন্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর গোধুলী লগ্নে যে পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে ইত্যাদি তাঁরই নিদর্শন ।

বিস্ময়ের ব্যপার হল, যেমনি মৌমাছিরা তেমনি দুগ্ধবতী গাভী ও ছাগলরা প্রত্যেকেই সর্বদা নিজের প্রয়োজনের চেয়েও অধিক মধু ও দুগ্ধ উৎপাদন করে থাকে, যাতে করে মানুষ এ সুস্বাদু উপাদেয় থেকে উপকৃত হতে পারে!

কিন্তু পরিহাস, অকৃতজ্ঞ মানুষ নিজ বৈভবের পরিচিত মালিককে অপরিচিত বলে মনে করে এবং তাঁর সম্পর্কে তর্কবিতর্কে লিপ্ত হয়!

স্বয়ং এ মানবদেহেও বিস্ময়কর ও সুনিপূন কীর্তির প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। সংশ্লিষ্ট অঙ্গের মাধ্যমে শরীরীয় সংগঠন; সংশ্লিষ্ট উপাঙ্গের মাধ্যমে অঙ্গ সংগঠন; সংশ্লিষ্ট মিলিয়ন মিলিয়ন বিশেষ জীবন্ত কোষের মাধ্যমে উপাঙ্গ সংগঠন; প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের নির্দিষ্ট পরিমাণের সমন্বয়ে কোষ সংগঠন; শরীরের যথাস্থানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সংস্থাপন; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের অভিপ্রেত কর্মতৎপরতা। যেমন ঃ ফুসফুসের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ ও লোহিত রক্তকণিকার মাধ্যমে তা দেহের বিভিন্ন কোষে সঞ্চালন, যকৃতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্লুকোজ উৎপাদন, নূতন কোষসমূহের সরবরাহের

মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের নিরাময় সাধন; শ্বেতকোষের মাধ্যমে আক্রমণকারী ব্যাক্টেরিয়া ও রোগজীবাণুকে প্রতিহতকরণ; একাধিক গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন হরমোনের নিঃসরণ, যেগুলো প্রাণীর শরীরের বিভিন্ন অংশের কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ইত্যাদি সকল কিছু তাঁরই অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে থাকে ।

এই যে বিস্ময়কর বিন্যাস ব্যবস্থা যার সঠিক রহস্য উদঘাটনে শতসহস্র সংখ্যক বিজ্ঞানী কয়েক দশকাব্দী পথ অতিক্রম করার পরও ব্যর্থ হয়েছে -কার মাধ্যমে তা সৃষ্টি হয়েছে ?

প্রতিটি কোষই একটি ক্ষুদ্র ব্যবস্থার সংগঠনে অংশগ্রহণ করে থাকে এবং এক শ্রেণীর কোষসমষ্টি উপাঙ্গসমূহের সংগঠনে অংশ নেয়, যা অপেক্ষাকৃত এক বৃহৎ ব্যবস্থার সংগঠনে অংশ নেয়; অনুরূপ এ ধরনের একাধিক জটিল ব্যবস্থার সমন্বয়ে অভিপ্রেত শারীরিক সামগ্রিক ব্যবস্থা রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু এখানেই এ ঘটনার শেষ নয়, বরং অগণিত প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ অস্তিত্বের সমন্বয়ে বিশ্বপ্রকৃতি নামে অশুল-প্রান্তহীন এক বৃহত্তম ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়, যা একক পান্ডিত্যপূর্ণ পরিকল্পনার ছায়াতলে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয় ।

ذلكم الله فأنى تؤفكون

–তিনিই; অতএব কিভাবে তোমরা সত্য হতে বিচ্যুত হও (সূরা আনআম-৯৫)!

এটা নিশ্চিত যে, মানুষের জ্ঞানের পরিধি যতই বিস্তার লাভ করবে এবং প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সমন্বয় ও নীতি যতই আবিস্কৃত হবে, ততই সৃষ্টির রহস্য উন্মোচিত হতে থাকবে। তবে প্রকৃতির এ সরল সৃষ্টিসমূহ ও সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করাই নিষ্কলুষ ও নির্মল হৃদয়ের জন্যে যথেষ্ট।

পাঠ – ৭

অনিবার্য অস্তিত্বের প্রমাণকরণ

- ভূমিকা
- প্রমাণের বিষয়বস্তু
- সম্ভাব্যতা ও অনিবার্যতা
- কার্য ও কারণ
- কারণের অসীম ধারাবাহিকতা অসম্ভব
- যুক্তির অবতারণা

ভূমিকাঃ

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, ঐশী দার্শনিকগণ এবং কালামশাস্ত্র বিদগণ খোদার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে অসংখ্য যুক্তির অবতারণা করেছেন, যা দর্শন ও কালামশাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমরা ঐগুলোর মধ্যে যে প্রমাণটি অপেক্ষাকৃত কম ভূমিকার প্রয়োজন এবং সহজবোধ্য সেটিকে নির্বাচন করতঃ তার ব্যাখ্যা প্রদান করব। তবে একথা স্বরণযোগ্য যে, এ প্রমাণটি খোদার অস্তিত্বকে শুধুমাত্র "অনিবার্য অস্তিত্ব" শিরোনামে প্রমাণ করে -অর্থাৎ যাঁর অস্তিত্ব অত্যাবশ্যকীয় এবং কোন অস্তিত্ব প্রদানকারীর উপর নির্ভরশীল নয়। অনিবার্য অস্তিত্বকে প্রমাণ করার পর তার 'হ্যাঁ-বোধক' বৈশিষ্ট্য (صفت الثبوتية) ও 'না-বোধক' বৈশিষ্ট্যকে (صفت السلبية) অপর এক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। 'হ্যাঁ-বোধক' বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ হল জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি এবং 'না-বোধক' বৈশিষ্টের উদাহরণ হল অশরীরীয় হওয়া, নির্দিষ্ট স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ না হওয়া।

প্রমাণের বিষয়বস্তু ঃ

অস্তিত্বশীল বিষয়সমূহ, (বুদ্ধিবৃত্তিক মতে) হয় অনিবার্য অস্তিত্ব অথবা সম্ভাব্য অস্তিত্ব এবং কোন অস্তিত্বশীল বিষয়ই বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এ দু'ধারণার বর্হিভূত হতে পারে না। সকল অস্তিত্বশীল বিষয়ই সম্ভাব্য অস্তিত্ব হতে পারে না। কেননা, সম্ভাব্য অস্তিত্ব কারণের মুখাপেক্ষী। সুতরাং যদি সমস্ত কারণসমূহ সম্ভাব্য অস্তিত্ব হয়ে থাকে, তবে প্রত্যেকটি কারণকেই অপর এক কারণের মুখাপেক্ষী হতে হবে। ফলে কখনোই কোন অস্তিত্বশীল বিষয় বাস্তব রূপ লাভ করবে না। অন্যভাবে বলা যায় ঃ কারণের ধারাবাহিকতা অসম্ভব। অতএব অস্তিত্বশীল বিষয়সমূহের কারণসমূহ ধারাবাহিকভাবে এমন এক অস্তিত্বশীল বিষয়ে উপনীত হয়, যা স্বয়ং অপর অস্তিশীল বিষয়ের ফলশ্রুতি নয় অর্থাৎ যা হবে অনিবার্য অস্তিত্ব। এ প্রমাণটি খোদার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্যে দর্শনের একটি সরলমত প্রমাণ, যা কয়েকটি খাঁটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিজ্ঞা দ্বারা রূপ লাভ করেছে এবং কোন প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয় । তবে যেহেতু এ প্রমাণটিতে দার্শনিক পরিভাষা ও ভাবার্থসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে, সেহেতু যে সকল প্রতিজ্ঞা ও পরিভাষার মাধ্যমে, উল্লেখিত প্রমাণটি রূপ

পরিগ্রহ করেছে তাদের সম্পর্কে আলোকপাত করা অনিবার্য ।

সম্ভাব্যতা ও অনিবার্যতা ঃ

প্রতিটি প্রতিজ্ঞাই (যতই সরল হোক না কেন) কমপক্ষে দুটি মৌলিক ভাবার্থ যথা ঃ উদ্দেশ্য (موضوع) ও বিধেয় (محمول) নিয়ে গঠিত হয়। যেমন ঃ সূর্য্য উজ্জল এ প্রতিজ্ঞাটিতে "সূর্য" হল উদ্দেশ্য আর "উজ্জ্বল" হল বিধেয় এবং প্রতিজ্ঞাটি সূর্যের জন্যে উজ্জ্বলতাকে প্রতিপাদন করে থাকে ।

উদ্দেশ্যের জন্যে বিধেয়ের প্রতিপাদন তিনটি অবস্থার ব্যতিক্রম হতে পারে না। হয় অসম্ভব যেমন : "৪ অপেক্ষা ৩ বড়," অথবা অনিবার্য যেমন ঃ "৪ এর অর্ধেক হল ২" নতুবা অসম্ভব বা অনিবার্য এ দুয়ের কোনটি নয় যেমন ঃ সূর্য আমাদের মাথার উপর অবস্থান করছে ।

যুক্তিবিদ্যার পরিভাষায় উপরোক্ত প্রথম ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞার সম্পর্ককে নিষিদ্ধ (امتناع), দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞার সম্পর্ককে "অনিবার্য (ضرورت) বা আবশ্যকীয় (وجوب) তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞার সম্পর্ককে "সম্ভাবনা "(امكان) (বিশেষ অর্থে) গুণসম্বলিত বলা হয়ে থাকে ।

দর্শনে 'অস্তিত্বশীল বিষয়' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে। যা কিছু নিষিদ্ধ ও অসম্ভব তা কখনোই বাস্তব রূপ লাভ করে না (তাই এ বিষয়ের আলোচনা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হয় না)। ফলে দর্শনশাস্ত্র, অস্তিত্বশীল বিষয়সমূহকে বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তিতে অনিবার্য অস্তিত্ব ও সম্ভাব্য অস্তিত্ব এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছে।

অনিবার্য অস্তিত্ব বলতে বুঝায়, যে অস্তিত্বশীল বিষয় নিজ থেকেই অস্তিত্বশীল এবং তার এ অস্তিত্বের জন্যে অপর কোন অস্তিত্বশীল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। ফলে স্বভাবতঃই এ ধরনের অস্তিত্ব অনাদি ও অনন্ত হবে। কারণ, কোন এক সময় কোন কিছুর অনুপস্থিতির অর্থ হল তার অস্তিত্ব নিজ থেকে নয় এবং অস্তিত্বে আসার জন্যে অপর এমন কোন অস্তিত্বশীলের উপর নির্ভর করতে হয় যে তার উপাস্থিতি হল (এর উপস্থিতির জন্যে) শর্ত ও কারণ স্বরূপ; আর তার অনুপস্থিতিতে এর অস্তিত্ব থাকে না।

সম্ভাব্য অস্তিত্ব হল তা, যা নিজ থেকে অস্তিত্বশীল নয় এবং যার অস্তিত্বশীলতার জন্যে অপর কোন অস্তিত্বের উপর নির্ভর করতে হয়।

অস্তিত্বের এ শ্রেণীবিভাগ বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তিতে করা হয়েছে এবং সংগত কারণেই তা নিষিদ্ধ অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তবে বাস্তব অস্তিত্বসমূহ এ দু'বিভাগের (অনিবার্য অস্তিত্ব ও সম্ভাব্য অস্তিত্ব) কোনটির অন্তর্ভুক্ত সে সম্পর্কে কোন দিকনির্দেশনা নেই। অন্য কথায়, এ ব্যাপারটিকে তিন ভাবে অনুধাবণ করা যেতে পারে। যথা ঃ

প্রথমতঃ সকল অস্তিত্বই হল অনিবার্য অস্তিত্ব।

দ্বিতীয়তঃ সকল অস্তিত্বই হল সম্ভাব্য অস্তিত্ব।

তৃতীয়তঃ কোন কোনটি হল অনিবার্য অস্তিত্ব আবার কোন কোনটি হল সম্ভাব্য অস্তিত্ব।

প্রথম ও তৃতীয় ধারণায় 'অনিবার্য অস্তিত্ব' বিদ্যমান। অতএব এ ধারণাটিকেই (দ্বিতীয়) আলোচনার বিষয়বস্তুরূপে স্থান দিতে হবে যে, 'সকল অস্তিত্বই কি সম্ভাব্য অস্তিত্ব হওয়া সম্ভব, না কি অসম্ভব'? আর এ ধারণাটির অপনোদনের মাধ্যমেই 'অনিবার্য অস্তিত্বের' ধারণা চূড়ান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় যদিও তার একত্ব এবং অন্যান্য গুণকে প্রতিপাদনের জন্যে অন্য কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করা আবশ্যক।

অতএব, দ্বিতীয় ধারণাটিকে পরিত্যাগ করার জন্যে অপর একটি প্রতিজ্ঞাকে উল্লেখিত প্রমাণের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। আর তা হল এই যে, 'সকল অস্তিত্বই সম্ভাব্য অস্তিত্ব হওয়া অসম্ভব'। তবে এ প্রতিজ্ঞাটি স্বতঃসিদ্ধ নয়। এ কারণে একে নিম্নরূপে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক ঃ

সম্ভাব্য অস্তিত্ব কারণের উপর নির্ভরশীল এবং কারণের অসীম ধারাবাহিকতা অসম্ভব। অতএব কারণসমূহ তাদের ধারাবাহিকতায় এমন এক অস্তিত্বে গিয়ে পৌঁছতে হবে যা কারণের উপর নির্ভরশীল নয়। আর তা-ই হল 'অনিবার্য অস্তিত্ব'। সুতরাং সকল অস্তিত্বই সম্ভাব্য অস্তিত্ব নয়। আর এখান থেকেই অপর এক দার্শনিক বিষয়ের সূত্রপাত ঘটে, যার ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন।

কার্য ও কারণ ঃ

যদি কোন অস্তিত্বশীল বিষয় অপর কোন অস্তিত্বশীল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয় এবং তার অস্তিত্ব অপরটির অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তবে দর্শনের পরিভাষায় নির্ভরশীল অস্তিত্বকে কার্য (معلول) এবং অপরটিকে কারণ (علت) নামকরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কারণ নিরঙ্কুশভাবে অনির্ভরশীল নাও হতে পারে, বরং 'কারণ' নিজেও নির্ভরশীল ও অন্য কোন অস্তিত্বশীলের কার্য, হতে পারে। আর যদি কোন কারণের (অপর কোন কারণের উপর) কোন প্রকার নির্ভরশীলতা ও নির্ভরতা না থাকে তবে ঐ কারণকে ' নিরঙ্কুশ কারণ' এবং 'সম্পূর্ণরূপে অনির্ভরশীল কারণ' বলা যেতে পারে।

এ পর্যন্ত আমরা কারণ ও কার্যের দার্শনিক পরিভাষা এবং তাদের সংজ্ঞা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এখন আমাদেরকে এ প্রতিজ্ঞাটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে যে, 'সকল সম্ভাব্য অস্তিত্বই কারণের উপর নির্ভরশীল'।

'সম্ভাব্য অস্তিত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না' এ বাক্যের আলোকে বলা যায় উহার অস্তিত্ব, অপর কোন অস্তিত্বশীল বিষয় বা বিষয়সমূহের বাস্তব রূপ পরিগ্রহণের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য। কারণ এ উক্তিটি (قضيه) স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রত্যেক বিধেয়ই (محمول) যা উদ্দেশ্যের (موضوع) জন্যে বিবেচনায় নেয়া হয় তা হয় নিজ থেকেই বিদ্যমান (সত্তাগতভাবে) অথবা অন্য কোনভাবে (পরগতভাবে) বিদ্যমান। যেমন ঃ কোন বস্তু হয় নিজ থেকেই আলোকিত হয়ে থাকে অথবা অন্য কোন কিছুর আলোর মাধ্যমে আলোকিত হয়ে থাকে। প্রতিটি বস্তুই হয় নিজে থেকেই তৈলাক্ত অথবা অন্য কোন কিছুর (তৈলের) মাধ্যমে তৈলাক্ত হয়ে থাকে । এটা অসম্ভব যে, কোন কিছু না স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলোকিত বা তৈলাক্ত হবে, না অন্য কিছুর মাধ্যমে যা সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা গুণসমন্বিত; আর এমতাবস্থায় তা তৈলাক্ত বা আলোকিত, এ গুণের অধিকারী হবে ?

অতএব, কোন উদ্দেশ্যের (موضوع) জন্যে অস্তিত্বের প্রতিপাদন হয়, সত্তাগতভাবে অথবা পরগত ভাবে হয়ে থাকে এবং যখন সত্তাগতভাবে না হয়, তখন পরগতভাবে হওয়া অনিবার্য। ফলে যে সকল সম্ভাব্য অস্তিত্ব স্বয়ংক্রীয়ভাবে

অস্তিত্বশীল গুণাবলীতে ভূষিত না হয়, সে সকল অস্তিত্ব অপর কোন অস্তিত্বশীলের সহায়তায় অস্তিত্বে আসে এবং তার কার্য রূপে (معلول) পরিগণিত হয়।

কিন্তু অনেকের মতে কার্যকারণ বিধির (Causality) প্রকৃত অর্থ হল সকল অস্তিত্বই কারণের উপর নির্ভরশীল, আর এর ভিত্তিতে সমস্যা সৃষ্টি করে থাকেন যে, খোদার জন্যেও কোন কারণকে বিবেচনা করা আবশ্যক! তবে তারা এ কথাকে বিস্মৃত হয়েছেন যে, কার্যকারণ বিধির উদ্দেশ্য (موضوع) নিরঙ্কুশ অস্তিত্ব নয় বরং এর উদ্দেশ্য (موضوع) হল 'সম্ভাব্য অস্তিত্ব' ও কার্য। অর্থাৎ সকল নির্ভরশীল বা পরগত অস্তিত্বই কারণের উপর নির্ভরশীল, না সকল অস্তিত্বই।

কারণের অসীম ধারাবাহিকতা অসম্ভব ঃ

এ প্রমাণের জন্যে ব্যবহৃত সর্বশেষ প্রতিজ্ঞাটি হল, কারণের ধারাবাহিকতা এমন এক অস্তিত্বে গিয়ে শেষ হতে বাধ্য যে, ঐ অস্তিত্ব অপর কোন কারণের কার্য (معلول) নয়। অর্থাৎ পারিভাষিক অর্থে কারণের ধারাবাহিকতা অসীম পর্যন্ত অসম্ভব। আর এ প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রথম কারণরূপে অনিবার্য অস্তিত্ব অর্থাৎ যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্তিত্বশীল এবং অপর কোন অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়, তা প্রতিপাদিত হয়ে থাকে ।

দর্শন, কারণের ধারাবাহিকতাকে রহিতকরণের জন্যে একাধিক যুক্তির অবতারণা করেছে। তবে সত্যিকার অর্থে কারণের অসীম ধারাবাহিকতার অসারতা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ এবং কিঞ্চিৎ চিন্তা করলেই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ 'কার্যের অস্তিত্ব কারণের উপর নির্ভরশীল এবং উক্ত কারণের শর্তাধীন' যদি এ নিয়মতান্ত্রিকতা সার্বজনীন বলে মনে করা হয়, তবে কখনোই কোন কিছু অস্তিত্ব লাভ করবে না । কারণ, নির্ভরশীল অস্তিত্বের সমষ্টি, অপর কোন অস্তিত্ব অর্থাৎ যার উপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে, তা ব্যতীত অস্তিত্বে আসার ধারণা বিবেক সম্পন্ন হতে পারে না ।

মনে করা যাক, এক দল দৌড় প্রতিযোগী দৌড় শুরু করার জন্যে প্রারম্ভিক রেখায় প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রত্যেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি তার পরবর্তী ব্যক্তি শুরু না করে তবে সেও শুরু করবে না। যদি তাদের এ সিদ্ধান্ত সার্বজনীন হয়, তবে কখনোই কোন প্রান্ত থেকেই দৌড় প্রতিযোগিতা বাস্তবায়িত হবে না ।

অনুরূপ যদি প্রতিটি অস্তিত্বই অপর অস্তিত্বের শর্তাধীন হয় তবে কখনোই কোন অস্তিত্ব বাস্তবরূপ লাভ করবে না। বাস্তব অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ হল, অনির্ভরশীল ও শর্তহীন অস্তিত্বেরই প্রমাণ বাহক।

যুক্তির অবতারণা ঃ

এখন উপরোল্লিখিত প্রতিজ্ঞাসমূহের (مقدمات) আলোকে যুক্তিটিকে উপস্থাপন করব ঃ

অস্তিত্বশীল বলে পরিগণিত প্রতিটি বিষয়ই নিম্নলিখিত দু'অবস্থার বহিঃর্ভূত হতে পারে না ঃ হয় অস্তিত্ব তার জন্যে অনিবার্য এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্তিত্বশীল অর্থাৎ 'অনিবার্য অস্তিত্ব' অথবা অস্তিত্ব তার জন্যে অনিবার্য নয় এবং অপর কোন অস্তিত্বের মাধ্যমে অস্তিত্বে এসেছে; অর্থাৎ সম্ভাব্য অস্তিত্ব। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, যদি কোন কিছুর অস্তিত্বলাভ অসম্ভব হয়ে থাকে, তবে কখনোই তা অস্তিত্ব লাভ করবে না এবং কোন অবস্থাতেই তা অস্তিত্বশীল বলে পরিগণিত হতে পারে না।

অতএব, সকল অস্তিত্বশীল বিষয়ই (موجود) হয়, 'অনিবার্য অস্তিত্ব' হবে অথবা সম্ভাব্য 'অস্তিত্ব' হবে।

'সম্ভাব্য অস্তিত্বের' ভাবার্থের প্রতি নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, এ অর্থের যথার্থ ভাবের অধিকারী সকল কিছুই হল কার্য (معلول) যেগুলো কারণের উপর নির্ভরশীল। কারণ কোন অস্তিত্বশীল বিষয় যদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্তিত্বশীল না হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই অপর কোন অস্তিত্বশীলের মাধ্যমে অস্বিত্বে এসেছে। যেমনঃ যদি কোন বৈশিষ্ট্য সত্তাগতভাবে (بالذات) না হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই পরগত ভাবে (بالغير) হবে। আর কার্যকারণ বিধির

তাৎপর্যও হল তা-ই যে, প্রত্যেক 'নির্ভরশীল অস্তিত্ব' বা 'সম্ভাব্য অস্তিত্বই' কারণের উপর নির্ভরশীল, না সকল অস্তিত্বই; যাতে বলার অবকাশ থাকবে যে খোদাও কারণের উপর নির্ভরশীল অথবা কারণবিহীন খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হল কার্যকারণ বিধির পরিপন্থী।

অপরপক্ষে, যদি সকল অস্তিত্বশীলই সম্ভাব্য হয় এবং কারণের উপর নির্ভরশীল হয়, তবে কখনোই কোন অস্তিত্ব বাস্তবরূপ লাভ করবে না। আর এ ধরনের ধারণার দৃষ্টান্ত ঐরূপ যে, কোন দলের সকল সদস্যই অপর সদস্যের শুরুকরণের শর্তাধীন এবং ঐ অবস্থায় কোন কিছুই ঘটবে না।

অতএব, বাস্তব অস্তিত্বসমূহের উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে, এক 'অনিবার্য অস্তিত্বের' (واجب الوجود) অস্তিত্ব বিদ্যমান।

পাঠ – ৮

আল্লাহর গুণসমূহ

- ভূমিকা
- আল্লাহর অনাদি ও অনন্ত হওয়া
- না–বোধক গুণ
- অস্তিত্বদানকারী কারণ
- অস্তিত্বদানকারী কারণের বিশেষত্ব

ভূমিকা ঃ

পূর্ববর্তী পাঠসমূহে বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ দার্শনিক যুক্তির সারবত্তা হল 'অনিবার্য অস্তিত্ব' নামক এক অস্তিত্বশীলকে প্রতিপাদন করা। আর অপর এক শ্রেণীর যুক্তির অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তার 'হ্যাঁ-বোধক' ও 'না-বোধক' গুণগুলো প্রমাণিত হয়ে থাকে। এরূপে মহান আল্লাহকে তাঁর বিশেষ গুণসমূহ অর্থাৎ যেগুলো তাঁকে সকল সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র করে সেগুলোসহ শনাক্ত করা হয়ে থাকে। অন্যথায় শুধুমাত্র 'অনিবার্য অস্তিত্ব' হওয়াই তাঁর (আল্লাহর) পরিচিতির জন্যে যথেষ্ট নয়। কারণ কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে, পদার্থ অথবা শক্তির মত বিষয়গুলোও অনিবার্য অস্তিত্বের দৃষ্টান্ত হতে পারে। আর এ কারণে একদিকে যেমনি, প্রভুর 'না-বোধক' গুণগুলোকে প্রমাণ করতে হবে যাতে বোধগম্য হয় যে 'অনিবার্য অস্তিত্ব' বস্তুর জন্যে নিদিষ্ট গুণে গুণান্বিত হওয়া থেকে পবিত্র এবং কোন সৃষ্টির সদৃশ হতে পারে না; তেমনি অপর দিকে তাঁর 'হ্যাঁ-বোধক' গুণগুলোকে ও প্রমাণ করতে হবে, যাতে উপাসনার জন্যে তাঁর উপযুক্ততা প্রতিভাত হয় এবং অন্যান্য বিশ্বাস যেমন ঃ নবুওয়াত, কিয়ামত ও এদের শাখাসমূহকে প্রমাণ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

পূর্ববর্তী যুক্তিগুলো থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, 'অনিবার্য অস্তিত্ব' কারণের উপর নির্ভরশীল নয় এবং সম্ভাব্য অস্তিত্বসমূহের জন্যই 'কারণ' প্রয়োজন। অর্থাৎ অনিবার্য অস্তিত্বের দু'টি গুণ প্রতিষ্ঠিত হল ঃ একটি হল, অপর যে কোন অস্তিত্বশীলের উপর তাঁর অনির্ভরশীলতা। কেননা যদি অপর কোন অস্তিত্বশীলের উপর ন্যূনমত নির্ভরশীলতাও থাকে, তবে ঐ অস্তিত্বশীল তাঁর কারণ রূপে পরিগণিত হবে। যেহেতু আমরা জেনেছি যে, কারণের অর্থই (দর্শনের পরিভাষায়) হল, অপর কোন অস্তিত্বশীল তার উপর নির্ভরশীল হবে। আর অপর প্রতিষ্ঠিত গুণটি হল, সকল সম্ভাব্য অস্তিত্বই, তার (অনিবার্য অস্তিত্ব) কার্য (معلول) এবং তার উপর নির্ভরশীল এবং তিনিই হলেন তাদের সৃষ্টির জন্যে সর্বপ্রথম কারণ।

এখন, উপরোল্লিখিত দু'উপসংহার থেকে তাদের প্রত্যেকের অবিয়োজ্য বিষয়সমূহকে বর্ণনা করব এবং 'অনিবার্য অস্তিত্বের' 'হ্যাঁ-বোধক' ও 'না-বোধক' গুণসমূহকে প্রতিপাদন করব। তবে তাদের (হ্যাঁ-বোধক ও না-বোধক গুণ) প্রতিটির জন্যে দর্শন ও কালামশাস্ত্রে একাধিক প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু

আমরা সহজে আয়ত্তকরণের নিয়মাধীন ও পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুসমূহের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে ঐ সকল যুক্তিকেই নির্বাচন করব যেগুলো পূর্বোল্লিখিত যুক্তিসমূহের সাথে তাদের সম্পর্ককে সংরক্ষণ করবে।

আল্লাহর অনাদি ও অনন্ত হওয়া ঃ

যদি কোন অস্তিত্বশীল অপর কোন অস্তিত্বশীলের (কারণ) কার্য (معلول) ও ঐ অস্তিত্বশীলের উপর র্নিভরশীল হয় তবে তার অস্তিত্ব ঐ অস্তিত্বশীলাধীন হবে এবং ঐ কারণের অনুপস্থিতিতে তা অস্তিত্বে আসতে পারবে না। অর্থাৎ কোন এক সময় কোন এক অস্তিত্বশীলের অস্তিত্বহীনতা তার নির্ভরশীলতা ও সম্ভাব্য অস্তিত্ব হওয়ারই প্রমাণবহ। যেহেতু অনিবার্য অস্তিত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিদ্যমান এবং কোন অস্তিত্বের উপরই নির্ভরশীল নয় সেহেতু সর্বদাই বিরাজমান থাকবে।

এ প্রক্রিয়ায় অনিবার্য অস্তিত্বের জন্যে অপর দু'টি গুণ প্রমাণিত হল। একটি হল 'অনাদি' অর্থাৎ ইতিপূর্বে কখনোই অস্তিত্বহীন ছিল না এবং অপরটি হল 'অনন্ত অর্থাৎ ভবিষ্যতেও কখনো বিলুপ্ত হবে না। কখনো কখনো এ দু'টি গুণকে সম্মিলিত ভাবে 'চিরন্তনত্ব' (سرمدی) বলা হয়ে থাকে।

অতএব, যে অস্তিত্বশীলের অস্তিত্বহীনতার পূর্বদৃষ্টান্ত অথবা বিলুপ্তির সম্ভাবনা থাকবে, সে অস্তিত্বশীল 'অনিবার্য অস্তিত্ব' হবে না। সুতরাং বস্তুগত বিষয়ের 'অনিবার্য অস্তিত্ব' হওয়ার ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন হল।

না-বোধক গুণ ঃ

অনিবার্য অস্তিত্বের অপর একটি অবিয়োজ্য বিষয় হল অবিভাজ্যতা (بساطة) অর্থাৎ যৌগিক বা অংশসমূহের সমন্বয় না হওয়া। কারণ, সকল যৌগই এর অংশগুলির উপর নির্ভরশীল। আর অনিবার্য অস্তিত্ব সকল প্রকার নির্ভরশীলতা থেকে পবিত্র ও মুক্ত ।

যদি মনে করা হয় যে,'অনিবার্য অস্তিত্বের' অংশগুলো তাৎক্ষণিকভাবে অস্তিত্বশীল নয়, যেন একটি কল্পিত সরলরেখার দু'টি অংশ, তবে এ ধরনের ধারণাও পরিত্যাজ্য। কারণ যদি কোন কিছু অংশে বিভক্ত হওয়ার সামর্থ্য রাখে, তবে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তা বিভাজ্য হবে, যদিও বাস্তবে তার প্রকাশ না-ও ঘটে থাকে। আর বিভাজ্যতার সম্ভাবনা মানে হল বিলুপ্তির সম্ভাবনা। যেমন ঃ যদি এক মিটার রেখা, দুটি অর্ধমিটারে বিভক্ত হয়, তবে আর 'এক মিটার রেখার' অস্তিত্ব থাকবে না। অপর দিকে আমরা ইতিপূর্বে জানতে পেরেছি যে, অনিবার্য অস্তিত্বের বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই ।

আবার যেহেতু তাৎক্ষণিক (بالفعل) ও সামর্থ্যগতভাবে (بالقوة) এশাধিক অংশের সমন্বয় হল বস্তুর বিশেষত্ব, সেহেতু প্রমাণিত হয় যে, কোন বস্তুগত অস্তিত্বই অনিবার্য অস্তিত্ব হতে পারে না। অর্থাৎ খোদার অবস্তুগত হওয়া (تجرد) প্রমাণিত হল। অনুরূপ স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ (বাহ্যিক) চোখের মাধ্যমে দর্শনযোগ্য নন এবং অপর কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেও অনুধাবনযোগ্য নন। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা হল বস্তু ও বস্তুগত বিশেষত্ব।

অপরদিকে বস্তুগত হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করার সাথে সাথে বস্তু ও অন্যান্য বস্তুগত বিশেষত্ব যেমন ঃ নিদিষ্ট স্থান ও কালও অনিবার্য অস্তিত্ব' থেকে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ স্থান এমন কিছুর জন্যেই ভাবা যায় যা আয়তন ও বিস্তার বিশিষ্ট হয়। অনুরূপ নির্দিষ্ট কালবিশিষ্ট সকল কিছুই আয়ুষ্কালের বিস্তারের দৃষ্টিতে বিভাজনযোগ্য। আর এটাও এক ধরনের সীমাবদ্ধতা এবং সামর্থ্যগতভাবে (بالقوّة) অংশের সমন্বয়রূপে পরিগণিত। অতএব মহান আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট স্থান ও কালকে কল্পনা করা যায় না এবং নির্দিষ্ট স্থান ও কালবিশিষ্ট কোন অস্তিত্বই অনিবার্য অস্তিত্ব হতে পারে না। সর্বশেষে, অনিবার্য অস্তিত্ব থেকে নির্দিষ্ট কালের অস্বীকৃতির মাধ্যমে গতি, বিবর্তন এবং বিকাশও তাঁর থেকে নিষিদ্ধ হয়। কারণ কোন গতি ও পরিবর্তনই কালাতিক্রম ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না ।

অতএব যারা আল্লাহর জন্যে 'আরশ' নামক নির্দিষ্ট স্থানের কথা বলে থাকেন অথবা আসমান থেকে অধঃগমন ও স্থানান্তরিত হন বলে মনে করেন অথবা চর্মচক্ষুর মাধ্যমে দর্শনযোগ্য বলে বিশ্বাস করে থাকেন; অথবা তাঁকে বিবর্তন ও বিকাশমান বলে গণনা করে থাকেন , তারা প্রকৃতপক্ষে মহান

আল্লাহকে সঠিকরূপে চিনতে পারেননি ।[৭]

সর্বোপরি যে কোন প্রকারের ভাবার্থ যা এক ধরনের ঘাটতি, সীমাবদ্ধতা ও নির্ভরশীলতার প্রমাণবহ, তা মহান আল্লাহর জন্যে নিষিদ্ধ হয়ে থাকে এবং আল্লাহর 'না-বোধক' গুণ বলতে এটাই বুঝানো হয়েছে ।

অস্তিত্বদানকারী কারণ ঃ

পূর্ববর্তী যুক্তিসমূহ থেকে আমরা এ উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে, 'অনিবার্য অস্তিত্বই' হল সকল 'সম্ভাব্য অস্তিত্বের' কারণ। এখন আমরা এ উপসংহারের অবিচ্ছেদ্য বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করব। তবে প্রথমেই কারণের প্রকরণগুলো সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করব। অতঃপর প্রভুর কারণত্বের বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব।

কারণের সাধারণ অর্থ, সকল অস্তিত্বশীল অর্থাৎ যেগুলোর উপর অপর কোন অস্তিত্ব নির্ভরশীল, সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এমনকি শর্তসমূহ এবং সহায়কসমূহকেও সমন্বিত করে থাকে। সুতরাং মহান আল্লাহর জন্যে কারণ না থাকার অর্থ হল, অন্য কোন অস্তিত্বের উপর কোন প্রকারের নির্ভরশীলতা না থাকা। এমনকি কোন প্রকারের শর্ত ও সহায়কও তাঁর জন্যে কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু সৃষ্টির জন্যে আল্লাহর কারণ হওয়ার অর্থ হল, অস্তিত্বদাতা অর্থে, যা কর্তৃকারণের (علت فاعلی) এক বিশেষ শাখা। এর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্যে বিভিন্ন প্রকার কারণের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করব এবং এদের বিস্তারিত ব্যাখ্যার দায়িত্ব দর্শনশাস্ত্রের উপর প্রদান করব।

৭। 'জায়গা দখল, আরশ থেকে অধঃগমন এবং চর্মচক্ষুর মাধ্যমে দর্শনযোগ্য' এ ধারণা পোষণ করে থাকেন আহলে সুন্নতের একটি বিশেষ গোষ্ঠী । আর 'বিবর্তন ও বিকাশের 'ধারণা পোষণ করে থাকেন হেগেল, বার্গসন, উইলিয়াম জিমস্ ও ওয়াইটহেডের মত পশ্চিমা দার্শনিকগণ। তবে মনে রাখা উচিৎ যে, গতি ও অবস্থার পরিবর্তনকে খোদা থেকে নিষিদ্ধ করণের অর্থ এনয় যে, তিনি স্থির ও অনড়। বরং তার সত্তাগত স্থিতিকে (ثبات) বুঝান হয়েছে এবং স্থিতি হল পরিবর্তনের বিপরীত (نقیض), কিন্তু স্থিরতা ও গতির সম্পর্ক হল (عدم الملکه) আর গতিশীলতায় সক্ষম কোন কিছু ব্যতীত এ গুণে গুণান্বিত হয় না।

আমরা জানি যে, বৃক্ষ উদ্গাত হওয়ার জন্যে বীজ, উপযুক্ত মাটি এবং আবহাওয়ার প্রয়োজন। অনুরূপ একটি প্রাকৃতিক বা মানবীয় কার্যনির্বাহীরও প্রয়োজন, যে বীজটিকে মাটিতে বপন করবে এবং তাতে পানি সরবরাহ করবে। এদের প্রত্যেকেই উল্লেখিত কারণের সংজ্ঞানুসারে বৃক্ষের উদ্গাতির কারণ।

এ বিভিন্ন প্রকারের কারণসমূহকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন ঃ যে সকল কারণ কার্যের বিদ্যমানতার জন্যে সর্বদাই অপরিহার্য সেগুলোকে প্রকৃত কারণ (علل الحقيقية) বলা হয়ে থাকে এবং যে সকল কারণ কার্যের বিদ্যমানতার জন্যে অপরিহার্য নয় (যেমন ঃ কৃষক ফসলের জন্যে) সেগুলোকে সহায়ক কারণ (علل الاعدادى অথবা معدات) বলা হয়ে থাকে। অনুরূপ প্রতিস্থাপনযোগ্য কারণকে প্রতিস্থাপিত কারণ (علل البدلى) এবং অন্যান্য কারণসমূহকে স্বতন্ত্র কারণ (علل الانحصارى) বলা হয়ে থাকে।

এ ছাড়া অপর একশ্রেণীর কারণ আছে, যেগুলো উপরোক্ত বৃক্ষের উদ্গাতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা থেকে স্বতন্ত্র এবং এদের দৃষ্টান্তকে আত্মা (النفس) বিষয়ক ক্ষেত্রে বা কোন কোন আত্মিক বিষয়ে পরিলক্ষণ করা যেতে পারে। উদাহরণতঃ যখন মানুষ তার মস্তিষ্কে একটি চিত্র গঠন করে অথবা কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন, মস্তিষ্কপ্রসূত চিত্র ও ইচ্ছা নামক এমন একধরনের আত্মিক ও মানস সৃষ্টি রূপ পরিগ্রহ করে, যাদের অস্তিত্ব আত্মার উপর নির্ভরশীল এবং দৃষ্টিকোণ থেকে ঐগুলো আত্মার কার্য (معلول) বলে পরিগণিত। কিন্তু এ ধরনের কার্য (معلول) এমন যে, কখনই তাদের কারণ থেকে স্বাধীনরূপে বিরাজ করে না এবং উক্ত কারণ ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। এছাড়া মস্তিষ্কে অংকিত ছবি অথবা ইচ্ছার ক্ষেত্রে আত্মার ভূমিকা এমন সকল শর্তের অধীন যে, তার ঘাটতি, সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাব্য অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ।

অতএব, এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিতে অনিবার্য অস্তিত্বের ভূমিকা আত্মিক বিষয়ের ক্ষেত্রে আত্মার ভূমিকা অপেক্ষাও বৃহত্তর ও পূর্ণতর এবং অতুলনীয়। কারণ, তিনি কোন প্রকারের সাহায্য ব্যতিরেকেই তাঁর সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করে থাকেন এবং ঐ সৃষ্টি সমস্ত সত্তা নিয়েই তাঁর উপর নির্ভরশীল ।

অস্তিত্বদানকারী কারণের বিশেষত্ব ঃ

পূর্ববর্তী আলোচনার উপর ভিত্তি করে অস্তিত্বদানকারীকারণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে ঃ

১। অস্তিত্বদাতা কারণকে চূড়ান্ত পর্যায়ে সকল কার্যের (معلول) পূর্ণতার (کمالات) অধিকারী হতে হবে যাতে প্রত্যেক সৃষ্টিকে (موجود) তার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী দান করতে পারে -যা সহায়ক ও অন্যান্য বস্তুগত কারণের ব্যতিক্রম । কারণ ঐ কারণগুলো শুধুমাত্র কার্যের (معلول) পরিবর্ধন ও বিবর্তনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং ঐগুলোর (বিবর্তন ও পরিবর্ধন) চূড়ান্তরূপের অধিকারী হওয়া তাদের জন্যে অপরিহার্য নয়। যেমন ঃ মাটিকে উদ্ভিজ্জ পূর্ণতার অধিকারী হওয়া অপরিহার্য নয় অথবা পিতা-মাতাকে সন্তানের পূর্ণত াবা উৎকর্ষের অধিকারী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু অস্তিত্বদানকারী স্রষ্টাকে তাঁর অবিভাজ্যতা ও অবিশ্লিষ্টতা গুণের পাশাপাশি অস্তিত্বগত সকল পূর্ণতার অধিকারী হতে হবে। [১]

২। অস্তিত্বদানকারী কারণ স্বীয় কার্যকে (معلول) অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করে থাকে। এক কথায় তাকে সৃষ্টি করে থাকে এবং এ সৃষ্টির ফলে তার অস্তিত্ব থেকে কিছুই হ্রাস পায় না। অথচ প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহের ভূমিকা শুধুমাত্র কার্যের (معلول) রূপান্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যার জন্যে শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করতে হয়। অনিবার্য অস্তিত্বের সত্তা থেকে কোন কিছুর বিয়োজনের অর্থ হল, সৃষ্টিকর্তার সত্তাগত বিভাজ্যতা ও পরিবর্তনশীলতা – যার অসারতা ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে ।

৩। অস্তিত্বদানকারী কারণ হল একটি প্রকৃত কারণ (علة الحقيقية) । ফলে কার্যের (معلول) বিদ্যমানতার জন্যেও তার অস্তিত্ব অনিবার্য। কিন্তু সহায়ক কারণের (علة الاعدادى) অস্তিত্ব, কার্যের (معلول)

১। মনে রাখতে হবে সৃষ্টির পূর্ণতার অধিকারী হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তাদের বস্তুগত বৈশিষ্ট্য ও (যেমন ঃ দেহ ও মানুষ) খোদার জন্যে সত্য হবে। কারণ এ বৈশিষ্ট্যগুলো সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণাঙ্গ অস্তিত্বশীলের প্রমাণ বহন করে। ফলে পরিপূর্ণ ও অসীম অস্তিত্বের অধিকারী খোদার জন্যে এটা সত্য হতে পারে না।

জন্যে অপরিহার্য নয়।

অতএব, আহলে সুন্নতের কোন কোন কালামশাস্ত্রবিদগণ থেকে যে বর্ণিত হয়েছে 'এ বিশ্ব, তার বিদ্যমানতার জন্যে স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল নয়' তা সঠিক নয়। অনুরূপ পাশ্চাত্যের কোন কোন দার্শনিক যে বলে থাকেন, 'প্রকৃতি জগৎ ঘড়ির মত সর্বকালের জন্যে একবার দমকৃত হয়েছে এবং গতিময়তার জন্যে আর খোদার উপর তার কোন নির্ভরতা নেই' তাও সত্যবহির্ভূত। বরং এ অস্তিত্বজগৎ সর্বদা সর্বাবস্থায় মহান স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল এবং তিনি যদি এক মুহূর্তের জন্যেও অস্তিত্ব প্রদান থেকে বিরত হন, তবে আর কোন কিছুই বাকী থাকবে না।

যদি হবেন বিস্মৃত
ধ্বংস হবে সমস্ত।

পাঠ – ৯

সত্তাগত গুণাবলী

- ভূমিকা
- সত্তাগত ও ক্রিয়াগত গুণাবলী
- সত্তাগত গুণাবলীর প্রমাণ
- জীবন
- জ্ঞান
- ক্ষমতা

ভূমিকা ঃ

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ, যিনি এ মহাবিশ্বের অস্তিত্বদানকারী কারণ, তিনি অস্তিত্বের সকল প্রকার পূর্ণতার (كمالات) অধিকারী এবং সকল অস্তিত্বশীলে প্রাপ্ত যে কোন প্রকারের উৎকর্ষ তাঁর থেকেই, যার জন্যে তাঁর পূর্ণতা থেকে কোন প্রকার ঘাটতি হয়নি। সহজবোধ্যতার জন্যে কিঞ্চিৎ নিম্নলিখিত উদাহরণটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে ঃ

শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে স্বীয় জ্ঞান থেকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এর ফলে তার জ্ঞানের কোন ঘাটতি হয় না । তবে মহান সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক দানকৃত অস্তিত্ব ও অস্তিত্বগত উৎকর্ষ এ উদাহরণ অপেক্ষা বহুগুণে সমোন্নত এবং সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রে এটাই বলা শ্রেয় যে , অস্তিত্বজগৎ হল পাবিত্র প্রভুসত্তারই দ্যুতি। যেমনটি নিম্নলিখিত কোরানের আয়াত থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি ঃ

الله نور السموات والارض

– আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি (সুরা নূর – ৩৫)

মহান প্রভুর অসীম পূর্ণতা বা কামালতের আলোকে যে সকল ভাবার্থ পূর্ণতার প্রমাণ বহন করবে এবং অপরিহার্যভাবে যে কোন প্রকার সীমাবদ্ধতা ও ঘাটতি থেকে মুক্ত হবে সে সকল ভাবার্থই মহান আল্লহর জন্যে সত্য হবে। যেমনটি, কোরআনের বিভিন্ন আয়াত, রেওয়ায়েত ও হযরত মা'সূমগণের (আঃ) দোয়া ও মোনাজাতসমূহে মহান আল্লাহকে নূর, কামাল, সুন্দর, প্রেমময়, সদানন্দ ইত্যাদি বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে ভূষিত করতে দেখা যায়। কিন্তু ইসলামের আক্বা'য়েদ, দর্শন ও কালামশাস্ত্রে আল্লাহর গুণরূপে যা বর্ণিত হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে খোদার গুণসমূহের মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি গুণ। যেগুলো দু'শ্রেণীতে বিভক্ত (সত্তাগত গুণ ও ক্রিয়াগত গুণ)।

অতএব, সর্বাগ্রে (গুণসমূহের) এ শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করব এবং অতঃপর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গুণের উল্লেখ ও সেগুলির প্রতিপাদনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

সত্তাগত ও ক্রিয়াগত গুণাবলী ঃ

খোদার উপর আরোপিত গুণগুলো, হয় খোদার সত্তাসংশ্লিষ্ট এক প্রকার কামাল বা পূর্ণতার ভাবার্থ হবে যেমন ঃ জীবন, প্রজ্ঞা ও ক্ষমতা অথবা মহান প্রভুর সাথে তাঁর সৃষ্টির সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট ভাবার্থ যেমন ঃ সৃজনক্ষমতা ও জীবিকাদানের ক্ষমতা হবে। প্রথম শ্রেণীর ভাবার্থকে 'সত্তাগত গুণ' এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাবার্থকে 'ক্রিয়াগত গুণ' বলা হয়ে থাকে।

এ দু'শ্রেণীর গুণসমূহের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে প্রথম শ্রেণীর গুণগুলো হল প্রভুর পবিত্র সত্তার অভিন্নরূপ; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর গুণগুলো হল মহান প্রভু ও তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সম্পর্কের প্রকাশক, যেগুলো প্রভুসত্তা ও সৃষ্টিসত্তার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্করূপে বিবেচিত হয়। যেমনঃ সৃজনক্ষমতা, যা প্রভুসত্তার উপর সৃষ্টিসত্তার অস্তিত্বগত সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট গুণ এবং প্রভু ও সৃষ্টিকুলের সংশ্লিষ্টতায় এ সম্পর্ক রূপ লাভ করে । কিন্তু বাস্তবজগতে প্রভুর পবিত্র সত্তা ও সৃষ্টিকুলসত্তা ব্যতীত সৃষ্টিকরণ নামক অপর কোন স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব নেই। তবে মহান প্রভু তাঁর স্বীয় সত্তায় সৃজনক্ষমতার অধিকারী । কিন্তু ক্ষমতা' (قدرت) হল প্রভুর সত্তাগত গুণের অন্তর্ভূক্ত। অপরদিকে 'সৃষ্টিকরণ' অতিরিক্ত গুণের তাৎপর্য বহন করে, যা কার্যক্ষেত্রে বিবেচিত হয়ে থাকে। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে 'সৃজন' প্রভুর ক্রিয়াগত গুণ বলে পরিগণিত হয় – যদিও তা 'সৃজনে সক্ষম' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যা 'ক্ষমতার ' অন্তর্নিহিত বিষয়।

মহান আল্লাহর সত্তাগত গুণগুলোর মধ্যে জীবন (حيات) জ্ঞান (علم) ও ক্ষমতা (قدرت) হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শ্রবণ ও দর্শন যদি শ্রবণীয় ও দার্শনীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী বলতে বা শ্রবণ ও দর্শন ক্ষমতার অধিকারী বুঝানো হয়, তবে তার মূল প্রজ্ঞাবান ও ক্ষমতাবান এ (সত্তাগত) গুণদ্বয়ের দিকেই ফিরে যায়। আবার যদি এদের (শ্রবণ ও দর্শন) অর্থ কার্যগত শ্রবণ ও দর্শন হয়ে থাকে, যা শ্রবণকারী ও দর্শনকারীর সত্তা এবং শ্রবণীয় ও দর্শনীয় বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ক থেকে বিবেচিত হয়ে থাকে, তবে তা ক্রিয়াগত গুণ বলে পরিগণিত হবে। যেমন ঃ কখনো কখনো জ্ঞানও (علم) এরূপক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং তখন তাকে কার্যগত জ্ঞান (علم الفعلى) বলে নামকরণ করা হয় ।

কোন কোন কালামশাস্ত্রবিদ ভাষা (الكلام) ও ইচ্ছাকেও (الارادة) সত্তাগত গুণের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব।

সত্তাগত গুণের প্রমাণ ঃ

জীবন, ক্ষমতা ও জ্ঞানকে প্রমাণের জন্যে সর্বাপেক্ষা সরলতম পথটি হল এই যে, এ ভাবার্থগুলোকে যখন সৃষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখন এগুলো ঐ সৃষ্ট বিষয়সমূহের পূর্ণতাকে প্রকাশ করে। অতএব ঐগুলো (জীবন, প্রজ্ঞা, ক্ষমতা) অস্তিত্বদানকারী কারণের মধ্যে পূর্ণতম পর্যায়ে থাকা আবশ্যক। কারণ যে কোন সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যেই যে কোন প্রকার উৎকর্ষের সন্ধান পাওয়া যাবে, তা প্রকৃতপক্ষে মহান প্রতিপালক আল্লাহ থেকেই প্রাপ্ত এবং এটা কখনোই সম্ভব নয় যে, যিনি জীবন দান করবেন, তিনি জীবনের অধিকারী নন। অনুরূপ, যিনি সৃষ্টিকে জ্ঞান ও ক্ষমতা দিবেন তিনি স্বয়ং অজ্ঞ (جاهل) ও ক্ষমতাহীন হবেন – তাও অসম্ভব ।

অতএব কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে প্রাপ্ত এ পূর্ণতা, মহান সৃষ্টিকর্তার মধ্যে এদের চূড়ান্ত পর্যায়ের সমাহারের প্রমাণ বহন করে থাকে। অর্থাৎ (ঐ গুণগুলোর) কোন প্রকার সীমাবদ্ধতা ও কিঞ্চিৎ পরিমাণের ঘাটতি ছাড়াই মহান সৃষ্টিকর্তার মধ্যে বিদ্যমান। অন্যভাবে বলা যায় ঃ মহান প্রভু অসীম ক্ষমতা, জ্ঞান ও জীবনের অধিকারী। এখন আমরা এদের প্রতিটির জন্যে বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করব।

জীবন ঃ

জীবনের ধারণাটি দু'শ্রেণীর সৃষ্টবস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এদের একটি হল উদ্ভিদকুল, যারা বিকাশ ও বর্ধনক্ষম এবং অপরটি হল প্রাণী ও মানবকুল, যারা প্রত্যয় ও বোধের অধিকারী। কিন্তু প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে ঘাটতি ও নির্ভরশীলতা অপরিহার্য। কারণ বিকাশ ও বর্ধনের অবিচ্ছেদ্যতা হল যে, বিকাশপ্রাপ্ত অস্তিত্বময়, শুরুতে অপূর্ণাঙ্গ থাকে এবং কোন বহিঃনির্বাহকের প্রভাবে এদের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়; অতঃপর পর্যায়ক্রমে নতুন এক

পূর্ণতায় পৌঁছে। সতরাং এধরনের কোন বিষয়কে মহান সৃষ্টিকর্তারূপে আখ্যায়িত করা যায় না (যার আলোচনা ইতিপূর্বে না-বোধক গুণের ক্ষেত্রে করা হয়েছে)।

জীবনের দ্বিতীয় অর্থটি হল, পূর্ণতার তাৎপর্যমণ্ডিত। যদিও এর সম্ভাব্য দৃষ্টান্ত (مصداق) ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতা সমন্বিত; কিন্তু তার জন্যে অসীম এক মর্যাদাকে বিবেচনা করা যেতে পারে -যেখানে কোন প্রকার ঘাটতি ও নির্ভরশীলতাই আর থাকেনা। অস্তিত্ব ও পূর্ণতার তাৎপর্যও অনুরূপ।

মূলতঃ জীবন যে অর্থে জ্ঞান ও ঐচ্ছিক কার্যসমন্বিত হয়, সে অর্থে অবস্তুগত এক অস্তিত্ব তার জন্যে অপরিহার্য । কারণ যদিও জীবন্ত বস্তুর প্রতি জীবনকে অরোপ করা হয়, তথাপি তা (জীবন) হল প্রকৃতপক্ষে এদের (জীবন্ত বস্তুর) আত্মার (روح) বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যেহেতু ঐ বস্তু আত্মার অধিকারী হয়, তাই ভুলবশতঃ তা জীবন্ত বলে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। অর্থাৎ যেমনকরে বস্তুর জন্যে বিস্তার অপরিহার্য, তেমনি নির্বস্তুকের (مجرّد বা অবস্তুগত) জন্যও আত্মা (روح) অপরিহার্য । আর এ আলোচনার উপর ভিত্তি করে মহান স্রষ্টার জীবন সম্পর্কে অপর, একটি দলিল আমাদের হস্তগত হয় । যথা ঃ প্রভুর পবিত্র অস্তিত্ব হল নির্বস্তুক (مجرّد) বা অবস্তুগত-যা পূর্ববর্তী পাঠে প্রমাণিত হয়েছে। আর প্রত্যেক নির্বস্তুক অস্তিত্বই সত্তাগতভাবে জীবনের অধিকারী। অতএব মহান আল্লাহও সত্তাগতভাবে জীবনের অধিকারী।

জ্ঞান ঃ

জ্ঞান হল স্বতঃসিদ্ধতম ভাবার্থসমূহের একটি। তবে সৃষ্ট বিষয়াদির মধ্যে এর যে দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ্য করে থাকি তা সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ। সুতরাং এ ধরনের বিশেষত্ব সহকারে মহান প্রভুর উপর তা আরোপযোগ্য হবে না। কিন্তু ইতিপূর্বে যেমনটি উল্লেখ হয়েছে যে, বুদ্ধিবৃত্তি (عقل) এ ভাবার্থের পূর্ণতার জন্যে এমন কোন দৃষ্টান্তকে বিবেচনা করতে পারে, যার কোন প্রকার অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা থাকবে না এবং যা জ্ঞানীর অভিন্ন সত্তার অন্তর্গত হবে। আর তা-ই হল মহান প্রভুর সেই সত্তাগত গুণ ।

প্রভুর জ্ঞানকে একাধিক উপায়ে প্রতিপাদন করা যেতে পারে, যাদের একটি হল সে পথ, যা সকল সত্তাগত গুণের প্রমাণের ক্ষেত্রে ইঙ্গিত করা

হয়েছে। অর্থাৎ যেহেতু সৃষ্ট বিষয়াদির মধ্যে জ্ঞান বিদ্যমান, সেহেতু তাদের সৃষ্টিকর্তার মধ্যে ও (এ জ্ঞান) চূড়ান্ত পর্যায়ে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

(প্রভুর প্রজ্ঞাকে প্রমাণের জন্যে) অপর পথটি সুবিন্যস্ততার দলিলের উপর নির্ভরশীল যা নিম্নরূপ ঃ

কোন সৃষ্ট বিষয়ে যতোধিক শৃঙ্খলা ও বিন্যাস ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হবে, তা ততোধিক অস্তিত্বে আনয়নকারীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে প্রমাণ বহন করবে। যেমনঃ কোন তাত্ত্বিক বই অথবা কোন একটি সুন্দর কবিতা কিংবা অন্য যে কোন শিল্পকর্ম, প্রণয়নকারীর জ্ঞান, সুরুচি ও দক্ষতার প্রমাণ বহন করে এবং কখনোই কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই এটা ভাবা সম্ভব নয় যে, একটি তাত্ত্বিক অথবা দার্শনিক বই কোন এক অজ্ঞ ও নিরক্ষর ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত হয়েছে। অতএব কিরূপে ধারণা করা যায় যে, এত রহস্য ও বিস্ময় সম্বলিত এ মহাবিশ্ব, কোন এক অজ্ঞ অস্তিত্ব কর্তৃক সৃজিত হয়েছে ?!

সর্বশেষে (প্রভুর প্রজ্ঞাকে প্রমাণের জন্যে) তৃতীয় পন্থাটি, কতগুলো (অস্বতঃসিদ্ধ) পরোক্ষ (نظری) দার্শনিক প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। যেমন ঃ প্রত্যেক স্বাধীন নির্বস্তুক (مجرّد) অস্তিত্বই জ্ঞানের অধিকারী।[১] (যা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থসমূহে প্রমানিত হয়েছে)

প্রভুর জ্ঞানের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা আত্মগঠনের জন্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই পবিত্র কোরা'নে এ সম্পর্কে অনবরত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । উদাহরণতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

يعلمُ خائنة الاعين وما تخفي الصدور

–মহান আল্লাহ প্রতারকদের চক্ষুসমূহ ও অন্তরের রহস্যসমূহ সম্পর্কে অবগত আছেন (সুরা মু'মিন-১৯) ।

ক্ষমতা ঃ

যদি কর্তা স্বীয় কর্মকে স্বেচ্ছায় সম্পন্ন করে থাকেন তবে বলা হয়ে থাকে যে, তার কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা (قدرت) রয়েছে। অতএব ক্ষমতা

১। মহান আল্লাহ স্বাধীন নির্বস্তুক অস্তিত্ব , অতএব মহান আল্লাহ ও জ্ঞানের অধিকারী

বলতে বুঝায় সম্ভবপর সকল কার্যের জন্যে স্বাধীন কোন কর্তার সক্ষমতাকে। কর্তা অস্তিত্বের মর্যাদার দৃষ্টিতে যতবেশী পরিপূর্ণ হবে ততবেশী ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং যে অস্তিত্ব অসীম পূর্ণতার অধিকারী, তার ক্ষমতা হবে অপরিসীম।

انّ الله على كل شىء قدير

-নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান (সুরা বাকারা-২০) *।

এখানে কয়েকটি বিষয় স্মরণযোগ্য ঃ

১। যে সকল কর্ম ক্ষমতার আওতায় বলে পরিগণিত সে সকল কর্মের বাস্তব রূপ লাভের সম্ভাব্যতা থাকা অনিবার্য। অতএব যা কিছু সত্তাগতভাবে অসম্ভব অথবা অপরিহার্যরূপে অসম্ভব তা ক্ষমতার আওতাধীন বলে পরিগণিত হয় না। 'আর সকল কিছুর উপর প্রভুর ক্ষমতা আছে' তার মানে এ নয় যে, খোদা অন্য এক খোদাকে সৃষ্টি করতে পারেন (কারণ খোদাকে সৃষ্টি করা অসম্ভব) অথবা খোদা পারেন ২, সংখ্যাটি যে অর্থে ২ তাকে ৩ (যে অর্থে ৩) অপেক্ষা বৃহত্তর করতে অথবা সন্তানকে সন্তান হিসেবে পিতার পূর্বে সৃষ্টি করতে।

২। সকল কর্ম সাধনের ক্ষমতা থাকার অর্থ এ নয় যে, ঐ কর্মগুলোর সব ক'টিই তিনি অপরিহার্যরূপে কার্যকর করবেন। বরং যা তিনি ইচ্ছা করবেন তা-ই করবেন এবং প্রজ্ঞাবান প্রভু যথোপযুক্ত ও জ্ঞানগর্ভ কর্ম ব্যতীত কোন কর্ম কামনা করেন না ও সম্পাদন করেন না -যদিও তিনি অনাকাঙ্খিত ও অপছন্দনীয় কর্ম সম্পাদনে সক্ষম । পরবর্তী পাঠসমূহে খোদার প্রজ্ঞা (حكمت) সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখা প্রদান করা হবে ।

৩। ক্ষমতা, আলোচ্য অর্থে স্বাধীনতা বা নির্বাচন ক্ষমতাকেও সমন্বিত করে এবং মহান আল্লাহ চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি পূর্ণ স্বাধীনতারও অধিকারী। কোন কিছুই তাঁকে স্বীয় কর্ম সম্পাদনে বাধাগ্রস্থ করতে পারে না বা তার স্বাধীনতাকে হরণ করতে পারেনা। কারণ সকল সৃষ্ট বিষয়েরই অস্তিত্ব ও শক্তি তাঁর থেকে প্রাপ্ত এবং যে শক্তি ও ক্ষমতা তিনি অপরকে দান করেছেন কখনোই সে শক্তি ও ক্ষমতার বশ্যতা তিনি স্বীকার করেন না ।

---

* এ আয়াতটি একাধিকবার পবিত্র কোরানে এসেছে।

পাঠ - ১০

ক্রিয়াগত গুণাবলী

- ভূমিকা
- সৃজনক্ষমতা
- প্রতিপালনক্ষমতা
- প্রভুত্ব

ভূমিকা ঃ

পূর্ববর্তী পাঠে বর্ণিত হয়েছে যে, ক্রিয়াগত গুণসমূহ বলতে বুঝায় সে সকল ভাবার্থকেই, যা প্রভুসত্তাকে তাঁর সৃষ্ট বিষয়সমূহের সাথে তুলনা করতঃ এ দুয়ের পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্ক থেকে বোধগম্য হয়ে থাকে। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট বিষয় এ দুয়ের সমন্বয়ে এ সম্পর্ক রূপ লাভ করে। যেমন ঃ স্বয়ং 'সৃজন' যা মহান আল্লাহর উপর সৃষ্ট বিষয়ের অস্তিত্বের নির্ভরশীলতাকে বুঝায় এবং যদি এ সম্পর্ককে (সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি বিষয়ের যুগপৎ সম্পর্ক) বিবেচনা না করা হয়, তবে এ ধরনের ভাবার্থ আমাদের হস্তগত হয় না।

প্রভু এবং সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে বিবেচ্য সম্পর্কসমূহকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। তবে, এক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ গুলোকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

এক শ্রেণীর সম্পর্ক আছে, যেগুলো প্রভু এবং সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষরূপে বিবেচ্য। যেমন ঃ অস্তিত্ব দান, সৃষ্টি, অভূতপূর্ব সৃষ্টি ইত্যাদি। অপর এক শ্রেণীর সম্পর্ক হল, যা অন্য কোন সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য। যেমন ঃ রিজক্ (অন্নদান)। কারণ সর্বাগ্রে অন্নগ্রহণকারীর অস্তিত্বকে, ঐ সকল উপাদান যেগুলো থেকে সে রুযী গ্রহণ করে সেগুলোর সাথে বিবেচনা করতঃ প্রভুর পক্ষ থেকে যে তা (রুযী) প্রদত্ত হয়ে থাকে, সেটা বিবেচিত হয়ে থাকে। আর কেবলমাত্র তখই অন্নদাতা (رازق) ও প্রকৃত অন্নদাতার (رزاق) ধারণা অর্জিত হয়। এমনকি কখনো কখনো এমনও হতে পারে যে, প্রভুর ক্রিয়াগত গুণের ধারণা অর্জিত হওয়ার পূর্বেই স্বয়ং সৃষ্টিকুলের মধ্যে একাধিক সম্পর্ক বিবেচনায় আসে। অতঃপর ঐ গুলোর সম্পর্ককে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়, অথবা প্রভু ও সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান একাধিক আদি সম্পর্কের ফলশ্রুতিস্বরূপ কোন সম্পর্করূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেমন ঃ ক্ষমা (مغفرة) যা প্রভুর বিধিগত বা অনির্ধারিত প্রভুত্ব (ربوبيت تشريعى), কার্যকরী আইন প্রণয়ন এবং বান্দার অবাধ্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত ।

অতএব প্রভুর ক্রিয়াগত গুণাবলী সম্পর্কে জানতে হলে মহান প্রভু ও তার সৃষ্ট জগতের মধ্যে তুলনা করতঃ এতদুভয়ের মধ্যে একপ্রকার সম্পর্ককে বিবেচনা করতে হবে, যাতে প্রভু ও সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক

সম্পর্কের তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখিত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র প্রভুর পবিত্র সত্তাকে বিবেচনা করলে ক্রিয়াগত গুণাবলীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। আর এটাই হল প্রভুর সত্তাগত গুণাবলী ও ক্রিয়াগত গুণাবলীর মধ্যে মূল পার্থক্য।

তবে ইতিপূর্বে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্রিয়াগত গুণসমূহকে তাদের উৎসের ভিত্তিতে বিবেচনা করলে, তারা সত্তাগত গুণে প্রত্যাবর্তন করে। যেমন ঃ সৃষ্টিকর্তাকে যদি 'সৃষ্টি করতে সক্ষম' এমন কাউকে বোঝানোর ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় তবে তা ক্ষমতা নামক গুণের দিকে ফিরে যায় অথবা শ্রবণ ও দর্শন যদি 'শ্রবণযোগ্য ও দর্শনযোগ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত' অর্থে ব্যবহৃত হয় , তবে তা প্রজ্ঞা নামক গুণের দিকে প্রত্যাবর্তন করে ।

অপরদিকে সত্তাগত গুণের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন ভাবার্থ সম্বন্ধসূচক বা ক্রিয়ামূলক অর্থে বিবেচিত হয় এবং এ অবস্থায় ঐগুলো ক্রিয়াগত গুণ বলে পরিগণিত হয়। যেমন ঃ পবিত্র কোরানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রজ্ঞা (علم) শব্দটি ক্রিয়াগত গুণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ করা সমীচীন বলে মনে করছি। নিম্নে তা বর্ণিত হল ঃ

যখন প্রভু ও বস্তুগত অস্তিত্বের মধ্যে কোন সম্পর্ককে বিবেচনা করা হয় এবং এর ভিত্তিতে মহান আল্লাহর জন্যে বিশেষ ক্রিয়াগত গুণের ধারণার প্রকাশ ঘটে, তখন উল্লেখিত গুণ, বস্তুগত অস্তিত্বসমূহ, যেগুলো (দ্বিপাক্ষিক) সম্পর্কের এক পক্ষের ভূমিকায় অবস্থান করে, তাদের সাথে সম্বন্ধের ভিত্তিতে স্থান ও কালের শর্তাধীন হয়ে পড়ে। তবে (দ্বিপাক্ষিক) সম্পর্কের অপরপক্ষ, মহান আল্লাহর সাথে সম্বন্ধের ভিত্তিতে (উল্লেখিত গুণগুলো) এ ধরনের (উপরে বর্ণিত) কোন শর্ত ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত থাকবে।

উদাহরণস্বরূপ, অন্নগ্রাহককে অন্নদান, কোন এক বিশেষ স্থান ও কালে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু এ শর্তগুলোপ্রকৃতপক্ষে অন্নগ্রাহক-অস্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট-অন্নদাতার সাথে নয়। আর প্রভুর পবিত্র সত্তা কোন প্রকার স্থান ও

১। যথা ঃ সূরা বাকারা- ১৮৭ ,২৩৫; আনফাল -৬৬, ফাত্‌হ - ১৮,২৭; আলইমরান-১৪০,১৪২; মায়িদাহ্ -৭৪; তওবাহ্- ১৬; মুহম্মদ (সঃ)- ৩১ ইত্যাদি।

কালের শর্ত থেকে পবিত্র।

এটি একটি অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার এবং মহান আল্লাহর বিভিন্ন গুণ ও কর্ম কাণ্ডের পরিচিতির ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠিস্বরূপ, যেগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন তার্কিক ও মনীষীদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

সৃজনক্ষমতা ঃ

সম্ভাব্য অস্তিত্বসমূহের উৎপত্তির ক্ষেত্রে, প্রারম্ভিক কারণরূপে অনিবার্য অস্তিত্বের প্রমাণের পর এবং সম্ভাব্য অস্তিত্বসমূহ স্বীয় অস্তিত্বের জন্যে সর্বদা ঐ অনিবার্য অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল এটা বিবেচনার পর, অনিবার্য অস্তিত্বের জন্যে 'সৃজনক্ষমতা' এবং সম্ভাব্য অস্তিত্বের জন্যে 'সৃজিত' গুণ হিসেবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টিকর্তার ধারণা, যা অস্তিত্বের এ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রকাশ পায়, তা অস্তিত্বদানকারী কারণের বা অস্তিত্বে আনয়নকারীর সমান এবং সকল সম্ভাব্য ও নির্ভরশীল অস্তিত্ব তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্তপক্ষ হিসেবে 'সৃজিত' বলে গুণান্বিত হয়ে থাকে ।

তবে কখনো কখনো সৃজন (خلق) শব্দটি, কিছুটা সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং শুধুমাত্র ঐ সকল অস্তিত্বের সাথেই সংশ্লিষ্ট হয়, যারা প্রারম্ভিক বস্তু থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর এর বিপরীতে 'অভূতপূর্বসৃষ্টি' (ابداع) নামক অপর এক ভাবার্থ, যা ঐ সকল অস্তিত্ব যারা কোন প্রাথমিক বস্তু থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত নয়, তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (যেমন ঃ নির্বস্তুকসমূহ এবং প্রারম্ভিক বস্তুসমূহ)। আর এরূপে অস্তিত্বদান-সৃষ্টিকরণ (خلق) ও অভূতপূর্ব সৃষ্টিকরণ (ابداع), এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে।

যা হোক, আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টিকরণ, মানুষ কর্তৃক একাধিক বস্তুর সমন্বয়ে কোন কৃত্রিম সৃষ্টির মত নয় যে, গতি এবং দৈহিক অঙ্গ - প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের উপর নির্ভরশীল হবে এবং গতি 'ক্রিয়া' নামে ও এর ফলে অর্জিত বিষয় 'ক্রিয়ার ফল' নামে পরিচিত হবে । অনুরূপ , এমন নয় যে,সৃষ্টিকরণ এক ব্যাপার আর 'সৃষ্টবিষয়' অন্য ব্যাপার। কারণ মহান আল্লাহ বস্তুগত গতি ও বস্তুগত বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র। যদি 'সৃষ্টিকরণ' সৃষ্ট সত্তার উপর

বর্তিত অতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত (مصداق) হত, তবে তা 'সম্ভাব্য অস্তিত্ব' ও 'সৃষ্ট বিষয়সমূহের' মধ্যে একটি বলে পরিগণিত হয়। ফলে এর (সৃষ্টিকরণের) সৃষ্টি সম্পর্কে একাধিক বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটত। অথচ ক্রিয়াগত গুণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, এ ধরনের গুণ প্রভু ও সৃষ্ট বিষয়ের সম্পর্ককে বিবেচনা করে বোধগম্য হয়ে থাকে। আর এ সম্পর্ক বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে অনুধাবনযোগ্য।

প্রতিপালনক্ষমতা ঃ

বিশেষ করে স্রষ্টা এবং সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়, তা হল ঃ সৃষ্ট বিষয়সমূহ শুধুমাত্র মূল অস্তিত্ব ও উৎপত্তির জন্যেই আল্লাহর উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সমস্ত অস্তিত্বের জন্যেই মহান প্রভুর উপর নির্ভরশীল এবং কোন প্রকারেই স্বাধীন নয়। মহান প্রভু যেভাবেই ইচ্ছা করেন, সেভাবেই সৃষ্ট বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং তিনিই ঐগুলোর যাবতীয় বিষয়ে তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

যখন এ সম্পর্ককে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয় তখন প্রতিপালন ক্ষমতার ধারণা পাওয়া যায়, যার ফলশ্রুতি হল তত্ত্বাবধান এবং এর দৃষ্টান্ত অনেক। যেমন ঃ রক্ষা, পরিচর্যা, জীবনদান ও মৃত্যুদান, অন্নদান, বিকাশ ও উৎকর্ষে পৌঁছানো, পথ প্রদর্শন এবং আদেশ-নিষেধের বিষয়রূপে স্থান দান ইত্যাদি।

প্রকরণভেদে প্রতিপালনের পর্যায়গুলোকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে সুনির্ধারিত ও বিধিগত।

সুনির্ধারিত প্রতিপালন (ربوبيت تكوينى) সকল সৃষ্ট বিষয় ও ঐ গুলোর প্রয়োজন ও চাহিদাকে পূরণ তথা সমগ্র বিশ্ব পরিচালনাকে সমন্বিত করে। আর বিধিগত প্রতিপালন (ربوبيت تشريعى) শুধুমাত্র সচেতন ও ইচ্ছার অধিকারী অস্তিত্বের জন্যে নির্দিষ্ট এবং ঐশী কিতাবসমূহ ও নবী-রাসূল প্রেরণ, দায়িত্ব নির্ধারণ ও আদেশ - নিষেধ প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট।

সুতরাং প্রভুর নিরংকুশ প্রতিপালন ক্ষমতার অর্থ হল ঃ সৃষ্ট বিষয়সমূহ তাদের অস্তিত্বের সকল স্তরেই মহান প্রভুর উপর নির্ভরশীল এবং তাদের পারস্পরিক যে নির্ভরশীলতা, পরিশেষে তার পরিসমাপ্তি মহান সৃষ্টিকর্তাতেই

ঘটে। তিনিই সে সত্তা, যিনি তাঁর সৃষ্টির এক অংশ দিয়ে অপর অংশকে তত্ত্বাবধান করেন, অন্নগ্রাহককে সৃষ্ট অন্ন থেকে অন্ন দান করেন, সচেতন ও বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তাকে আভ্যন্তরীণ মাধ্যম (যেমন ঃ আক্বল বা বুদ্ধিবৃত্তি এবং অন্যান্য বোধশক্তি) এবং বাহ্যিক মাধ্যম (যেমন ঃ নবীগণ ও ঐশী কিতাবসমূহ) দ্বারা পথনির্দেশ করেন এবং মানুষের জন্যে নীতি প্রণয়ন, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করেন।

প্রতিপালনও সৃজনক্ষমতার মত সম্বন্ধীয় (ضافی) ভাবার্থযুক্ত। তবে পার্থক্য হল এই যে, প্রতিপালনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান বিশেষ সম্পর্ককেও বিবেচনা করা হয়, যা রিয্ক প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে ।

প্রতিপালন ও সৃজনের অর্থের আলোকে এবং তাদের সম্বন্ধযুক্ত হওয়া থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, এ দু'টি গুণ পরস্পর ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। আর এটা অসম্ভব যে, বিশ্বের প্রতিপালক এর সৃষ্টিকর্তাভিন্ন অন্য কেউ হবেন, বরং তিনিই হবেন এ বিশ্বের পরিচালক ও রক্ষাকর্তা, যিনি এ সকল সৃষ্টিকে সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সহকারে এবং পারস্পরের উপর নির্ভরশীল করে সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রতিপালনক্ষমতা, পরিচালনক্ষমতার তাৎপর্য,সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান সংহতি থেকে প্রকাশ লাভ করে।

প্রভুত্বঃ

ইলাহ ও উলুহিয়্যাতের (الوهيت) স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তাবিদগণের মধ্যে একাধিক বক্তব্য প্রচলিত, যা কোরানের বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থে বিদ্যমান । যে অর্থটি আমাদের মতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তা হল ঃ ইলাহ্ (اله) অর্থ উপাস্য অথবা আনুগত্য ও উপাসনার যোগ্য । যেমন ঃ বইয়ের অর্থ হল লেখ্য এবং যা লিখনযোগ্যতা রাখে ।

এ অর্থানুসারে উলুহিয়্যাত হল এমন এক গুণ, যার ধারণা লাভের জন্যে বান্দাগণের উপাসনা ও আনুগত্যকেও বিবেচনা করতে হবে। যদিও পথভ্রষ্টরা মিথ্যা মা'বুদগুলোকে নিজেদের উপাস্যরূপে নির্বাচন করেছে, তবু তিনিই হলেন প্রকৃত উপাসনা ও আনুগত্যের যোগ্য – যিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। বিশ্বাসের এ ন্যূনতম সীমা, যা আপন প্রভুর প্রতি সকল বান্দারই

থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ মহান আল্লাহকে অনিবার্য অস্তিত্ব, সৃষ্টিকারী, বিশ্বের স্বনির্ভর পরিচালক হিসেবে চিনার পাশাপাশি তাঁকে উপাসনা ও আনুগত্যের যোগ্য হিসেবেও জানতে হবে। আর এ কারণেই ইসলাম (لا إله إلا الله) অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এ ধ্বনিকে স্বীয় শ্লোগানরূপে নির্বাচন করেছে।

পাঠ –১১

অন্যান্য ক্রিয়াগত গুণাবলী

- ভূমিকা
- প্রত্যয় বা ইচ্ছা
- প্রজ্ঞা
- ভাষা
- সত্যবাদিতা

ভূমিকা ঃ

কালামশাস্ত্রের একটি জটিলতম বিষয় হল প্রভুর ইচ্ছা বা প্রত্যয় (ارادہ)। বিভিন্ন দিক থেকে এ বিষয়টি আলোচনা ও মতবিরোধপূর্ণ বিষয় রূপে পরিগণিত। যেমন ঃ ইচ্ছা বা প্রত্যয় কি সত্তাগত গুণ, না ক্রিয়াগত গুণ? প্রাচীন (قدیم) , না সৃষ্ট (حادث) ? একত্ব, না বহুত্ব ? ইত্যাদি।

এতদসত্ত্বেও দর্শনশাস্ত্রে 'চূড়ান্ত প্রত্যয় বা ইচ্ছা' শিরোনামে একটি বিষয়ের অবতারণা হয়েছে, বিশেষকরে প্রভুর ইচ্ছা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ।

এটা অনস্বীকার্য যে, এ বইয়ের ক্ষুদ্র কলেবরে এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত হবে না । সুতরাং প্রারম্ভেই ইচ্ছা বা প্রত্যয়ের তাৎপর্য তুলে ধরব । অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মনোনিবেশ করব ।

ইচ্ছা বা প্রত্যয় ঃ

ইচ্ছা বা প্রত্যয় (ارادہ) শব্দটি প্রচলিত ভাষায় কমপক্ষে দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ একটি হল 'পছন্দ করা' আর অপরটি হল 'কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়া'।

প্রথম অর্থটি বিষয়ের ভিত্তিতে অত্যন্ত ব্যাপক এবং বাস্তব বস্তুসমূহকে পছন্দকরণ[১], ব্যক্তিগত কার্যকলাপ এবং অপরের কার্যকলাপকেও সমন্বিত করে। দ্বিতীয় অর্থটি হল এর ব্যতিক্রম, যা শুধুমাত্র স্বয়ং ব্যক্তিসংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ।

ইরাদা শব্দটি প্রথম অর্থে পছন্দ (محبت) যদিও মানুষের ক্ষেত্রে নফসের কামনারূপে পরিগণিত হয় তবু বুদ্ধিবৃত্তি এর ঘাটতিপূর্ণ দিকগুলোকে নিষ্কাশন করে একটি সাধারণ অর্থকে হস্তগত করতে পারে, যার পরিসীমা বস্তুগত সত্তা থেকে শুরু করে মহান আল্লাহ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। যেমনটি

১। যেমন এ আয়াত শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে تریدون عرض الدنیا و الله یرید الاخرة – তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ আর আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ (সূরা আনফাল-৬৭)।

জ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে পছন্দ (حبّ), যা স্বীয় সত্তা সম্পর্কে প্রভুর পছন্দকেও সমন্বিত করে, তাকে সত্তাগত গুণরূপে গণনা করা যেতে পারে।

অতএব, যদি প্রভুর 'ইরাদা' বা (ইচ্ছা) বলতে পূর্ণতাকে পছন্দ করা বুঝায়, যা প্রথম পর্যায়ে প্রভুর অসীম পূর্ণতা সংশ্লিষ্ট হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য অস্তিত্বময়, যারা প্রকারান্তরে প্রভুর পূর্ণতারই নিদর্শন, তাদেরকে সমন্বিত করে তবে তা (ইরাদা) সত্তাগত গুণ রূপে পরিগণিত হতে পারে। আর তখন অন্যান্য সত্তাগত গুণের মতই ইরাদাকেও প্রাচীন (قديم) একক এবং প্রভুর পবিত্র সত্তার অভিন্ন রূপ বলে মনে করা যেতে পারে ।

কিন্তু 'ইরাদা' (দ্বিতীয় অর্থে) কর্মসম্পাদনে সিদ্ধান্ত নেয়া অর্থে নিঃসন্দেহে ক্রিয়াগত গুণের অন্তর্ভুক্ত হবে, যা সৃষ্ট বিষয় সংশ্লিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে কালের শর্তে আবদ্ধ হয় -যেমনটি পবিত্র কোরানে এসেছে ।

انّما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون

তার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে বলেন 'হও' ফলে তা হয়ে যায় (সুরা ইয়াসিন – ৮২)।

তবে মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ ক্রিয়াগত গুণাবলী গুণান্বিত, তা এ অর্থে নয় যে, তার সত্তায় কোন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে অথবা কোন উপজাত (عوارض) তার জাত বা সত্তায় সংযোজিত হয়েছে । বরং এ অর্থে যে, নির্দিষ্ট শর্তে ও বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রভুসত্তা ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে একটি সম্পর্ককে বিবেচনা করা হয় এবং বিশেষ এক সম্পর্কের ভাবার্থকে প্রভুর ক্রিয়াগত গুণ হিসাবে গণনা করা হয় ।

'ইরাদার' ক্ষেত্রে এ সম্পর্ককে বিবেচনা করা হয় যে,সকল সৃষ্ট বিষয়ই যে দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের অধিকারী সে দৃষ্টিকোণ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। অতএব, তার অস্তিত্ব বিশেষ স্থান ও কাল অথবা বিশেষ অবস্থা, প্রভুর পছন্দ ও জ্ঞানের অধীনে হয়েছে এবং মহান আল্লাহ স্বেচ্ছায় তাকে সৃষ্টি করেছেন –– অন্য কারো কর্তৃক বাধ্য হয়ে নয়। এ সম্পর্ক বিবেচনার ফলে ইরাদা নামক এক সম্বন্ধযুক্ত ভাবার্থ প্রকাশ লাভ করে, যা সীমাবদ্ধ ও শর্তাধীন কোন বস্তুর সংশ্লিষ্ট হলে সীমাবদ্ধ ও শর্তাধীন হয়ে থাকে এবং এ সম্বন্ধযুক্ত

ভাবার্থই তখন সৃজিত (حدوث) ও বহুত্ব (كثرت) বলে গুণান্বিত হয়ে থাকে। কারণ সম্বন্ধ (اضافه), দু'পক্ষের (طرفين) অধীন হয়ে থাকে এবং সৃজিত (حدوث) ও বহুত্ব (كثرت) হল দু'পক্ষের মধ্যে একপক্ষ। এদিক থেকে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ (সীমাবদ্ধ ও শর্তাধীন)সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়াই যুক্তিসংগত ।

প্রজ্ঞা ঃ

'ইরাদার' উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে ইতিমধ্যেই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রভুর এ ইরাদা বা ইচ্ছা অর্থহীন ও পরিকল্পনাবিহীন কোন কর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে না। বরং যা কিছু মূলতঃ প্রভুর ইরাদার অন্তর্ভুক্ত হয় তাই বস্তুর পূর্ণতা ও কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে। যেহেতু বস্তুসমষ্টির এক অংশ অপর অংশের ক্ষতির কারণ হয় সেহেতু প্রভুর পূর্ণতাপ্রীতির দাবী হল সৃষ্টিকুল এমনভাবে অস্তিত্বমান হবে যে, সমষ্টিগত কল্যাণ ও পূর্ণতার লব্ধি সর্বাধিক হবে। এধরনের সম্পর্কসমূহকে বিবেচনা করলে কল্যাণ নামক ভাবার্থের সন্ধান মেলে। নতুবা কল্যাণ (مصلحت) সৃষ্টিকুলের অস্তিত্ব থেকে এমন কোন স্বাধীন বিষয় নয় যে তাদের বিদ্যমানতায় কোন প্রভাবফেলবে। সুতরাং এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, তা প্রভুর ইরাদায় প্রভাব ফেলবে ।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই, যেহেতু প্রভুর ক্রিয়া তাঁর সত্তাগুণ (যেমন ঃ জ্ঞান, ক্ষমতা, পূর্ণতা ও কল্যাণপ্রীতি) থেকে উৎসারিত, সেহেতু সর্বদা এরূপে বাস্তবায়িত হয় যখন তা কল্যাণকর হয়। অর্থাৎ সৃষ্ট বিষয় সর্বাধিক কল্যাণ ও পূর্ণতার অধিকারী হবে। আর এ ধরনের ইরাদা বা ইচ্ছাকেই প্রজ্ঞাপূর্ণ ইরাদা বলা হয়ে থাকে। এখানে মহান আল্লাহর জন্যে কার্যক্ষেত্রে প্রজ্ঞা নামক অপর একটি গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যা অন্যান্য ক্রিয়াগত গুণের মতই প্রভুর সত্তাগত গুণের দিকে প্রত্যাবর্তন করে ।

তবে মনে রাখতে হবে যে, কল্যাণের জন্যে কর্মসম্পাদনের অর্থ এনয় যে, কল্যাণই হল প্রভুর জন্যে চূড়ান্ত কারণ। বরং তা এক ধরনের গৌণ ও অধঃস্তন উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হয় । অপরদিকে কর্ম সম্পাদনের জন্যে চূড়ান্ত কারণ হল, সে অনন্তসত্তাগত পূর্ণতার অনুরাগ, যা আনুসঙ্গিকভাবে তার ফলশ্রুতি অর্থাৎ অস্তিত্বময় বিষয়সমূহের পূর্ণতাকেও সমন্বিত করে। আর এ জন্যেই বলা

হয়, প্রভুর কর্মকাণ্ডের জন্যে সে কর্তৃকারণই হল চূড়ান্ত কারণ এবং মহান আল্লাহ তাঁর সত্তা বহিঃর্ভূত কোন উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খা পোষণ করেন না। তবে সৃষ্ট বিষয়ের পূর্ণতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ, গৌণ উদ্দেশ্য বা অধঃস্তন উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হলেও তা উল্লেখিত বিষয়টির সাথে কোন বিরোধ রাখেনা। আর এ জন্যেই প্রভুর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পবিত্র কোরানে এমন সকল বিষয়কে কারণরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাদের প্রত্যেকেরই মূলে রয়েছে সৃষ্ট বিষয়ের পূর্ণতা ও কল্যাণ। [১] যেমন ঃ পরীক্ষীত হওয়া, সর্বোৎকৃষ্ট কর্মসমূহকে নির্বাচন, আল্লাহর দাসত্ব করা এবং প্রভুর বিশেষ ও অপরিসীম অনুগ্রহের অধিকারী হওয়া ইত্যাদিকে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের প্রত্যেকেই যথাক্রমে অপরের প্রারম্ভিকা (مقدمه)।

প্রভুর ভাষা ঃ

মহান আল্লাহর উপর আরোপিত ভাবার্থসমূহের মধ্যে একটি হল কথোপকথন বা কালাম (كلام)। প্রভুর কথোপকথন সম্পর্কে, প্রাচীনকাল থেকেই কালামশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে আলোচনা প্রচলিত ছিল। কথিত আছে 'কালামশাস্ত্র' নামকরণের কারণও হল এটাই যে, এ শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ প্রভুর ভাষা বা কালাম সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আশায়েরীরা এটাকে সত্তাগত গুণ এবং মু'তাযেলীরা ক্রিয়াগত গুণ বলে মনে করতেন। এ দু'দলের মধ্যে বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে একটি হল উল্লেখিত বিষয়টি । বলা হয় কোরান যে, আল্লাহর কালাম বা ভাষা, তা কি সৃষ্ট, না সৃষ্ট নয় ? আর এ বিষয়টির জন্যে এমনকি পরস্পর পরস্পরকে কাফের পর্যন্ত আখ্যা দিয়েছেন!

সত্তাগত ও ক্রিয়াগত গুণাবলীর সংজ্ঞার আলোকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, কথোপকথন হল ক্রিয়াগত গুণাবলীর অন্তর্ভূক্ত, যাকে অনুধাবনের জন্যে এমন এক শ্রোতাকেও বিবেচনা করতে হবে, যিনি বক্তার উদ্দেশ্যকে শব্দ শ্রবণের মাধ্যমে বা লিখিত অবস্থায় দেখার মাধ্যমে অথবা স্বীয় মস্তিষ্কে কোন ভাবার্থ অনুধাবনের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনভাবে বুঝতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে

১। সুরা হুদ -৭; কাহফ- ৭; মূলক - ২; যারিয়াত- ৫৬, ২৩; হুদ- ১০৮,১১৯; জাসিয়াহ-২৩; আলে ইমরান -১৫; তওবাহ- ৭২।

এ ভাবার্থটি প্রভু (যিনি এক সত্যকে কারো কাছে প্রকাশ করতে চান) এবং শ্রোতার (যিনি ঐ সত্যকে অনুধাবন করেন) সম্পর্ক থেকে প্রকাশ লাভ করে (যা ক্রিয়াগত গুণের প্রমাণবহ)। কিন্তু যদি কথোপকথনের জন্যে অন্য কোন অর্থকে বিবেচনা করা হয়; যথা ঃ কথনক্ষমতা, বক্তব্যের সারবত্তা সম্পর্কে জ্ঞান, এধরনের অর্থের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, তবে এ অবস্থায় এ গুণটি (কথোপকথন) পূর্বোল্লেখিত কোন কোন ক্রিয়াগত গুণের মতই সত্তাগত গুণের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে ।

কিন্তু কোরা'ন বলতে আক্ষরিক লিপি বা শব্দসমষ্টি বা মস্তিষ্কে বিদ্যমান ভাবার্থসমূহ অথবা তার (কোরা'নের) জ্যোতির্ময় ও নির্বস্তুক বাস্তবরূপকে বুঝানো হলে , তা সৃষ্ট বিষয় বলে পরিগণিত হবে। তবে যদি কেউ আল্লাহর সত্তাগত জ্ঞানকে কোরানের বাস্তবরূপ বলে মূল্যায়ন করে থাকেন, তাহলে তার প্রত্যাবর্তন প্রভুর সত্তাগত গুণ জ্ঞানের দিকে ঘটবে । কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা সর্বজন স্বীকৃত নয় বলে পরিত্যাজ্য ।

সত্যবাদিতা ঃ

প্রভুর কথন যদি আদেশ, নিষেধ ও প্রশ্নবোধক হয়, তবে তা বান্দাগণের কর্তব্যকে নির্দেশ করে থাকে এবং তখন তার উপর সত্য বা মিথ্যা আরোপিত হয় না। কিন্তু যদি প্রভুর কথন বিবৃতিমূলক হয়, যা বাস্তব অস্তিত্বসমূহ অথবা পরবর্তী ও পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সংবাদ বহন করে তবে তা সত্য বলে অভিষিক্ত হয়। যেমন পবিত্র কোরা'নে বলা হয়েছে ঃ

ومن اصدق من الله حديثاً

কে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী (সুরা নিসা- ৮৭) ?

সুতরাং কেউই ঐগুলোকে কোন অজুহাতেই অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য গুণ, বিশ্বদৃষ্টির গৌণ বিষয়গুলোকে এবং অধিকাংশ মতাদর্শগত বিষয়কে প্রতিপাদন করার জন্যে অপর এক শ্রেণীর যুক্তির (বিশ্বাস ও বিবৃতিমূলক) বৈধতা দান করে।

উল্লেখিত গুণটির প্রমাণের জন্যে, বিশেষ করে যে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিটির অবতারণা করা যায় তা হল ঃ

প্রভুর কথা বলা, প্রতিপালকত্বের মর্যাদায় এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে, মানুষ ও বিশ্বজগতের পরিচালনার ক্ষেত্রে, সৃষ্ট বিষয়ের জন্যে পথনির্দেশনার ও সঠিক পরিচিতির ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্যে অপরিহার্য। যদি এর ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে বর্ণিত বিষয়গুলোর কোন বিশ্বস্ততা থাকবে না । কারণ তা উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম ও প্রজ্ঞার পরিপন্থী।

পাঠ – ১২

বিচ্যুতির কারণসমূহের পর্যালোচনা

- ভূমিকা
- বিচ্যুতির কারণসমূহ
    - ১। মানসিক কারণ
    - ২। সামাজিক কারণ
    - ৩। চিন্তাগত কারণ
    - ৪। বিচ্যুতির নির্বাহকসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ভূমিকা ঃ

প্রথম পাঠে পরিদৃষ্ট হয়েছে যে, বিশ্বদৃষ্টিসমূহকে দু'টি সার্বিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় –ঐশ্বরিক ও বস্তুবাদী। এতদুভয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ হল, সর্বজ্ঞ ও মহাপরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে। প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বরিক বিশ্বদৃষ্টি এক মৌলিক ভিত্তিরূপে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের বিশ্বাস থেকে রূপ পরিগ্রহ করে। অপরদিকে বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টি এ বিশ্বাসকে অস্বীকার করে।

পূর্ববর্তী পাঠসমূহে, এ বইয়ের আওতায় যতটুকু সম্ভব সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে প্রতিপাদন করা ও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গুণসমূহ অর্থাৎ হ্যাঁ-বোধক ও না- বোধক এবং সত্তাগত ও ক্রিয়াগত গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছিল।

এখন এ মৌলিক ভিত্তির উপর বিশ্বাসের দৃঢ়তা বর্ধনের নিমিত্তে বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির কিঞ্চিৎ সমালোচনায় মনোনিবেশ করব, যাতে ঐশ্বরিক বিশ্বদৃষ্টির অবস্থান সুস্থিতকরণের পাশাপাশি বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টির অসারতা ও অক্ষমতা প্রত্যক্ষরূপে প্রতিপন্ন হয়।

এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথমে ঐশীদৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুতি ও নাস্তিক্যদৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ঝোঁকের কারণ ও নির্বাহক সম্পর্কে আলোকপাত করব। অতঃপর বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির দুর্বলতম দিকগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করব।

বিচ্যুতির কারণসমূহ ঃ

মানবজাতির ইতিহাসে নাস্তিকতা ও বস্তুবাদিতার এক সুপ্রাচীন ভিত্তি রয়েছে। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের সাক্ষ্য থেকে যতটুকু জানা যায়, তাতে দেখা যায়, মানব সমাজে সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস যেমন বজায় ছিল, তেমনি অতি প্রাচীনকাল থেকেই নাস্তিক্যধারণার অনুসারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীরও সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ধর্মহীনতার প্রচলন অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ইউরোপে আরম্ভ হয়েছিল এবং উত্তর উত্তর তা বিশ্বের অন্যত্র বিস্তার লাভ করেছিল।

সৃষ্টিকর্তার প্রতি এ আস্থাহীনতা গীর্জাপতিদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া থেকে উৎপত্তি লাভ করলেও অন্যান্য ধর্ম ও মাযহাবেও এ তরঙ্গের ছোঁয়া লেগেছিল। ধর্মবিবর্জন প্রবণতা, পাশ্চাত্য শিল্প, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল অন্যত্র। গত শতাব্দীতে এ ধর্মহীনতা মার্কসবাদের সামাজিক ও

অর্থনৈতিক ধারণা নিয়ে অধিকাংশ দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, যা বিশ্বমানবতার জন্যে এক মহাবিপদ ।

এ বিচ্যুতির উৎপত্তি, বর্ধন ও বিস্তৃতির কারণ অনেক এবং এদের সবগুলোর পর্যালোচনার জন্যে একটি স্বতন্ত্র বইয়ের প্রয়োজন। তবে সার্বিকভাবে তৃবিধ কারণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

১। মানসিক কারণ ঃ ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার জন্যে দায়ী এমন সকল প্রবণতা মানুষের মধ্যে থাকতে পারে, যার প্রভাব সম্পর্কে স্বয়ং ব্যক্তিও অবগত নয়। এগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হল আরামপ্রিয়তা, উদাসীনতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। অর্থাৎ একদিকে যেমন গবেষণা ও অনুসন্ধানের মত শ্রমসাধ্য কর্ম, বিশেষ করে সে সকল বিষয়ের জন্যে যেগুলোতে বস্তুগত কোন স্বাদ-আনন্দ নেই, তা অলস, আরামপ্রিয়, অক্ষম ব্যক্তির জন্যে কঠিন; তেমনি অপরদিকে পাশবিক স্বাধীনতার প্রতি আকর্ষণ, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা অবাধ্যতা তাদেরকে ঐশ্বরিক বিশ্বদৃষ্টি থেকে বিরত রাখে। কারণ ঐশীমতবাদকে গ্রহণ এবং মহান প্রভুর প্রতি বিশ্বাসের ফলে অন্য এক শ্রেণীর বিশ্বাস রূপ পরিগ্রহ করে, যার অবিচ্ছেদ্যতা হল সকল স্বাধীন কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মানুষের দায়িত্ব পরায়ণতা । আর এ ধরনের দায়িত্বপরায়ণতার দাবি হল, স্বীয় কামনার অধিকাংশ বিষয়কে পরিত্যাগ করা এবং এক প্রকার সীমাবদ্ধতাকে গ্রহণ করা । অপরপক্ষে এ ধরনের সীমাবদ্ধতাকে গ্রহণ করা উচ্ছৃঙ্খল প্রবণতার সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ নয় । ফলে এ ধরনের পাশবিক ইচ্ছা অবচেতনভাবে হলেও দায়িত্বপরায়ণতার মূলে আঘাতের কারণ এবং সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকারের মূল । এ ছাড়াও কিছু মানসিক কারণ রয়েছে যা ধর্মহীনত প্রবণতাকে প্রভাবিত করে এবং অন্যান্য কারণের পশ্চাতে আত্মপ্রকাশ করে ।

২। সামাজিক কারণ ঃ কোন কোন সমাজে অনাকাঙ্খিত সামাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এর উৎপত্তি ও বিস্তারে ভূমিকা রাখেন। এ অবস্থায় অধিকাংশ মানুষ, যারা বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার ক্ষেত্রে দুর্বল এবং কোন বিষয়ের প্রকৃত বিচার-বিশ্লেষণে মাধ্যমে সংঘঠিত ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনে অপারগ, তারা মনে করেন যে, এ বিশৃঙ্খল অবস্থা ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের অনুপ্রবেশের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তারা এর দায়িত্বভার দ্বীন ও ধর্মের উপর অর্পণ করেন এবং বলেন যে, ধর্মবিশ্বাসসমূহই এ ধরনের অনাকাঙ্খিত

পারিস্থিতি সৃষ্টির কারণ। এ কারণে তারা ধর্ম ও মাযহাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

এ শ্রেণীর কারণের স্পষ্ট দৃষ্টান্তরূপে রেনেসাঁযুগের ইউরোপের সামাজিক অবস্থার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে তদানীন্তন গীর্জাপতিদের অযোগ্য কর্মকাণ্ডই খ্রীষ্টবাদ এবং সামগ্রিকভাবে ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টির গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

এ ধরনের কারণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা সকল ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের জন্যে অতীব প্রয়োজন, যাতে স্বীয় দায়িত্বের গুরুত্ব ও স্পর্শকাতর পরিস্থিতি সম্পর্কে অধিক সচেতন হতে পারেন। অনুরূপ স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদের সামান্য ভুল-ত্রুটিই একটি সমাজের বিপথগামিতা ও দুর্দশার কারণ হতে পারে।

৩। চিন্তাগত কারণ ঃ সন্দেহ ও দ্বিধা, যা ব্যক্তির মস্তিষ্কে আসে, তা হয়তো অন্য কারো মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এবং যুক্তি ও চিন্তাশক্তির দুর্বলতার ফলে, সে ঐ গুলোকে খণ্ডন করতে পারে না। ফলে ন্যূনতমপক্ষে হলেও সে ঐ সন্দেহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং তার মস্তিষ্ককে দোদুল্যমান ও অস্থিতিশীল করে থাকে, যা সন্দেহাতীত ও সুস্থিত বিশ্বাস সৃষ্টিতে বাধা প্রদান করে।

এ শ্রেণীর কারণসমূহও স্বয়ং একাধিক শাখায় বিভক্ত। যেমন ঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ভিত্তিক সন্দেহ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসপ্রসূত সন্দেহ, অপব্যাখ্যা ও দুর্বল যুক্তি-ফলপ্রসূত সন্দেহ, অপ্রীতিকর ঘটনা সংশ্লিষ্ট সন্দেহ –যাকে প্রভুর প্রজ্ঞা ও ন্যায়ের পরিপন্থী বলে মনে করা হয়, বৈজ্ঞানিক ধারণাপ্রসূত সন্দেহ– যা ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী বলে পরিচিত এবং ধর্মীয় কোন কোন বিধি-বিধান সম্পর্কে সন্দেহ, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সমাজিক বিধি-নিষেধ সম্পর্কে সন্দেহ।

কখনো কখনো দুই বা ততোধিক কারণ সমষ্টিগতভাবে সন্দেহ ও দ্বিধা -দ্বন্দ্ব অথবা অস্বীকৃতি ও নাস্তিকতার কারণ হয়ে থাকে। যেমন ঃ কখনো কখনো একাধিক মানসিক জটিলতা ও অসংগতি সন্দেহ সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং 'সন্দিগ্ধ' নামক মানসিক রোগের সৃষ্টি করে, যার

ফলশ্রুতিতে কোন প্রকার যুক্তি-প্রমাণেই সে তুষ্ট হয় না । যেমন ঃ সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি, তার কৃতকর্মের সঠিকতা সম্পর্কে কখনই নিশ্চিত হতে পারে না। উদাহরণতঃ দশ দশকবারও যদি পানিতে হাত ধৌত করে তারপরও সে নিশ্চিত হতে পারে না যে, পবিত্র হয়েছে কিনা –যদিও একবার ধৌত করাই পবিত্রতার জন্যে যথেষ্ট ছিল এবং ততোধিকবার অপরিহার্য ছিলনা ।

বিচ্যুতির নির্বাহকসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঃ

বিচ্যুতির নির্বাহক ও কারণসমূহের বিভিন্নতাকে বিবেচনা করলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, এদের প্রতিটির প্রতিকারের জন্যে স্বতন্ত্র পদ্ধতি ও শর্তের প্রয়োজন। যেমন ঃ মানসিক ও আচরণগত কারণকে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে এবং আসন্ন ক্ষতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিকার করতে হবে; যেমনটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠে দ্বীনের অনুসন্ধানের গুরুত্ব ও এ ব্যাপারে উদাসীনতার ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ।

অনুরূপ সামাজিক অপকর্মের প্রভাবকে প্রতিরোধ (এ ধরনের ঘটনার উৎপত্তির বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি) করতে হলে ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের ত্রুটিসমূহকে ধর্ম থেকে পৃথক করতে হবে। মানসিক ও সামাজিক কারণের প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখার ফলে ন্যূনতম এ লাভটুকু হবে যে, ব্যক্তি অবচেতনভাবে হলেও এ নির্বাহক দ্বারা স্বল্পমাত্রায় প্রভাবিত হবে ।

তদনুরূপ চিন্তাগত কারণের অপপ্রভাবকে প্রতিরোধ করার জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষকরে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস থেকে সঠিক বিশ্বাসকে পৃথক করতে হবে এবং দ্বীনের বিশ্বাসসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অযৌক্তিক ও দুর্বল প্রমাণের অবতারণা থেকে বিরত থাকতে হবে। একইভাবে সুস্পষ্টরূপে দেখাতে হবে যে, প্রমাণের দুর্বলতা, দাবিকৃত বিষয়ের দুর্বলতা নয়।

এটা স্পষ্ট যে, বিচ্যুতির সকল কারণ এবং তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপযুক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা (এ বইয়ের ক্ষুদ্র কলেবরে) যথোপযুক্ত নয়। ফলে শুধুমাত্র নাস্তিক্য প্রবণতার চিন্তাগত কারণ ও এতদ সংশ্লিষ্ট অনুপপত্তিগুলোর উত্তর দানেই তুষ্ট থাকব ।

পাঠ - ১৩

কয়েকটি ভুল ধারণার অপনোদন

- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন অস্তিত্বে বিশ্বাস
- সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভীতি ও অজ্ঞতার ভূমিকা
- কার্যকারণ বিধি কি একটি সার্বিক বিধি?
- অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সংগ্রহ

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন অস্তিত্বে বিশ্বাস ঃ

খোদা পরিচিতির ক্ষেত্রে একটি সাধারণ ভুল ধারণা হল যে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুধাবনযোগ্য নয় এমন অস্তিত্বময়ের অস্তিত্বে কিরূপে বিশ্বাস করা যায়?

এ ধরনের ভুল ধারণা সরল চিন্তার ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে পরিলক্ষিত হয়। তাদের মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন বস্তুর অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। তবে এমন সকল চিন্তাবিদও খুঁজে পাওয়া যায়, যারা তাদের চিন্তার ভিতকে ইন্দ্রিয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন অথবা অন্ততঃপক্ষে সন্দেহাতীতরূপে শনাক্তকরণের উপযুক্ত নয় বলে মনে করেছেন ।

এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে অর্জিত হয় এবং আমাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই স্বীয় কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুগত বিষয়কে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে অনুভব করে থাকে। ফলে যেমনিকরে আশা করা যায় না যে, চোখ শব্দ শুনবে ও কর্ণ রংসমূহকে দেখবে, তেমনি এটাও আশা করা উচিৎনয় যে, আমাদের সমষ্টিগত ইন্দ্রিয়সমূহও সকল প্রকার অস্তিত্বকেই অনুভব করতে পারবে।

কারণ প্রথমত ঃ বস্তুগত অস্তিত্বসমূহের মধ্যেও এমন কিছু অস্তিত্ব রয়েছে যেগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। যেমন ঃ আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ অতিবেগুনী রশ্মি, রঞ্জন- রশ্মি, ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক তরঙ্গকে দেখতে অক্ষম ।

দ্বিতীয়ত ঃ এমন অনেক বাস্তবতা বিদ্যমান যেগুলোকে আমরা ইন্দ্রিয় বহির্ভূত উপায়ে অনুভব করে থাকি এবং সন্দেহাতীত ভাবেই এগুলোকে আমরা বিশ্বাস করি –যদিও ঐগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নয়। যেমন ঃ আমরা ভয়, ভালবাসা অথবা স্বীয় ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত আছি এবং সন্দেহাতীতভাবে ঐগুলোর অস্তিত্বকে স্বীকার করি –যদি ও এ আত্মিক বিষয়গুলো আত্মার মতই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভবযোগ্য নয়। এমন কি স্বয়ং অনুভূতিও অবস্তুগত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্ভূত বিষয়।

অতএব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোন বিষয় অনুভূত না হওয়ার অর্থই এটা নয় যে, এর অস্তিত্ব নেই। বরং এ ধরনের কোন বিষয়ের (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন অস্তিত্ব) অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব কিছু নয় ।

সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভীতি ও অজ্ঞতার ভূমিকা ঃ

অপর একটি ভুল ধারণা, যা কোন কোন সমাজতাত্ত্বিকের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তা হল এই যে, খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসসমূহ বিপদের প্রভাব বিশেষকরে, ভূমিকম্প, বজ্রপাত ইত্যাদি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ স্বীয় মানসিক শান্তির জন্যে খোদা নামক এক কাল্পনিক অস্তিত্বকে (العياذ بالله) সৃষ্টি করেছে এবং তার উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেছে। সুতরাং এ ধারণামতে প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের উৎপত্তির কারণ এবং ঐগুলো থেকে নিরাপদে থাকতে পারার পদ্ধতি যতবেশী আবিস্কৃত হবে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসও ততটা দুর্বলতর হতে থাকবে ।

মার্কসবাদিরা আরও বাগাড়ম্বরপূর্ণতা সহকারে স্বীয় পুস্তকসমূহে এ বিষয়টিকে সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানের অর্জিত বিষয় বলে উল্লেখ করে থাকেন এবং মূর্খ ব্যক্তিদেরকে প্রতারণা করার জন্যে এটি একটি কৌশলমাত্র বলে মনে করে থাকেন ।

উত্তরে বলা উচিৎ ঃ

প্রথমতঃ এ ভুলধারণার উৎস হল কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদের অনুমান এবং এর সপক্ষে যথোপযুক্তকোন তাত্ত্বিক যুক্তি নেই ।

দ্বিতীয়তঃ অধুনা অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিই, যারা প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ সম্পর্কে অন্য সকলের চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ ছিলেন ও আছেন এবং এমতাবস্থায় খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কেও তারা সন্দেহাতীত ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতেন এবং করছেন।[১] অতএব খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস যে, ভীতি ও অজ্ঞতারই ফল, এমনটি হতে পারে না ।

তৃতীয়তঃ কোন কোন প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে উৎসারিত ভীতি ও তাদের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে অজ্ঞতাই যদি খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসের কারণ হয়েও থাকে, তথাপি তার অর্থ এ নয় যে, খোদাভীতি ও অজ্ঞতার সৃষ্টি।

১। যেমন ঃ আইনেষ্টাইন, মরিসন, অ্যাল্যাক্সিস কার্ল ও অন্যান্য প্রখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ খোদার অস্তিত্ব শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছেন ।

এমন অনেক মানসিক প্রবণতা আছে, যেমন ঃ সৌন্দর্যপ্রিয়তা, খ্যাতি লাভেচ্ছা ইত্যাদি, যা তাত্ত্বিক, প্রকৌশলিক ও দার্শনিক গবেষণার কারণ হয়ে থাকে । অথচ তা ঐ গুলোর বিশ্বস্ততাকে কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না।

চতুর্থতঃ যদি কেউ খোদাকে অজ্ঞাত কারণবিশিষ্ট বিষয়সমূহের অস্তিত্বদাতা হিসেবে শনাক্ত করে থাকেন এবং ঐগুলোর প্রাকৃতিক কারণ আবিস্কৃত হওয়ার পর যদি তাদের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে তবে এটাকে তাদের বিশ্বাসেরই দুর্বলতা বলে মনে করতে হবে, যা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসের অবৈধতার প্রমাণ নয় । কারণ প্রকৃতপক্ষে জাগতিক বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে খোদার কারণত্ব , প্রাকৃতিক কারণের মত নয় ও তাদের সামন্তরিক কোন কারণও নয় । বরং এ কারণত্ব সকল কারণের উর্ধ্বে ও সমুদ্বয় বস্তুগত এবং অবস্তুগত কারণের উলম্বে অবস্থান করে । সুতরাং প্রাকৃতিক কারণের শনাক্তকরণ বা না করণ, একে গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রভাব ফেলে না ।

কার্যকারণবিধি কি একটি সার্বিক বিধি ?

অপর একটি ভুলধারণা, যা কোন কোন পাশ্চত্য চিন্তাবিদ উল্লেখ করেছেন তা হল ঃ যদি কার্যকারণ বিধির সার্বিকতা থেকে থাকে তবে খোদার জন্যেও কোন কারণকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। অথচ মহান আল্লাহ্ হলেন প্রারম্ভিক কারণ, যার অস্তিত্ব কোন কারণের উপর নির্ভরশীল নয়। অতএব কারণবিহীন খোদাকে স্বীকার করার অর্থ হল কার্যকারণ বিধির পরিপন্থি এবং এ বিধির সার্বজনীনতার ব্যতিক্রম কোন বিষয়ের স্বীকৃতি প্রদান । অপরপক্ষে যদি এ বিধির সার্বজনীনতাকে অস্বীকার করি , তবে অনিবার্য অস্তিত্বকে প্রমাণের জন্যে এ বিধিকে প্রয়োগ করতে পারব না । কারণ, হয়ত কেউ বলতে পারেন যে, বস্তুমূল অথবা শক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং কোন কারণের সাহায্য ব্যতিরেকেই অস্তিত্বে এসেছে। অতঃপর এর পরিবর্তন ও বিবর্তনের মাধ্যমেই অন্য সকল বিষয়বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে ।

এ ভুলধারণাটি (যেমনটি ৭ম পাঠে বর্ণিত হয়েছে) কার্যকারণ বিধির অপব্যাখ্যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে । অর্থাৎ এরূপ চিন্তা করেছেন যে, উল্লেখিত বিধিটির প্রকৃত ভাবার্থ হল ' সকল কিছুই কারণের উপর নির্ভরশীল '। অথচ

এর সঠিক ব্যাখ্যা হল 'প্রতিটি সম্ভাব্য অস্তিত্ব বা নির্ভরশীল অস্তিত্বই কারণের উপর নির্ভরশীল'। এ বিধিটি এমন এক বিধি, যা সার্বজনীন ও ব্যতিক্রমতাবর্জিত।

আবার যদি মনে করা হয় যে, বস্তুমূল ও শক্তি কোন কারণ ব্যতীতই অস্তিত্বে এসেছে এবং তার বিবর্তনেই অন্য সকল কিছু সৃষ্টি হয়েছে ; তাহলে তার জন্যে অনেক প্রশ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পরবর্তীতে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করব বলে আশা রাখি ।

অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সংগ্রহ ঃ

অপর একটি ভুলধারণা হল এই যে, বিশ্ব ও মানুষের জন্যে কোন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন কোন বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । যেমন ঃ রসায়নে প্রমাণিত হয়েছে যে, বস্তু ও শক্তির মোট পরিমাণ সর্বদা ধ্রুব এবং কোন কিছুই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসেনা । অনুরূপ কোন অস্তিত্বই সম্পূর্ণরূপে বিনাশিত হয়ে যায় না। অথচ খোদার উপাসকগণ বিশ্বাস করেন যে, খোদা সৃষ্ট বিষয়সমূহকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন ।

অনুরূপ জীববিজ্ঞানে প্রতিপাদিত হয়েছে যে, জীবন্ত অস্তিত্ব নির্জীব অস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে বিবর্তন ও বিকাশের মাধ্যমে মানবীয় রূপ লাভ করেছে । অথচ খোদার উপাসকগণ বিশ্বাস করেন যে, খোদা তাদের প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করেছেন ।

উত্তরে বলতে হবে ঃ

প্রথমতঃ বস্তু ও শক্তির নিত্যতাসূত্র হল, একটি তাত্ত্বিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতি যা শুধুমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপযোগী বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত দার্শনিক বিষয়টির সমাধান করা সম্ভব নয়। যথা ঃ পাদার্থ এবং শক্তি কি অনাদি ও অনন্ত হতে পারে ?

দ্বিতীয়তঃ মোট পদার্থ ও শক্তির পরিমাণ ধ্রুব ও চিরন্তন হওয়ার অর্থ, সৃষ্টি কর্তার উপর অনির্ভরশীলতা (সৃষ্টির জন্যে) নয়। বরং পৃথিবীর বয়ঃসীমা যত দীর্ঘতর হবে, সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার নির্ভরশীলতাও ততবেশী হবে।

কারণ কার্যের (Effect) কারণের (Cause) উপর নির্ভরশীলতার মানদণ্ড হল তার (কার্যের) সম্ভাব্যতা ও সত্তাগত নির্ভরশীলতা – সৃষ্টি ও কালের সীমাবদ্ধতায় নয়। অন্য কথায় ঃ পদার্থ ও শক্তি হল বিশ্বের বস্তুগত কারণ, কর্তৃকারণ নয় এবং তারাও স্বয়ং কর্তৃকারণের উপর নির্ভরশীল।

তৃতীয়ত ঃ পদার্থ ও শক্তির পরিমাণ ধ্রুব হওয়ার অর্থ, নতুন কোন সৃষ্টির আবির্ভাব ও হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যতিক্রম নয়। অপরপক্ষে আত্মা (روح) , জীবন (حيات) চেতনা (شعور) ও প্রত্যয় ইত্যাদি বিষয়গুলো পদার্থ ও শক্তির মত কোন বিষয় নয় যে, তাদের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে পদার্থ ও শক্তির নিত্যতা সূত্রের পরিপন্থী কোন ঘটনা ঘটবে।

চতুর্থত ঃ বিবর্তনের ধারণাটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখনো যথেষ্ট স্বীকৃতি পায়নি। বরং অধিকাংশ বিজ্ঞ -মনীষী কর্তৃক পরিত্যাজ্যও হয়েছে। এ ধারণাটির সাথে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসের কোন বিরোধ নেই । সর্বোচ্চ হলেও তা শুধুমাত্র জীবন্ত অস্তিত্বসমূহের মধ্যে একপ্রকার সহায়ক কারণত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে --অস্তিত্বদাতা প্রভুর সাথে অস্তিত্বময়ের সম্পর্ককে নিষেধ করে না । আর এর প্রমাণ হল এই যে, এ ধারণারই অনেক সমর্থক, বিশ্ব ও মানুষের জন্যে এক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করতেন এবং করেন।

পাঠ - ১৪

বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টি এবং এর ত্রুটি নির্দেশ

- বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টির মূলনীতিসমূহ
- প্রথম মূলনীতির পর্যালোচনা
- দ্বিতীয় মূলনীতির পর্যালোচনা
- তৃতীয় মূলনীতির পর্যালোচনা
- চতুর্থ মূলনীতির পর্যালোচনা

বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টির মূলনীতিসমূহ ঃ

বস্তগত বিশ্বদৃষ্টির মূলনীতিগুলোকে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে ঃ

প্রথমতঃ অস্তিত্ব হল বস্তু ও বস্তসম্বন্ধীয় বিষয়ের সমান । ঐগুলোকেই অস্তিত্বশীল বলা যাবে, যেগুলো হল বস্তু এবং যারা ত্রিমাত্রিক (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বিশিষ্ট) ও যাদের আয়তন আছে; অথবা যারা বস্তুগত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে পরিগণিত। স্বভাবতঃই বস্তু স্বয়ং নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিকারী যা বিভাজনযোগ্য। এ মূলনীতির ভিত্তিতে অবস্তুগত ও অতিপ্রাকৃতিক অস্তিত্ব হিসেবে খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় ।

দ্বিতীয়তঃ বস্তু হল অনদি ও অনন্ত এবং অসৃষ্ট অস্তিত্ব যা কোন কারণের উপর নির্ভরশীল নয় । অর্থাৎ দার্শনিক পরিভাষায় আমরা যাকে বলি অনিবার্য অস্তিত্ব ।

তৃতীয়তঃ বিশ্বের জন্যে কোন চূড়ান্ত কারণ বা উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করা যায় না। কারণ এমন কোন সচেতন ও প্রত্যয়ী কর্তা নেই, যার প্রতি কোন উদ্দেশ্যকে আরোপ করা যাবে ।

চর্তুথতঃ বিশ্বে বিদ্যমান সৃষ্টিকুল (বস্তুমূল নয়) বস্তুকণার গতির ফলে এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রবর্তী সৃষ্টিসমূহকে উত্তরবর্তী সৃষ্টিসমূহের জন্যে একপ্রকার শর্ত ও সহায়ক কারণরূপে মনে করা যেতে পারে এবং বস্তুগত বিষয়ের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একপ্রকার প্রাকৃতিক কর্তৃত্বকে মেনে নেয়া যায়। যেমন ঃ বৃক্ষকে ফলের জন্যে প্রাকৃতিক কর্তা বলা যায়। অনুরূপ বস্তুগত ও রাসায়নিক বিষয়সমূহও নিজ নিজ নির্বাহকসমূহের সাথে সম্পর্ক যুক্ত । কিন্তু কোন সৃষ্ট বিষয়ই সৃষ্টিকর্তা বা অস্তিত্বদাতা কর্তার উপর নির্ভরশীল নয় ।

উপরোক্ত মূলনীতিসমূহের সাথে অপর একটি মূলনীতিকে পঞ্চম মূলনীতি রূপে উল্লেখ করা যেতে পারে, যা পরিচিতি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং যা এক দৃষ্টিকোণ থেকে অপর সকল মূলনীতির শীর্ষে অবস্থান করে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল ঃ

একমাত্র সে সকল পরিচিতিই গ্রহণযোগ্য, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা শুধুমাত্র বস্তু ও বস্তুগত বিষয়কেই প্রতিপাদন করে সেহেতু অন্য কোন কিছুরই গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে না।

কিন্তু এ মূলনীতির অসারতা পূর্ববর্তী পাঠে প্রতিভাত হয়েছে। সুতরাং নতুন করে একে খণ্ডনের প্রয়োজন নেই। ফলে এখানে আমরা অন্যান্য মূলনীতিসমূহের সমালোচনায় মনোনিবেশ করব ।

প্রথম মূলনীতির পর্যালোচনা ঃ

এ মূলনীতিটি, যা বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টির মৌলিকতম মূলনীতি হিসেবে পরিগণিত তা প্রকৃতপক্ষে নিরর্থক ও অযৌক্তিক দাবি ব্যতীত আর কিছুই নয়। বিশেষ করে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা অতিপ্রাকৃতিক বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করার মত কোন প্রমাণই উপস্থাপন করতে পারবে না। কারণ এটা স্পষ্ট যে, কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানই স্বীয় বস্তু ও বস্তুগত পরিসীমাকে অতিক্রম করে, কোন কিছুর ব্যাপারে মন্তব্য অথবা কোন কিছুকে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারবে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার যুক্তিতে সর্বোচ্চ যা বলা যাবে, তা হল এই যে, এর (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার) ভিত্তিতে অতিপ্রাকৃতিক বিষয়কে প্রমাণ করা যাবে না। অতএব কমপক্ষে তার (অতিপ্রকৃতিকে) অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে মেনে নেয়া উচিৎ।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে, মানুষ এমন অনেক অবস্তুগত বিষয়কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধি করে থাকে, যেগুলো বস্তু বা বস্তুগত কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারি নয় । যেমন ঃ আত্মাকে (روح) মানুষ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধি করে । অনুরূপ নির্বস্তুক বিষয়ের (امور مجرّد) স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, যা দর্শনের বিভিন্ন পুস্তকে সংরক্ষিত আছে। নির্বস্তুক আত্মার অস্তিত্বের সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে সত্য স্বপ্নসমূহ, যোগীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড,[১] নবী-রাসুল ও ওলীগণের (আলাইহিমু ছালাম) বিভিন্ন মো'জেযা ও কিয়ামতের কথা বিশেষভাবে

১। হিন্দু যোগীরা আত্মিকশক্তিকে অপব্যবহারের মাধ্যমে অনেক অলৌকিক ঘটনার জন্ম দেয়। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অবৈধ।

উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর বস্তুগত না হওয়ার স্বপক্ষে, যে সকল দলিল, প্রমাণের অবতারণা হয়েছে তা-ই এ মূলনীতিটির অসারতা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট।

দ্বিতীয় মূলনীতির পর্যালোচনা ঃ

এ মূলনীতিতে বস্তুর অনাদি ও অনন্ত হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে, বস্তু হল অসৃষ্ট। কিন্তু,

প্রথমতঃ বস্তুর অনাদি ও অনন্ত হওয়া, বৈজ্ঞানিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিপাদনযোগ্য নয়। কারণ ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই স্থান ও কালের দৃষ্টিতে বিশ্বের অনন্ত হওয়ার কথা প্রমাণ করতে পারবে না ।

দ্বিতীয়তঃ বস্তুকে অনাদি মনে করলেও, তার পারস্পরিক অর্থ এ নয় যে, তা সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন ঃ কোন যান্ত্রিক গতির অনাদি হওয়ার কথা কল্পনা করার পারস্পরিক অর্থ হল, এক অনাদি উদ্দীপক শক্তিকে কল্পনা করা –উদ্দীপক শক্তির উপর এর অনির্ভরশীলতা নয়।

এ ছাড়া বস্তুর অসৃষ্ট হওয়ার অর্থ হল, এর অনিবার্য অস্তিত্ব হওয়া । কিন্তু অষ্টম পাঠে আমরা প্রমাণ করেছি যে, বস্তুর পক্ষে অনিবার্য অস্তিত্ব হওয়া অসম্ভব।

তৃতীয় মূলনীতির পর্যালোচনা ঃ

তৃতীয় মূলনীতিটি অস্বীকার করে যে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তা হতে স্বভাবতঃই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের অস্বীকৃতির প্রকাশ পায়। তাই প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করার মাধ্যমে যুগপৎ এ নীতিটির অসারতাও প্রমাণিত হয়।

এ ছাড়া প্রশ্ন আসে যে, কিরূপে বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারি কোন মানুষ মানব তৈরীকৃত কোন কিছুর পর্যবেক্ষণে তৈরীকারকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে, অথচ এক বিস্ময়কর সুবিন্যস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তাতে বিদ্যমান বিভিন্ন

বিষয়বস্তুর পারস্পরিক বন্ধন ও অগণিত কল্যাণময় সৃষ্টিকে অবলোকন করেও এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনবগত থাকবে ?

চতুর্থ মূলনীতির পর্যালোচনা ঃ

বস্তুগত বিশ্বদৃষ্টির চতুর্থ মূলনীতিটি হল কারণত্বকে শুধুমাত্র বস্তুগত সৃষ্টিসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা, যা প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ সমস্যাগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ হল ঃ

প্রথমতঃ এ মূলনীতি অনুসারে কখনোই কোন নব অস্তিত্বের আবির্ভাব ঘটা উচিৎনা। অথচ প্রতিনিয়ত আমরা বিশেষ করে মানব ও প্রাণীজগতে নবনব অস্তিত্বের সংযোজন লক্ষ্য করছি । এ গুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল জীবন, চেতনা, অনুভূতি, আবেগ, সৃজনশীলতা ও প্রত্যয়।

বস্তুবাদীরা বলেন, উল্লেখিত বিষয়গুলোও বস্তুগত বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

উত্তরে বলব ঃ

প্রথমতঃ উল্লেখিত বিষয়গুলো খণ্ডনযোগ্য নয়। অথচ বস্তু ও বস্তুগত বিষয়গুলো হল খণ্ডন ও বিভাজনযোগ্য এবং আকৃতি বিশিষ্ট। কিন্তু উপরোক্ত বিষয়গুলো এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়।

দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়গুলো যেগুলোকে 'বস্তুগত বৈশিষ্ট্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে নিঃসন্দেহে এগুলো কোন নির্জীব বস্তুতে বিদ্যমান ছিলনা । অন্য কথায় ঃ কোন এক সময় বস্তু এগুলোর অভাবে ছিল এবং পরবর্তীতে এ গুলোর অধিকারী হয়েছে । অতএব বস্তুগত বৈশিষ্ট্য বলে পরিচিত এ বিষয়গুলোকে অস্তিত্বে আসার জন্যে এমন এক অস্তিত্বদানকারীর উপর নির্ভর করতে হয়, যে এগুলোকে অস্তিত্বদান করে। আর তা-ই হল সৃষ্টিকারী বা অস্তিত্বদাতা কারণ ।

এ মতবাদটির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল যে, এ নীতি অনুসারে বিশ্বের সকল কিছু বাধ্যতামূলক হতে হবে । কারণ বস্তুর আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্বীয় নির্বাচন ও স্বাধীনতার কোন স্থান নেই।

স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যতিক্রম, যার পারস্পরিক অর্থ হল, যে কোন প্রকার দায়িত্ব-পরায়ণতা এবং চারিত্রিক ও আত্মিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করা। আর দায়িত্বপরায়ণতা ও মূল্যবোধসমূহকে অস্বীকার করা যে, মানবিক জীবন ব্যবস্থার জন্যে কতটা হুমকিস্বরূপ তা বলাই বাহুল্য ।

সর্বোপরি বস্তু অনিবার্য অস্তিত্ব হতে পারে না, (ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে) এ যুক্তির আলোকে বলতে হয়, কোন এক কারণকে জাগতিক বিষয়সমূহের জন্যে বিবেচনা করতে হবে এবং এ ধরনের কোন কারণ প্রাকৃতিক বা সহায়ক কারণের মত হবে না। কারণ এ ধরনের শৃঙ্খলা বা পারস্পরিক সম্পর্ক শুধুমাত্র বস্তুগত বিষয়সমূহের পরস্পরের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু সমগ্রবস্তু স্বীয় কারণের সাথে এ ধরনের সম্পর্ক (অর্থাৎ একটি অপরটির কারণ) বজায় রাখতে পারবে না। অতএব যে কারণ বস্তুকে অস্তিত্বে এনেছে তা হল সৃষ্টিকারী কারণ –যা অতিবস্তুগত বিষয়।

পাঠ - ১৫

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও তার ত্রুটিনির্দেশ

- যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ
- বৈপরীত্য নীতি ও এর সমালোচনা
- দৈবাৎ নীতি ও এর সমালোচনা
- বিপ্রতী পদ্বয়ের বিবর্তননীতি ও এর সমালোচনা

যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ঃ

বস্তুবাদ একাধিক শাখায় বিভক্ত। এদের প্রতিটিই বিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা প্রদান করে। নবযুগের প্রারম্ভিক লগ্নে বস্তুবাদীরা নিউটনের পদার্থ সম্পর্কীয় মতবাদের প্রয়োগে জাগতিক যাবতীয় সৃষ্টিসমূহকে যান্ত্রিক গতির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তারা প্রতিটি গতি (বা পরিবর্তনকেই) কোন বিশেষ গতিশক্তির ফল বলে মনে করেছেন যা বাইরে থেকে গতিশীল (পরিবর্তনশীল) বস্তুতে প্রবেশ করে । অন্য কথায় ঃ তারা বিশ্বব্রম্মাণ্ডকে এমন একটি বৃহৎ যানবাহনের সাথে তুলনা করেছেন যে, গতিশক্তি তার এক অংশ থেকে অন্য অংশে পরিচালিত হয় যার ফলে এ বৃহৎ যানবাহনটি গতিশীল হয়ে থাকে।

'যান্ত্রিক বস্তুবাদ' বলে পরিচিত এ মতবাদটির অনেক দুর্বলতা বিদ্যমান যেগুলো প্রতিপক্ষের সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য একটি হল ঃ যদি সকল প্রকার গতিই বাহ্যিক কোন শক্তির ফল হয়ে থাকে তবে প্রারম্ভিক বস্তুর জন্যেও কোন শক্তিকে বিবেচনা করতে হবে, যা বাইরে থেকে তাতে প্রবেশ করেছে। আর এর অবিচ্ছেদ্য অর্থ হল কোন অতিপ্রাকৃতিক অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়া, যা ন্যূনতমপক্ষে বস্তুজগতের প্রারম্ভিক গতির উৎস হয়ে থাকবে ।

অপরটি হল ঃ শুধুমাত্র ঘুর্ণনগতি ও স্থানান্তরিকগতিকেই যান্ত্রিক গতিশক্তির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অথচ বিশ্বের সকল বিষয়কে কেবলমাত্র স্থানান্তরিতগতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে মনে করা যায় না। সুতরাং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ের উৎপত্তির জন্যে অপর এক কারণ ও নির্বাহীকে বিবেচনা করা অপরিহার্য ।

এ অনুপপত্তিসমূহের উত্তরদানে যান্ত্রিক বস্তুবাদের অক্ষমতা, বস্তুবাদীদেরকে জগতিক বিভিন্ন রূপান্তরের ব্যাখ্যার জন্যে অপর এক কারণের দারস্থ হতে বাধ্য করে এবং ন্যূনতমপক্ষে তারা কোন কোন গতিকে স্বয়ংক্রিয়তার ভিত্তিতে অর্থাৎ (Dynamically) ব্যাখ্যা করতে, বস্তুর জন্যে একপ্রকার স্বয়ংক্রিয় আন্দোলনকে বিবেচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। বিশেষ করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পুরোধাগণ (মার্কস ও এ্যাংগেল্‌স) হেগেলের

দার্শনিক ধারণার ভিত্তিতে গতির নির্বাহককে বস্তুর আভ্যন্তরীণ বিরোধরূপে ব্যাখ্যা করেছেন । তারা স্বীয় মতবাদের ব্যাখ্যার জন্যে, বস্তুর অবিনাশিতাবাদ ও অসৃষ্ট-নীতি সার্বজনীন গতি এবং সৃষ্ট বিষয়সমূহের পারস্পরিক প্রভাবের মূলনীতিকে গ্রহণ করার পাশাপাশি নিম্নলিখিত তিনটি মৌলিক বিষয়কে বর্ণনা করেছেন ঃ

১। আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যনীতি।

২। দৈবাৎনীতি বা সংখ্যাবাচক (كمّى) রূপান্তরের গুণবাচক রূপান্তরে পরিবর্তন।

৩। বিপ্রতীপদ্বয়ের বিবর্তননীতি বা প্রকৃতির বিকাশনীতি।

আমরা এখানে উল্লেখিত নীতিত্রয়ের প্রতিটির সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করব এবং পরিশেষে তাদের অসারতা প্রমাণে প্রয়াসী হব।

বৈপরীত্য নীতি ঃ

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিশ্বাস করে যে, সকল যৌগই দু'টি বিপ্রতীপ (Thesis Ges Anti-thesis) নিয়ে গঠিত। এ বিপ্রতীপদ্বয়ের বৈপরীত্যই বস্তুর গতি ও রূপান্তরের কারণ । যখনই Anti-thesis বিজয়ী হয় তখনই নতুন এক বস্তু, যা তাদের Synthesis বলে পরিগণিত, তা অস্তিত্ব লাভ করে থাকে। যেমন ঃ মুরগীর ডিমে (Thesis) শুক্রাণু (Anti-thesis) বিদ্যমান, যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং খাদ্যোপাদনসমূহকে নিজের অভ্যন্তরে হজম করে; অতঃপর মুরগীর বাচ্চা ঐগুলোর Synthesis হিসাবে অস্তিত্ব লাভ করে থাকে।

বৈদ্যুতিক ধনাত্মকতা ও ঋণাত্মকতা হল পদার্থের আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তেমনি যোজন -বিয়োজন, প্রাথমিক পর্যায়ের গাণিতিক বৈপরীত্য এবং ডিফারেন্সিয়েশন ও ইন্টিগ্র্যাশন উচ্চপর্যায়ের গাণিতিক বৈপরীত্য বলে পরিগণিত হয়ে থাকে ।

এ বিষয়টি সামাজিক ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে পুঁজিবাদী সমাজে কর্মজীবি শ্রেণী হল পুঁজিবাদীদের Anti -thesis

যা প্রবৃদ্ধি লাভ করে এবং পর্যায়ক্রমে পুঁজিবাদের উপর বিজয়ী হয়ে তাদের Synthesis হিসেবে সমাজতান্ত্রিক (Socialistic) ও সাম্যবাদী (Communistic) সমাজ রূপ পরিগ্রহ করে থাকে।

মার্কসবাদের প্রবক্তার বলেন যে, এ বৈপরীত্য নীতিটি ম্যাটাফিজিক্যাল ধারণাকে (পারস্পরিক বৈপরীত্যের অসম্ভাব্যতা) প্রত্যাখ্যান করে ।

সমালোচনা ঃ

প্রারম্ভেই স্মরণযোগ্য যে, দু'টি বস্তুগত অস্তিত্ব যদি পরস্পর এমনভাবে অবস্থান করে যে, তাদের একটি অপরটিকে দুর্বল করে ফেলে অথবা নিশ্চিহ্ন করে ফেলে স্বীয় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে; তবে এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। যেমনটি পানি ও আগুনের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু,

প্রথমতঃ এ ব্যাপারটি সার্বজনীন নয় এবং একে বিশ্বের সকল ঘটনার জন্যে কোন সূত্র হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। কারণ এর ব্যতিক্রম এমন শত-সহস্র ঘটনা এ বিশ্বে বিদ্যমান ।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন বস্তুতে প্রাপ্ত এ ধরনের বৈপরীত্যের সাথে যুক্তি-বিজ্ঞান ও পরাপ্রাকৃতিক দর্শনে বর্ণিত অসম্ভাব্যতার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ অসম্ভব বলে যাকে গণনা করা হয়েছে, তা হল একই বিষয়ে পরস্পর বিপ্রতীপের সমাবেশ, (اجتماع الضدّين فى موضوع واحد)। উপরোল্লিখিত উদাহরণসমূহের কোনটিতেই বিষয়বস্তু একক নয়। আর মার্কসবাদীদের হাস্যকর উদাহরণের কথাতো বলারই অপেক্ষা রাখে না। যেমন ঃ যোজন ও বিয়োজন অথবা ডিফারেন্সিয়েশন ও ইন্টিগ্রেশনের সমাবেশ ইত্যাদি, অথবা পুঁজিবাদী সমাজে কর্মজীবি শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীকরণ ।

তৃতীয়তঃ যদি সকল কিছুই দু'টি বিপ্রতীপের সমন্বয়ে অস্তিত্বে এসে থাকে, তবে প্রতিটি Thesis এবং Anti - thesis -এর জন্যেও অপর একটি সমন্বয়কে বিবেচনা করতে হবে। কারণ এগুলোও দুটি স্বতন্ত্র বিষয়। ফলে বর্ণিত নীতি অনুসারে এরাও দু'টি বিপ্রতীপের সমন্বয় হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ফলশ্রুতিতে, প্রতিটি ক্ষুদ্রতম অস্তিত্বই অসীমসংখ্যক বিপ্রতীপের সমন্বয় হতে হবে।

অপরদিকে যান্ত্রিক বস্তুবাদের দুর্বলতাকে দূরীকরণের নিমিত্তে, আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যকে যে গতি বা বিবর্তনের মূলনির্বাহক হিসেবে পরিচয় করানোর চেষ্টা করেছেন, তা ন্যূনতমপক্ষে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হল, এ ধারণার স্বপক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তিরই অস্তিত্ব নেই। তাছাড়া বাহ্যিক শক্তির প্রভাবে যে যান্ত্রিক গতির উৎপত্তি হয়, তা যে কোন অবস্থায়ই অনস্বীকার্য। নতুবা প্রশ্ন থেকে যায়, ফুটবলের গতিও কি তার আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের ফলে সৃষ্ট বলতে হবে, না কি খেলোয়াড়ের পায়ের আঘাতে সৃষ্ট বলতে হবে !

দৈবাৎনীতি ঃ

জগতের সকল পরিবর্তনই পর্যায়ক্রমে ও একক রেখায় সজ্জিত নয়। অধিকাংশ সময়ই নতুন এমন কোন বিষয়ের আবির্ভাব ঘটে, যা পূর্ববর্তী সকল সৃষ্টবিষয় থেকে স্বতন্ত্র এবং তাকে পূর্ববর্তী গতি বা পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে বর্ণনা করা যায় না । এ ধারণার উপর ভিত্তি করে, মার্কসবাদীরা, দৈবাৎনীতি বা 'পরিমাণবাচক পরিবর্তনের গুণবাচক পরিবর্তনে রূপান্তরের পথ' নামক অপর একটি নীতির প্রবর্তন করেছেন। এ নীতিতে তারা বলেন ঃ সাংখ্যিক পরিবর্তন যখন কোন এক বিশেষ বিন্দুতে পৌঁছে, তখন গুণগত বা প্রকরণগত পরিবর্তনের উদ্ভব হয়। যেমন ঃ পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যখন একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে, তখন পানি, বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। অনুরূপ প্রতিটি ধাতবপদার্থের জন্যেই নির্দিষ্ট গলনাংক বিদ্যমান এবং যখন তাপমাত্রা ঐ গলনাংকে পৌঁছে উক্ত ধাতবপদার্থ তরলপদার্থে পরিণত হয় । মানব সমাজেও যখন বিরোধ বা মতপার্থক্যের তীব্রতা নির্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছে, তখন বিপ্লব অস্তিত্বে আসে ।

সমালোচনা ঃ

প্রথমতঃ কোন ক্ষেত্রেই সংখ্যাবাচকতা, গুণবাচকতায় রূপান্তরিত হয় না। সর্বোপরি যা ঘটে তা হল কোন নির্দিষ্ট বস্তুর উৎপত্তি নির্দিষ্ট সংখ্যাবাচকতার শর্তাধীন । যেমন ঃ পানির তাপমাত্রা বাষ্পে পরিণত হয় না। বরং পানির বাষ্পে পরিণত হওয়াটা পানিতে বিদ্যমান তাপমাত্রার পরিমাণের শর্তাধীন।

দ্বিতীয়তঃ পরিবর্তনের জন্যে এ বাঞ্ছিত পরিমাণ, পর্যায়ক্রমিক পরিমাণগত বর্ধনের ফলে অর্জিত হওয়াটা অপরিহার্য নয়। বরং পূর্ববর্তী

পরিমাণের হ্রাসের ফলে এ পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে । যেমন ঃ বাস্পের পানিতে পরিবর্তীত হওয়াটা তাপমাত্রার হ্রাসের শর্তাধীন ।

তৃতীয়তঃ গুণগত পরিবর্তন সর্বদাই আকস্মিকভাবে ঘটে না । বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্যায়ক্রমিকভাবে ঘটে থাকে। যেমন ঃ মোম ও কাঁচের গলে যাওয়াটা পর্যায়ক্রমে ঘটে থাকে।

অতএব গ্রহণযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে, প্রাকৃতিক কতকগুলি বিষয়ের বাস্তবায়নের জন্যে কোন বিশেষ পরিমাণের আবশ্যকতা রয়েছে। না, পরিমাণের গুণে পরিবর্তনের আবশ্যকতা আর না, পরিমাণের ক্রমশ বৃদ্ধির আবশ্যকতা রয়েছে এবং না, কোন গুণগত ও পরিমাণগত যাবতীয় পরিবর্তনের জন্যে অনুরূপ শর্তের সামগ্রীকতা আবশ্যক।

সুতরাং বিশ্বজগতে দৈবাৎ নীতি বা 'পরিমাণবাচক পরিবর্তনের গুণবাচক পরিবর্তনে রূপান্তরের পথ' নামক কোন নীতির অস্তিত্ব নেই।

বিপ্রতীপদ্বয়ের বিবর্তননীতি ঃ

এ নীতিটি 'না-বোধকের না -বোধক ' নীতি বলে পরিচিত। কখনো কখনো একে প্রকৃতির বিবর্তন নীতিও বলা হয়ে থাকে। এ নীতির বক্তব্য হল ঃ দ্বান্দ্বিকতার অসংখ্য রূপান্তরের ধারায় সর্বদা Thesis, Anti - thesis কর্তৃক অস্বীকৃত হয়ে থাকে। অনুরূপ Anti - thesis ও স্বয়ং Synthesis কর্তৃক অস্বীকৃত হয়। যেমন ঃ বীজ, বৃক্ষকর্তৃক এবং তাও নতুন বীজসমূহ কর্তৃক অস্বীকৃত হয়। প্রাণ একক (نطفة) ডিম কর্তৃক এবং স্বয়ং ডিম বাচ্চা কর্তৃক অস্বীকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সকল অনুজই, অগ্রজ অপেক্ষা পূর্ণতর। অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক বিবর্তন-ধারা সর্বদা উন্নয়ন ও পূর্ণতার দিকে হয়ে থাকে। আর এ নীতির গুরুত্বও এখানেই সুপ্ত, যা রূপান্তর ধারাকে নির্দেশ করে এবং রূপান্তর ধারা উন্নয়ন ও পূর্ণতার দিকে বলে গুরুত্বারোপ করে।

সমালোচনা ঃ

নিঃসন্দেহে প্রতিটি পরিবর্তন ও বিবর্তনেই পূর্ববর্তী অবস্থান ও অবস্থা বিলুপ্ত হয়ে থাকে এবং নতুন কোন অবস্থা ও অবস্থানের সূত্রপাত ঘটে। যদি

'না-বোধকের না-বোধক' নীতিকে উপরোল্লেখিত অর্থে বিবেচনা করি, তবে তা রূপান্তরের অবিচ্ছেদ্য বিষয়ের বর্ণনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু এ নীতির যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং একে যে, গতি ও পূর্ণতার দিক-নির্দেশনা বলে মনে করা হয়েছে, সে প্রসঙ্গে বলতে হয় ঃ বিশ্বের গতি ও রূপান্তর পূর্ণতার দিকে বলতে যদি এ অর্থকে বুঝায় যে, প্রতিটি নতুন বিষয়ই অপরিহার্যভাবে পূর্ববর্তী বিষয় অপেক্ষা পূর্ণতর তবে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । ইউরেনিয়াম যে, অতিবিচ্ছুরণের প্রভাবে সীসায় পরিণত হয় তাও কি আর পূর্ণতা প্রাপ্তি বলে পরিগণিত হয় ? পানি যে, বাষ্পে পরিণত হয় অথবা বাষ্প যে পানিতে পরিবর্তিত হয় , তাতেও কি পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে ? বৃক্ষ ও লতা-পাতা যে, শুষ্ক হয়ে যায় এবং কোন প্রকার বীজ ও ফলই তাতে অবশিষ্ট না থাকে তা-ও কি তাদের পূর্ণতা প্রাপ্তি ?

অতএব শুধুমাত্র এটুকুই গ্রহণযোগ্য যে, কোন কোন প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু গতি ও পরিবর্তনের ফলে পূর্ণতর হয়ে থাকে (সকল বিষয়ই নয়)। সুতরাং বিবর্তনকেও বিশ্বের সকল সৃষ্ট বিষয়ের জন্যে একটি সার্বজনীন সূত্ররূপে গ্রহণ করা যায় না ।

পরিশেষে স্মরণ করব ঃ এ সকল নীতিগুলো সার্বজনীনভাবে যদি গৃহীত ও স্বীকৃতও হয়ে থাকে , তারপরও প্রকৃতি বিজ্ঞানে প্রমাণিত সূত্রসমূহের মত শুধুমাত্র সৃষ্ট বিষয় বস্তুর স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারত । কিন্তু, এমন কোন প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন নীতি ও সূত্রের অস্তিত্ব নেই যে, প্রমাণ করবে কোন বিষয় তার সৃষ্টিকর্তা বা অস্তিত্বদাতা কারণ ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে। যেমনিকরে পূর্ববর্তী পাঠসমূহে আমরা বর্ণনা করেছি যে, যেহেতু বস্তু ও বস্তুগত বিষয়সমূহ হল সম্ভাব্য অস্তিত্ব, সেহেতু কোন অনিবার্য অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল থাকা অপরিহার্য ।

পাঠ - ১৬

আল্লাহর একত্ব

- ভূমিকা
- আল্লাহর একত্বের প্রমাণ

ভূমিকা ঃ

পূর্ববতী পাঠসমূহে, বিশ্বসৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের অপরিহার্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে –যিনি সর্বজ্ঞ , পরাক্রমশালী এবং বিশ্বের অস্তিত্বদানকারী , রক্ষক ও পরিচালক। এ ছাড়া সাম্প্রতিক পাঠসমূহে আমরা বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা পূর্বক তার বিভিন্ন সমস্যা ও ত্রুটি সম্পর্কেও আলোকপাত করেছি। ফলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়েছে যে, সৃষ্টিকর্তাবিহীন বিশ্বের ধারণা হল একটি অযৌক্তিক ধারণা এবং এর স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা নেই ।

এখন একত্ববাদ সম্পর্কে আলোচনার পালা এসেছে। এ পর্যায়ে আমরা অংশীবাদী ধারণার অসারতা প্রমাণ করার প্রয়াস পাব।

অংশীবাদী বিশ্বাস কিরূপে মানুষের মাঝে পত্তন এবং বিস্তার লাভ করেছিল, সে ব্যাপারে সমাজ বিজ্ঞানীরা একাধিক মতবাদ ব্যক্ত করেছেন । কিন্তু ঐগুলোর কোনটির স্বপক্ষেই সুস্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য কোন যুক্তি নেই ।

সম্ভবতঃ অংশীবাদ এবং একাধিক খোদার বিশ্বাসের প্রথম কারণ ছিল বিশ্ব - ব্রমাণ্ডের বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ । এ বৈচিত্র্যের পর্যবেক্ষণে মানুষের মধ্যে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, প্রত্যেক প্রকারের ঘটনা, সংশ্লিষ্ট খোদার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়ে থাকে । যেমন ঃ কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, শুভ ঘটনাগুলো হল কল্যাণকামী প্রভুর কর্ম এবং মন্দ ঘটনাগুলো হল অকল্যাণকামী প্রভুর কর্ম। আর এ ভাবেই বিশ্বের জন্যে দু'খোদার বিশ্বাস প্রবর্তিত হয়েছিল।

অপরদিকে সূর্যালোক, চন্দ্র ও তারকাসমূহ যে, পার্থিব ঘটনাবলীর উপর প্রভাব ফেলে, তার আলোকে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, বিশ্বের বিষয়বস্তুর উপর ঐগুলোর এক প্রকার প্রভুত্ব বিদ্যমান ।

অথবা স্পৃশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য খোদার প্রতি ঝুঁকে পড়ার কারণে কল্পিত প্রভুদের মূর্তি তৈরী এবং তাদের উপাসনায় নিয়োজিত হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। কালক্রমে স্বয়ং মূর্তিসমূহ স্বল্প বুদ্ধির জনসমষ্টির মাঝে মূখ্য রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং সকল জাতি এমনকি প্রতিটি গোত্র নিজ নিজ কল্পনার ভিত্তিতে মূর্তি- পূজার জন্যে একাধিক ধর্মের প্রবর্তন করেছে – যাতে একদিকে যেমনি প্রভুভক্তির ফিত্‌রাতগত প্রবণতাকে ভিন্নরূপে উপস্থাপন করা যেতে

পারে, তেমনি অপরদিকে, নিজেদের পাশবিক লোভ-লালসাকে পবিত্রতার রঙে রঞ্জিত করা যেতে পারে এবং তদনুরূপ এগুলোকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির কলেবরে রূপ দেয়া যেতে পারে। আজোবধি উচ্ছৃংখল নৃত্য, মদ্যপ ও কামুক উৎসবসমূহ ধর্মীয় অনুষ্ঠান রূপে মূর্তিপূজারীদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

এ ছাড়া, স্বেচ্ছারী, শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার, প্রতিহিংসাপরায়ণ পাষণ্ডদের অভিলাষও সরলমনা জনসমষ্টির বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনার কারণ হয়েছিল। এভাবে স্বীয় রাজত্ব ও ক্ষমতার সম্প্রসারণের জন্যে তারা অংশীবাদী ধ্যান-ধারণার প্রচার ও প্রসারে প্রয়াসী হয়েছিল এবং নিজেদের জন্যে এক প্রকার প্রভুত্বে বিশ্বাসী ছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা দূর্বৃত্তদের উপাসনাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্তর্ভূক্ত করেছে। মিশর, ভারত, চীন,পারস্য ইত্যাদি দেশে এর সুস্পষ্ট নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়।

যাহোক অংশীবাদী ধর্মসমূহ, বিভিন্ন কারণ ও নির্বাহকের প্রভাবে, মানব সমাজে প্রথিত ও প্রচলিত হয়েছিল এবং ঐশীধর্ম ও একত্ববাদের ছায়ায় মানুষের প্রকৃত বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে নবীগণের (আঃ) প্রচেষ্টার এক বৃহত্তর অংশ জুড়ে স্থান পেয়েছিল অংশীবাদ ও অংশীবাদীদের বিরূদ্ধে সংগ্রাম। পবিত্র কোরানে পুনঃপৌনিকভাবে তাঁদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

অতএব অংশীবাদীবিশ্বাসের মূলভিত্তি, বিশ্বব্রম্মাণ্ডের কোন কোন ঘটনার জন্যে মহান প্রভু ভিন্ন অপর কোন অস্তিত্বের প্রতি প্রভুত্বের ধারণা থেকে রূপ লাভ করেছিল। তবে অংশীবাদীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বসৃষ্টি কর্তার একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তারা সৃজনক্ষমতার একত্বকে স্বীকার করেছিলেন; কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রভুদের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। তাদের ধারণানুসারে জগতের পরিচালনা ও রক্ষার ব্যাপারটি প্রত্যক্ষভাবে (এ দ্বিতীয় শ্রেণীর) প্রভুদের ইচ্ছাধীন। তারা সৃষ্টিকর্তা প্রভুকে বর্ণিত খোদাদের প্রভুরূপে নামকরণ করেছে। অর্থাৎ তিনি হলেন প্রভুদের প্রভু (رب الارباب)

কারো কারো মতে এ পরিচালক প্রভুরা হলেন ফেরেস্তাগণ। আরব অংশীবাদীরা এ ফেরেস্তাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে মনে করত। আবার কারো কারো মতে জিন-পরীরা, কারো কারো মতে নক্ষত্রসমষ্টির আত্মারা অথবা প্রয়াত মানুষের আত্মারা কিংবা এক বিশেষ ধরনের অজ্ঞাত অস্তিত্ব হল এ পরিচালক

প্রভুসকল।

দশম পাঠে আমরা ইঙ্গিত করেছিলাম যে, প্রকৃত সৃজনত্ব ও প্রতিপালনত্ব পরস্পর থেকে বিভাজনযোগ্য ও পৃথকীকরণযোগ্য নয় এবং আল্লাহর সৃজনত্বে বিশ্বাস (আল্লাহ ব্যতীত) অন্য কারো প্রতিপালনত্বের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। যারা এ ধরনের স্ববিরোধিতাপূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করতেন তারা প্রকৃতপক্ষে বর্ণিত অবস্থাদ্বয়ের বৈপরীত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেননি এবং তাদের বিশ্বাসের বাতুলতা প্রমাণ করার জন্যে এ বৈপরীত্যের সুস্পষ্ট কারণই যথেষ্ট ।

খোদার একত্বকে প্রমাণ করার জন্যে একাধিক যুক্তির অবতারণা হয়েছে; যেগুলো কালামশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। তবে আমরা এখানে এমন একটি যুক্তি উপস্থাপন করব, যাতে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিপালনত্বের একত্ববাদকে প্রতিপাদন করার পাশাপাশি, অংশীবাদী বিশ্বাসেরও অপনোদন হয়।

আল্লাহর একত্বের প্রমাণ ঃ

ধরা যাক বিশ্বের জন্যে দুই বা ততোধিক সৃষ্টিকর্তা বিদ্যমান। তাহলে তা নিম্নলিখিত অবস্থাসমূহের ব্যতিক্রম হবে না ঃ হয় বিশ্বের প্রতিটি বিষয়ই তাদের ফলশ্রুতি বা সৃষ্ট বলে পরিগণিত হবে অথবা প্রতিটি শ্রেণীই কোন এক প্রভুর সৃষ্ট বলে পরিগণিত হবে কিংবা সবকিছুই এক প্রভুর সৃষ্ট; তবে অন্যান্য খোদারা বিশ্বের পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক রূপে পরিগণিত হবে ।

কিন্তু 'সকল সৃষ্টরই একাধিক সৃষ্টিকর্তা বিদ্যমান' এ ধারণাটি অসম্ভব। কারণ, দুই বা ততোধিক সৃষ্টিকর্তা (অস্তিত্বদাতা কারণ) কোন অস্তিত্বশীলকে সৃষ্টি করার অর্থ হল, তাদের প্রত্যেকেই একটি করে 'অস্তিত্ব' ঐ অস্তিত্বশীলকে দান করা। যার ফলশ্রুতি হল, একটি অস্তিত্বশীলের জন্যে একাধিক অস্তিত্বের ধারণা। অথচ প্রত্যেক অস্তিত্বশীলই কেবলমাত্র একটি অস্তিত্বেরই অধিকারী। নতুবা তা একক অস্তিত্বশীল হতে পারে না ।

অপরদিকে প্রতিটি সৃষ্ট বিষয়ের অথবা ঐ শ্রেণীর সৃষ্ট বিষয়ের জন্যে একজন করে সৃষ্টিকর্তা থাকার অপরিহার্য অর্থ হল ঃ প্রত্যেক সৃষ্ট বিষয়ই স্বতন্ত্র

সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভরশীল এবং কেবলমাত্র চূড়ান্ত নির্ভরশীলতা, যা স্বীয় সৃষ্টিকর্তায় পৌঁছে, তা ব্যতীত অপর কোন সৃষ্ট বিষয়ের তার কোন প্রয়োজন নেই। আর এ ধরনের নির্ভরশীলতা শুধুমাত্র স্বীয় সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

অন্যকথায় ঃ বিশ্বের একাধিক সৃষ্টিকর্তা থাকার অপরিহার্য অর্থ হল একাধিক ও পরস্পরবিরোধী বিন্যাসব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকা। অথচ সৃষ্টির আদি থেকেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একক বিন্যাসব্যবস্থায় ও নিয়মানুবর্তিতায় পরিচালিত হচ্ছে। সমসাময়িক সৃষ্টিসমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল এবং তারা পরস্পরের উপর প্রভাব ফেলে। অনুরূপ পূর্ববর্তী সৃষ্টিসমূহের সাথে উত্তরবর্তী সৃষ্টিসমূহের যেমন সম্পর্ক বিদ্যমান, তেমনি বিদ্যমান সৃষ্টিসমূহের সাথেও ভাবি সৃষ্টিসমূহের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। আবার সকল পূর্ববর্তী সৃষ্টিসমূহই উত্তরবর্তী সৃষ্টিসমূহের আবির্ভাবের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

অতএব এ ধরনের কোন বিশ্ব, যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও সুসন্নিবেশিত এবং যা একক বিন্যাসব্যবস্থার অধীন পরিচালিত , তা কখনোই একাধিক অস্তিত্বদাতা কারণের ফলশ্রুতি হতে পারে না ।

অনুরূপ যদি ধারণা করা হয় যে, সকল প্রকার সৃষ্টির জন্যে একই সৃষ্টিকর্তা বিদ্যমান, কিন্তু তাদের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার দায়িত্ব অন্যান্যদের উপর ন্যস্ত, তবে তা-ও সঠিক হতে পারে না। কারণ সকল সৃষ্ট বিষয়ই, তার অস্তিত্বের জন্যে সার্বিকভাবে অস্তিত্বদাতা কারণের উপর নির্ভরশীল-অপর কোন স্বাধীন অস্তিত্বেরই, তার উপর কোন অধিকার বা প্রভাব নেই। তবে কেবলমাত্র ঐ সকল প্রভাবই বিদ্যমান যা কোন এক কারণের কার্যসমূহের (معلولات) মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। তদুপরি সকল কিছুই অস্তিত্বদাতা কর্তার প্রভাব বলয়ে এবং আধিপত্যের আওতায় অবস্থান করে এবং তাঁরই সুনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট অনুমতিক্রমে সকল কর্ম সম্পাদিত হয়। আর এ অবস্থায় বর্ণিত তত্ত্বাবধায়কদের কেউই প্রকৃত রাব্ব (رَبّ) হতে পারে না। কারণ রাব্বের (رَبّ) স্বরূপ হল স্বীয় আধিপত্যের আওতায় স্বাধীনভাবে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। যদি মনে করা হয় যে, এ ধরনের প্রভাব ও আধিপত্য স্বাধীন নয়; বরং সকলেই সৃষ্টিকর্তার প্রতিপালনের অধীন এবং যে ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক অর্পিত হয় সে ক্ষমতার

আলোকে কার্যসম্পাদন করে থাকে। তবে এ ধরনের কোন প্রভুত্ব ও তত্ত্বাবধানের ধারণা, প্রভুত্বের একত্ববাদের সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না। অনুরূপ যে সৃজনকর্ম আল্লাহর অনুমতিক্রমে সম্পাদিত হয় বলে মনে করা হয়, তা-ও সৃজনক্ষমতার একত্বের সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না। পবিত্র কোরান ও রেওয়ায়েতসমূহে এ ধরনের অনুচরিত ও পরাধীন সৃষ্টি ও তত্ত্বাবধানের কথা আল্লাহর কোন কোন বান্দাগণের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন ঃ হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে ঃ

و اذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا باذنى

–আর যখন তুমি কাদামাটি দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখীসদৃশ আকৃতি গঠন করতে এবং তাতে ফুৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে তা পাখী হয়ে যেত। (সূরা মায়িদাহ্ –১১০)

অনুরূপ আরও বলা হয় ঃ

فالمدبرات امرا

– শপথ তাদের যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে। (সূরা নাযিয়াত-৫)

উপসংহারে বলা যায়, বিশ্বের জন্যে একাধিক খোদার ধারণা, বস্তুগত কারণ ও সহায়ক কারণসমূহকে খোদার সাথে তুলনা করা থেকে রূপ লাভ করেছে এবং একক কার্যের জন্যে তাদের (কারণের) বহুত্বে কোন সমস্যা নেই। অপরদিকে অস্তিত্বদাতা কারণকে এ ধরনের কারণের সাদৃশ্য বলে কল্পনাই করা যায় না এবং কোন একক কার্যের জন্যই একাধিক অস্তিত্বদাতা কারণ বা প্রভু কিংবা স্বাধীন তত্ত্বাবধায়কের ধরণা করা যায় না।

অতএব এ ধরনের ভুল ধারণার অপসারণের জন্যে, একদিকে অস্তিত্বদাতা কারণের অর্থ ও এ ধরনের কারণত্বের বিশেষত্ব সম্পর্কে সূক্ষ্মদৃষ্টি দিতে হবে যাতে অবগত হওয়া যায় যে, কোন একক কার্যের জন্যে এক ধরনের কারণত্বের বহুত্ব অসম্ভব। অপরদিকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সুশৃংখল বিন্যাসব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে যাতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের সুশৃংখল বিন্যাসব্যবস্থা এশাধিক সৃষ্টিকর্তা অথবা এশাধিক স্বাধীন রাব্বের তত্ত্বাবধানে হতে পারে না।

প্রসংগক্রমে স্পষ্ট হয়েছে যে, মহান আল্লাহর কোন কোন বান্দার জন্যে সৃজন ক্ষমতা ও প্রতিপালনত্ব যদি স্বাধীন বা অনির্ভরশীল অর্থে না হয় তবে সুনির্ধারিত বিলায়াত একত্ববাদের সাথে কোন অসঙ্গতি সৃষ্টি করে না । যেমন ঃ মহানবী (সঃ) ও পবিত্র ইমামগণের (আঃ) বিধিগত বিলয়াত (الولاية التشريعية) মহান আল্লাহর বিধিগত বিলায়াতের সাথে কোন বিরোধ বা অসঙ্গতি সৃষ্টি করে না। কারণ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই তা অনুমোদিত হয়েছে।

পাঠ - ১৭

তাওহীদের অর্থ কী ?

- ভূমিকা
- বহুত্বের অস্বীকৃতি
- যৌগিকতার অস্বীকৃতি
- প্রভুসত্তার সাথে অতিরিক্ত গুণাবলী সংযোজনের অস্বীকৃতি
- ক্রিয়াগত একত্ববাদ
- স্বাধীন প্রভাব
- দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত
- একটি ভুল ধারণার অপনোদন

ভূমিকা ঃ

তাওহীদ (توحيد) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল 'অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করা' বা একত্ববাদ। দর্শন, কালাম, আখ্‌লাক ও ইরফান বিশেষজ্ঞগণের ভাষায় "তাওহীদ" শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এ অর্থগুলোতে খোদার একত্ববাদকে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো 'তাওহীদের প্রকারভেদ' অথবা 'তাওহীদের স্তরসমূহ' শিরোনামে স্মরণ করা হয়ে থাকে। তবে এগুলোর সবক'টি সম্পর্কে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

অতএব এখানে আমরা অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধতর ও সাযুজ্যতর পরিভাষাগুলোর আলোচনা করেই তুষ্ট থাকব।

১। বহুত্বের অস্বীকৃতি ঃ

তাওহীদের সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ পরিভাষাটি হল, খোদার একত্বে বিশ্বাস ও বহুত্বের অস্বীকৃতি। "তাওহীদ" প্রকাশ্য অংশীবাদের বিরুদ্ধে বা বিপরীতে অবস্থান নিয়ে থাকে। দুই বা ততোধিক স্বাধীন খোদার প্রতি বিশ্বাস এরূপে যে, তাদের একের প্রতি অপরের কোন নির্ভরশীলতা নেই এ অংশীবাদী বিশ্বাসকেও তাওহীদ অস্বীকার করে।

২। যৌগিকতার অস্বীকৃতি ঃ

তাওহীদের দ্বিতীয় পরিভাষাটি হল একত্বের বিশ্বাসার্থে সত্তার অবিভাজ্যতা বা প্রভুসত্তা, কার্যকরী ও সামর্থ্যগতভাবে অংশের সমষ্টি না হওয়া।

এ অর্থকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে না-বোধক গুণ বা সিফাতুস্‌সালবিয়াহ্ (যৌগিকতার অস্বীকৃতি) রূপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে (যেমনটি দশম পাঠে আলোচনা করা হয়েছে)। কারণ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যৌগের ধারণা সম্পর্কে এবং প্রাসংগিকভাবে তার অস্বীকৃতির সাথে, অবিভাজ্যতার তাৎপর্য অপেক্ষা অধিকতর পরিচিত ।

৩। প্রভুসত্তার সাথে অতিরিক্ত গুণাবলী সংযোজনের অস্বীকৃতি ঃ

তাওহীদের তৃতীয় পরিভাষাটি প্রভুসত্তার সাথে তাঁর গুণসমূহের একাত্মতা এবং সত্তার সাথে অতিরিক্ত বা অর্জিত গুণাবলী সংযোজনের অস্বীকৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে-যাকে গুণগত একত্ব বলা হয়। তবে রেওয়ায়েতের ভাষায় একে 'গুণাবলীর পরিবর্জন' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তাওহীদের এ পরিভাষাটি, যারা (যেমন ঃ আশায়েরী সম্প্রদায়) খোদার গুণাবলীকে তাঁর সত্তাবহির্ভূত অতিরিক্ত বিষয় বলে মনে করেন এবং যারা 'অষ্টপ্রাচীনত্বের' প্রবক্তা, তাদের বিপরীতে অবস্থান নেয়।

গুণগত একত্ববাদের স্বপক্ষে যুক্তি হল ঃ যদি আল্লাহর প্রতিটি গুণই স্বতন্ত্র দৃষ্টান্তের (مصداق) অধিকারী হয়, তবে তা নিম্নলিখিত কয়েকটি অবস্থার ব্যতিক্রম নয় ঃ

হয় ঐ গুণগুলোর দৃষ্টান্ত প্রভুসত্তার অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হবে, যার অপরিহার্য অর্থ হবে, প্রভুসত্তা হল এশাধিক অংশের সমষ্টি এবং ইতিপূর্বে আমরা প্রমাণ করেছি যে, এ ধরণের কোন কিছু অসম্ভব অথবা ঐ গুণগুলোর দৃষ্টান্ত সত্তাবহির্ভূত বলে বিবেচিত হয় এবং এ অবস্থায়, হয় 'অনিবার্য অস্তিত্ব' ও 'সৃষ্টিকর্তার উপর অনির্ভরশীল' বলে পরিগণিত হবে অথবা 'সম্ভাব্য অস্তিত্ব' ও 'সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভরশীল' বলে পরিগণিত হবে।

কিন্তু গুণগুলোর অনিবার্য অস্তিত্ব হওয়ার অর্থ হবে, সত্তার একাধিকত্ব ও সুস্পষ্ট অংশীবাদ এবং কোন মুসলমানই এর দায়িত্ব গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না। অপরদিকে গুণগুলোর 'সম্ভাব্য অস্তিত্ব' হওয়ার অপরিহার্য অর্থ হল 'প্রভুসত্তা' ঐ গুণগুলোর ঘাটতিতে থাকার ফলে ঐগুলোকে সৃষ্টি করতঃ সংশ্লিষ্ট গুণসমূহে গুণান্বিত হয়েছেন। যেমন ঃ যদিও মহান আল্লাহ্ জীবনহীন তথাপি জীবন নামক এক অস্তিত্বকে সৃষ্টি করেন এবং তার মাধ্যমেই জীবন লাভ করেন। অনুরূপ জ্ঞান, ক্ষামতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একই ধারণা রূপ পরিগ্রহ করে। অথচ 'অস্তিত্বদাতা কারণ' সত্তাগতভাবে সৃষ্ট বিষয়ের পূর্ণতাসমূহের ঘাটতিতে থাকবে, এটা অসম্ভব।

সর্বাপেক্ষা লজ্জাজনক ব্যাপার হল এটা যে, স্বীয় সৃষ্ট বিষয়সমূহের

ছায়ায় জীবন, জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়া এবং অন্যান্য উৎকর্ষ গুণে গুণান্বিত হওয়া।

উপরোক্ত ধারণাগুলোর বর্জনের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, প্রভুর গুণসমূহ প্রভুসত্তা ভিন্ন, পরস্পর স্বতন্ত্র অন্য কোন দৃষ্টান্তের (مصداق) অধিকারী নয়। বরং তাদের সকলেই এমন এক ভাবার্থ যে, (শুধুমাত্র) বুদ্ধিবৃত্তিই, প্রভুর একক, অবিভাজ্য, পবিত্র সত্তা থেকে পৃথকরূপে উপস্থাপন করে থাকে (কিন্তু বাস্তব জগতে তাদেরকে আলাদা করে ভাবা অসম্ভব)।

৪। ক্রিয়াগত একত্ববাদ ঃ

তাওহীদের চতুর্থ পরিভাষাটি, দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদগণের নিকট ক্রিয়াগত একত্ববাদ বলে পরিচিত। আর এর অর্থ হল ঃ মহান আল্লাহ স্বীয় কর্ম সম্পাদনের জন্যে কারো উপর ও কোন কিছুর উপরই নির্ভরশীল নন এবং তিনি কোন ভাবেই কোন অস্তিত্বের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন।

এ বিষয়টি ' অস্তিত্বদাতা কারণের' বিশেষত্বের আলোকে প্রমাণ করা যায়, যা সকল কার্যের (معلول) প্রতিষ্ঠাতা। কেননা এ ধরনের কারণের (অস্তিত্বদাতা কারণ) কার্যগুলো সমস্ত অস্তিত্বের জন্যে উক্ত কারণের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ দর্শনের ভাষায়, এ কার্যগুলো খোদার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত' এবং ঐ গুলোর কোন প্রকার স্বনির্ভরতা নেই ।

অন্যকথায় ঃ যে কেউ যা কিছুরই অধিকারী হোক না কেন, তা তাঁরই নিকট থেকে এবং তাঁরই ক্ষমতার অধীন। তাঁরই রাজত্বের পরিমণ্ডলে, তাঁরই সুনির্ধারিত ও প্রকৃত মালিকানাধীন। অন্য সবার ক্ষমতা ও মালিকানা তাঁর ক্ষমতা ও মালিকানার উলম্বে ও নিম্নস্তরে অবস্থান করে এবং তারা খোদার ক্ষমতার পথে কোন প্রকার ক্লেশ সৃষ্টি করে না। যেমন ঃ বান্দা উপার্জিত সম্পদের উপর যে বৈধ মালিকানা লাভ করে তা প্রভুর বৈধ মালিকানার উলম্বে অবস্থান করে।

العبد و ما في يده كان لمولاه

'বান্দা ও যা কিছু তার নিকট আছে , সকলই প্রভুর জন্যে'

অতএব মহান আল্লাহ এমন কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবেন, যারা

তাদের সমগ্র অস্তিত্বের জন্যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তা কীরূপে সম্ভব ?

৫। স্বাধীন প্রভাব ঃ

তাওহীদের পঞ্চম পরিভাষাটি হল 'স্বাধীন প্রভাব'[১] অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্ট বিষয়াদি স্বীয় কর্মের ক্ষেত্রেও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল। সৃষ্ট বিষয়াদির পরস্পরের মধ্যে যে প্রভাব ও কর্মতৎপরতা বিদ্যমান, তা আল্লাহরই অনুমতিক্রমে, আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতায় সম্পন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র যিনি অনির্ভরশীল ও স্বাধীনভাবে সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় এবং সকল কিছুর উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম, তিনি হলেন পবিত্র সত্তার অধিকারী মহান আল্লাহ। সকল কর্মতৎপরতা ও প্রভাব তাঁর কর্মতৎপরতা ও প্রভাবের উলমে অবস্থান করে এবং তাঁরই প্রভাবের প্রতিফলনে স্বীয় কর্মসম্পাদন করে।

আর এর ভিত্তিতেই পবিত্র কোরান প্রাকৃতিক নির্বাহকসমূহ এবং অপ্রাকৃতিক নির্বাহকসমূহের (যেমন ঃ ফেরেস্তা, জীন ও মানুষ) সকল কীর্তিকে খোদার প্রতি আরোপ করে থাকে । যেমন ঃ বৃষ্টি বর্ষণ, বৃক্ষের উদ্‌গমন ও ফলদান ইত্যাদি খোদায়ী কীর্তি বলে আখ্যায়িত হয়। এ জন্যে সুপারিশ করা হয় যে, মানুষ যেন এ খোদায়ী কীর্তিকে খোদার উলমে নিকটবর্তী যে নির্বাহিকসমূহ বিদ্যমান সে গুলোতে উপলব্ধি ও স্বীকার করে এবং সর্বদা এ সম্পর্কে চিন্তা করে।

অনুধাবনের জন্যে দৈনন্দিন জীবন থেকে একটি উদাহরণ উল্লেখ করব ঃ যদি কোন কার্যালয়ের প্রধান কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে কোন কর্ম সম্পাদনের জন্যে আদেশ প্রদান করে, তবে কর্মটি আদিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত হলেও উচ্চ পর্যায়ে এর দায়-দায়িত্ব ঐ কার্যালয়ের প্রধানের উপরই বর্তায়। এমনকি জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

সুনির্ধারিত কর্তৃত্বের (فاعليت التكوينى) ক্ষেত্রেও পর্যায়ক্রম বিদ্যমান। 'সকল নির্বাহকের অস্তিত্বই মহান আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল', এ দৃষ্টিকোণ থেকে তা মস্তিষ্কগত কল্পিত বিষয়ের মতই, যা কল্পনাকারীর উপর নির্ভরশীল।

১। আরেফগণ ক্রিয়াগত একত্ববাদকে এ অর্থে ব্যবহার করে থাকেন ।

وﷲ المثل الأعلى

ফলে যে কোন কর্ম, যে কোন কর্তার মাধ্যমেই সম্পন্ন হোক না কেন, উচ্চতর পর্যায়ে তা মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে, তাঁরই সুনির্ধারিত ইচ্ছায় (الارادة التكوينية) সম্পাদিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

ولا حول ولا قوت إلا بالله العلى العظيم

দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঃ

ক্রিয়াগত একত্ববাদের মোদ্দাকথা হল, 'মানুষ মহান আল্লাহ ব্যতীত কাউকে এবং কোন কিছুকেই উপাসনার জন্যে যোগ্য বলে মনে করবে না'। কারণ ইতিপূর্বে যেমনটি আমরা ইঙ্গিত করেছিলাম যে, বান্দার নিকট তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা ব্যতীত কেউই উপাসনার যোগ্য হতে পারে না। অন্যকথায় ঃ প্রভুত্ব হল সৃজন ও পালন কর্তৃত্বের অবিয়োজ্য ভাষ্য ।

অপরদিকে তাওহীদের শেষোক্ত অর্থটি (স্বাধীন প্রভাব) থেকে প্রাপ্ত উপসংহারটি হল ঃ মহান আল্লাহর উপর মানুষের পূর্ণ আস্থা থাকা, সকল কর্মের জন্যেই তাঁর উপর নির্ভর করা ও একমাত্র তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, একমাত্র তাঁরই নিকট আশা করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় না করা; এমন কি প্রত্যাশা ও চাহিদাসমূহ পূরণের স্বাভাবিক ক্ষেত্রসমূহ প্রস্তুত না থাকলেও নিরাশ না হওয়া। কারণ মহান আল্লাহ স্বাভাবিক পথ ভিন্ন অন্য কোন পথেও তাঁর বান্দার চাহিদা ও প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম।

আর (উপরোক্ত অর্থদ্বয়ের অনুসারী) এমন কোন মানুষই প্রভুর বিশেষ অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত এবং অভূতপূর্ব মানসিক ও আত্মিক তুষ্টিতে পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী হয়ে থাকেন।

الا انّ اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون

– জেনে রাখ ! আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা ইউনুস - ৬২)

উপরোক্ত সিদ্ধান্তদ্বয় নিম্নলিখিত আয়াতশরীফে সন্নিহিত রয়েছে –যে আয়াতটি প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যহ কমপক্ষে দশবার আবৃতি করে থাকে।

اِيَّاكَ نعبد و اِيَّاكَ نستعين

(প্রভু হে !) আমরা আপনারই উপাসনা করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি । (সূরা ফাতিহা- ৫)

একটি ভুল ধারণার অপনোদন ঃ

এখানে সম্ভবতঃ একটি ভুল ধারণার অবকাশ থাকতে পারে। যথা ঃ যদি পরিপূর্ণ তাওহীদের দাবি এটা হয়ে থাকে যে, মানুষ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে না। তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দা ও ওলীগণের توسّل করা বা শরণাপন্ন হওয়াও সঠিক হতে পারে না।

প্রতিউত্তরে বলতে হয় ঃ আল্লাহর ওলীগণের শরণাপন্ন হওয়া যদি এ অর্থে হয় যে, তাঁরা স্বাধীনভাবে ও আল্লাহর অনুমোদন ব্যতীতই শরণার্থীর কোন কর্ম সম্পাদন করবেন, তবে এ ধরনের তাওয়াস্সুল তাওহীদের সাযুজ্য হতে পারে না। কিন্তু যদি এ অর্থে হয় যে, মহান আল্লাহ্ ওলীগণকে স্বীয় অনুগ্রহের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য মাধ্যম হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন এবং মানুষকেও তাঁদের শরণাপন্ন হওয়ার জন্যে আদেশ দিয়েছেন, তবে এ ধরনের তাওয়াস্সুল একত্ববাদের সাথে কোন বিরোধ তো সৃষ্টি করেই না, বরং উপাসনা ও আজ্ঞাবহতার ক্ষেত্রে একত্ববাদের মর্যাদায় পরিগণিত হবে। কারণ তাঁরই (আল্লাহর) আদেশে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

কিন্তু কেন মহান আল্লাহ্ এ ধরনের মাধ্যমসমূহকে স্থান দিয়েছেন এবং কেনইবা মানব সম্প্রদায়কে তাঁদের শরণাপন্ন হতে বলেছেন ? এর উত্তরে বলা যায় যে, এ ঐশ্বরিক বিষয়টির পশ্চাতে একাধিক উদ্দেশ্য লুক্বায়িত। এগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ আল্লাহর উপযুক্ত বান্দাগণের উচ্চ মর্যাদার পরিচয় প্রদান, উপাসনা ও আনুগত্যের পথে অন্যদেরকে উৎসাহ প্রদান -যা তাঁদের এ সম্মানিত স্থানে পৌঁছার কারণ মানুষকে তাদের ইবাদত ও আনুগত্যের জন্যে অহংকার করা থেকে বিরত রাখা এবং যারা নিজেদেরকে সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী ও পূর্ণতম মানব হিসেবে মনে করেন তাদেরকে সে ভ্রান্তি থেকে মুক্তি প্রদান। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, সর্বশেষে

বর্ণিত ব্যাপারটি যারা আহলে বাইতগণের (আঃ) বিলায়াতকে অস্বীকার করে এবং যারা তাঁদের শরণাপন্ন হওয়া থেকে বঞ্চিত, তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে ।

পাঠ - ১৮

জাব্‌র ও এখতিয়ার

- ভূমিকা
- এখতিয়ারের ব্যাখ্যা
- জাব্‌রবাদীদের ভ্রান্ত ধারণার জবাব

ভূমিকা ঃ

যেমনটি পূর্ববর্তী পাঠসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'স্বাধীন কীর্তিতে তাওহীদ' হল একটি অমূল্য শিক্ষা, যা মানুষের আত্মপরিশুদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এ জন্যেই পবিত্র কোরানে এ বিষয়টির উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে তার সঠিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন ঃ সকল বিষয়কে প্রভুর অনুমোদন, ইচ্ছা, ক্বাজা ও ক্বাদারের সাথে সম্পর্কিত বলে বিশ্বাস করা ।

তবে এ বিষয়টির সঠিক অনুধাবনের জন্যে একদিকে যেমন ঃ বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত বিকাশের প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি সঠিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষার প্রয়োজন। যারা যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ঘাটতিতে আছেন অথবা কোরানের প্রকৃত ব্যাখ্যাকারী ও পবিত্র পথপ্রদর্শকগণের শিক্ষা-দীক্ষা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছেন, তারা নিজেদেরকে বিচ্যুতি ও ভ্রান্তির পথে ঠেলে দিয়েছেন। তারা এ বিষয়টিকে, যে কোন প্রকারের প্রভাব ও কারণত্ব একান্তই মহান আল্লাহ থেকে –এ অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং কোরানের সুস্পষ্ট আয়াতের ব্যতিক্রমে যে কোন প্রকার প্রভাব ও কারণত্বকে মাধ্যম ও (উলম্বিক) কারণসমূহ থেকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের মতে আল্লাহর প্রকৃতি এরূপ যে, তিনি আগুনের উপস্থিতিতে তাপ সৃষ্টি করেন অথবা আহার গ্রহণ ও পানি পানের সময় ক্ষুধা নিবারণ ও তৃপ্তিকে অস্তিত্বে আনেন, নতুবা তাপ, ক্ষুধা নিবারণ ও তৃপ্তির জন্যে আগুন, আহার ও পানির কোন ভূমিকা নেই।

এ চিন্তাগত বিচ্যুতির কুফলগুলোকে আমরা মানুষের স্বাধীন কর্মকাণ্ড ও তার দায়িত্ব সম্পকির্ত বিষয়ের আলোচনায় স্থান দিব। অর্থাৎ এ ধরনের চিন্তার ফল হল ঃ মানুষের কর্মকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে মহান আল্লাহর উপর বর্তায় এবং ঐ সকল কর্মকান্ডের ব্যাপারে মানুষের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হয়। ফলে কেউই তার কর্মের জন্যে দায়ী হবে না।

অন্যকথায় ঃ এ ধরনের বক্রচিন্তার একটি ধ্বংসাত্মক প্রভাব হল, জাব্‌রিয়াত ও মানুষের কর্তব্যপরায়ণতার অস্বীকৃতি তথা মানুষের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বের অস্বীকৃতি, নিস্ফলতা এবং মানসিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যা তথা ইসলামী বিধি-ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা। কারণ যেখানে মানুষ তার

কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে স্বাধীন নির্বাচনের অধিকার রাখে না, সেখানে দায়িত্ব, কর্তব্য, আদেশ-নিষেধ এবং পুরস্কার-তিরস্কারের কোন প্রশ্নই আসে না। বরং সুনির্ধারিত বিন্যাস ব্যবস্থার নিরর্থকতা ও অসারতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ পবিত্র আয়াত,[১] রেওয়ায়াত ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে যা পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে বলা যায়, এ বিশ্বপ্রকৃতিকে সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, মানব সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, যাতে মনুষ্যসম্প্রদায় স্বীয় নির্বাচন ক্ষমতার মাধ্যমে সুকর্ম সম্পাদন, উপাসনা ও আনুগত্যের মাধ্যমে উৎকর্ষের সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করতঃ মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হয় এবং মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ লাভের জন্যে উপযুক্ত হয়। যদি মানুষের স্বীয় কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে নির্বাচনাধিকার না থাকে এবং কোন দায়িত্বও না থাকে তবে পুরস্কার, অনন্ত অনুগ্রহ ও প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যে তার কোন উপযুক্ততাও থাকবে না। ফলে সৃষ্টির উদ্দেশ্যও ব্যাহত হবে। এবং সৃষ্টি জগৎ নিশীথের নাট্যশালায় পর্যবশিত হবে, যেন মানুষ আপন হাতে মূর্তি গড়ল ও অন্যের ইচ্ছাধীন তাদের মধ্যে গতির সঞ্চার হল, অতঃপর কেউ কেউ পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হল, কেউবা আবার তিরস্কৃত ও শাস্তি প্রাপ্ত হল !

এ ভয়ংকর অপচিন্তার প্রচার ও প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অভিলাষ। কারণ এর মাধ্যমে তারা তাদের আপন কুকর্মের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছে এবং নিরীহ ও অসচেতন জনগোষ্ঠীকে নিজেদের দুঃশাসন ও নেতৃত্বের আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য করতে পেরেছে; একইসাথে সক্ষম হয়েছে যে কোন প্রকার প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও আন্দোলন থেকে জনগণকে দূরে রাখতে। সত্যিকার অর্থে জাতিসমূহের অজ্ঞতা ও অসচেতনতার জন্যে জাব্‌রিয়াতকেই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে গণনা করা উচিৎ।

অপরদিকে যারা কিছুটা হলেও এ বক্রচিন্তার দুর্বলতাগুলোকে অনুধাবন করতে পেরেছেন, কিন্তু না তারা পরিপূর্ণ তাওহীদ ও জাবরের অস্বীকৃতির মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়েছেন, না তারা পবিত্র ও নিষ্পাপ আহলে বাইতগণের (আঃ) জ্ঞানভাণ্ডার থেকে লাভবান হতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তারা সমর্পণবাদে (تفويض) বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং মানুষের নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডকে মহান আল্লাহর প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত বলে মনে করেছেন । প্রকৃতপক্ষে তারাও অন্য

১। সূরা হুদ-৭, সূরা মূলক-২, সূরা কাহাফ-৭, সূরা যারিয়াত-৫৬, সূরা তরবাহ-৭২।

এক প্রকার বিচ্যুতি ও বক্রচিন্তার জালে আটকা পড়েছেন এবং ইসলামের মহামহিম শিক্ষা-দীক্ষা ও তার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

কিন্তু যারা এর স্বরূপ অনুধাবনে সক্ষম হয়েছেন এবং একই সাথে কোরানের প্রকৃত ব্যাখ্যাকারী ও শিক্ষকগণকে শনাক্ত করতে পেরেছেন, তারা এ বক্রচিন্তা থেকে পবিত্র থেকেছেন। তারা একদিকে যেমন স্বীয় নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডকে প্রভু প্রদত্ত ক্ষমতার আলোকে সম্পন্ন হয় বলে মনে করেছেন ও এতদসংশ্লিষ্ট সকল দায়-দায়িত্বকে গ্রহণ করেছেন, অপরদিকে তেমনি প্রভুর মহিমান্বিত স্বাধীন কীর্তিসমূহকে উচ্চ পর্যায়ে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। যার ফলশ্রুতিতে এ অমূল্য পরিচিতির স্বরূপকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর পবিত্র আহলে বাইতগণের (আঃ) নিকট থেকে যে রেওয়ায়েত আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তাতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনার সন্ধান মিলে, যেগুলো ক্ষমতা (استطاعت), জাবরের অস্বীকৃতি (نفی الجبر), সমর্পণবাদ (تفويض) ইত্যাদি শিরোনামে এবং অনুমতি (اذن), ইচ্ছা (مشیت و اراده), আল্লাহর ক্বাজা ও ক্বদর ইত্যাদির অর্ন্তভূক্ত হয়ে হাদীস শরীফে সংরক্ষিত আছে। অনুরূপ এমনও হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, অক্ষম ব্যক্তিরা যেন এ সূক্ষ্ম বিষয়টি নিয়ে মাথা না ঘামায়। কারণ এতে তারা বিচ্যুত ও পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে।

যাহোক জাব্র ও এখ্তিয়ারের আলোচনার বিভিন্ন দিক রয়েছে, যার সবগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে সেগুলির কোন কোন দিকের উপর সরল ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করব। অনুরূপ যারা এ বিষয়ের উপর অধিকতর গবেষণায় আগ্রহী, তাদেরকে পরামর্শ দিব যাতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপর জ্ঞানার্জনের জন্যে যথেষ্ট ধৈর্য ও স্থৈর্য অর্জন করেন।

এখতিয়ারের ব্যাখ্যা ঃ

সিদ্ধান্ত নেয়ার ও নির্বাচনের ক্ষমতা মানুষের পরিচিতির ক্ষেত্রে একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় বলে পরিগণিত। কারণ প্রত্যেকেই নির্ভূল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে স্বীয় অভ্যন্তরে একে খুঁজে পায়; যেমনিকরে অন্যান্য মানসিক অবস্থা

সম্পর্কে এ জ্ঞানের মাধ্যমে অবগত হয়। এমনকি যখন কোন ব্যাপারে কেউ সন্দেহ করে তখন ঐ সন্দেহের উপস্থিতিকেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে অনুধাবন করে থাকে এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে নিজের মধ্যে স্থান দিতে পারে না ।

অনুরূপ যে কেউ স্বীয় অভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিলেই অনুধাবন করতে পারে যে, কোন কথা বলবে ? না, বলবে না ? হাত নাড়বে ? না, নাড়বে না? আহার গ্রহণ করবে? না, করবে না? ইত্যাদি।

কোন কাজের সিদ্ধান্ত কখনো কখনো প্রবৃত্তিগত পাশবিক চাহিদার উপর ভিত্তি করে নেয়া হয়। যেমন ঃ ক্ষুধার্থ আহার গ্রহণের ইচ্ছা করে, তৃষ্ণার্ত পানি পানের ইচ্ছা করে ইত্যাদি। আবার কখনো কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদাকে তুষ্ট করার জন্যে এবং সুউচ্চ মানবিক মূল্যবোধকে বাস্তবায়নের জন্যে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যেমন ঃ কোন অসুস্থ স্বীয় রোগ নিরাময়ের জন্যে তিক্ত ঔষধ সেবন করে এবং লোভনীয় খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রাখে অথবা কোন বিদ্যা অর্জনকারী জ্ঞানার্জন ও সত্য উদঘাটনের পথে স্বীয় বস্তুগত কামনা থেকে নিজেকে দূরে রাখে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের মাঝে নিজেকে মুহ্যমান রাখে অথবা আত্মোৎসর্গকারী সৈনিক মর্যাদাপূর্ণ মূল্যবোধে পৌঁছার জন্যে এমনকি আপন প্রিয় জীবনকে পর্যন্ত উৎসর্গ করে।

প্রকৃতপক্ষে মানবিক মূল্যবোধের প্রকাশ তখনই ঘটে যখন বিভিন্ন প্রকারের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং ব্যক্তি চারিত্রিক প্রকৃষ্টতা, আত্মিক উৎকর্ষ, আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে স্বীয় কুপ্রবৃত্তি ও পাশবিক কামনা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। যতোধিক কোন মানুষ স্বাধীনভাবে ও সচেতনভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে কোন কর্ম সম্পাদন করবে, আত্মিক ও মানবিক উৎকর্ষ বা পশ্চাৎপদতার ক্ষেত্রে ততোধিক প্রভাব থাকবে এবং পরকালীন পুরস্কার বা শাস্তির জন্যে উপযুক্ততর হবে।

তবে পাশবিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ক্ষমতা সকল মানুষের মধ্যে সব বিষয়ে একরকম নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষই কম-বেশী এ আল্লাহ প্রদত্ত বৈভব (স্বাধীন নির্বাচনাধিকার) থেকে লাভবান হতে পারে এবং (প্রতিরোধের জন্যে) যতবেশী অনুশীলন করবে প্রতিরোধ ক্ষমতা ততবেশী

দৃঢ়তর হবে ।

অতএব স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতার অস্তিত্ব সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন সুযোগ নেই এবং এ বিবেকপ্রসূত ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ, দ্বিধার মাধ্যমে মস্তিষ্ককে সন্ধিগ্ধ করে ফেলা অনুচিৎ। যেমনটি আমরা ইঙ্গিত করেছিলাম যে, স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা একটি স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি হিসেবে সকল চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যার প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন ধর্মে এবং ঐশী বিধানে গৃহীত হয়েছে। এ মূলনীতি ব্যতিরেকে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য, প্রশংসা বা ভর্ৎসনা, শাস্তি বা পুরস্কারের কোন স্থান নেই ।

তবে যা এ স্বতঃসিদ্ধ সত্য থেকে বিচ্যুতির ও জাব্‌রিয়াতের কারণ হয়েছে, তা কতগুলো ভ্রান্ত ধারণা বৈ কিছুই নয়। ফলে এ গুলোর জবাব দিতে হবে, যাতে কোন প্রকার কুমন্ত্রণা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সুযোগ না থাকে । আর তাই এখানে আমরা অতিশয় ভ্রান্ত ধারণাগুলোর অপনোদনে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মনোনিবেশ করব।

জাব্‌রবাদীদের ভ্রান্ত ধারণার জবাব ঃ

জাবরবাদীদের গুরুতর ভুলধারণাগুলো ও ঐগুলোর জাবাব নিম্নে বর্ণনা করা হল ঃ

১। মানুষের ইচ্ছা, অভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তি বা কামনা জাগরণের মাধ্যমে রূপ পরিগ্রহ করে। আর এ ধরনের কামনা, একদিকে যেমন মানুষের নির্বাচনের ক্ষমতাধীন নয়, অপরদিকে তেমনি কোন বাহ্যিক কারণের প্রভাবেও আন্দোলিত হয় না। অতএব স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতার কোন স্থান থাকতে পারে না।

জবাব ঃ আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তির জাগরণ, স্বাধীন নির্বাচন ও সিদ্ধান্তের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করে -কোন কাজের সিদ্ধান্ত দেয় না, যার ফলে আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তির জাগরণের মাধ্যমে প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে বাধ্যতামূলক কোন ফলে উপনীত হবে। এর প্রমাণ এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয় এবং ঐ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে চিন্তা-ভাবনা ও ঐ কর্মের লাভ-লোকসানকে বিবেচনা করতে হয় এবং কখনো কখনো তা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

২। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায়, উত্তরাধিকার, গ্রন্থিরক্ষরণ, তদোনুরূপ পারিপার্শিক ও সামাজিক অবস্থাও মানুষের কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে এবং তাদের পারস্পরিক আচার-ব্যবহারের বৈসাদৃশ্যও এ কারণগুলোর বৈসাদৃশ্যের ফলে রূপ পরিগ্রহ করে। যেমনটি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও মোটামুটি অনুমোদন পেয়েছে। অতএব মানুষের কীর্তি-কর্ম তার স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা থেকে পরিগৃহীত -এ কথা বলা যায় না।

জবাব ঃ এখতিয়ার ও স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার করার অর্থ এ নয় যে, উল্লেখিত কারণগুলোর প্রভাবকে অস্বীকার করা। বরং এর অর্থ এই যে, এ কারণগুলোর অস্তিত্ব থাকলেও মানুষ এগুলোকে প্রতিরোধ করতে পারে এবং যখন একাধিক প্রবৃত্তি বা কামনার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তখন সে তাদের একটিকে নির্বাচন করতে সক্ষম।

তবে এ কারণগুলোর কোন কোনটির তীব্রতা, কখনো কখনো ঐগুলোর ব্যতিক্রমী কোন কর্মের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। কিন্তু এ ধরনের প্রতিরোধ ও নির্বাচন, বিনিময়ে উৎকর্ষ ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে অধিকতর প্রভাব ফেলে এবং পুরস্কারের জন্যে তার উপযুক্ততাকে অধিকতর করে থাকে, যেমন ঃ নিদারুন উৎকণ্ঠা ও অন্যান্য কঠিন অবস্থা, অপরাধ ও শাস্তি লাঘবের কারণ হয়ে থাকে।

৩। জাব্‌রবাদীদের অপর একটি ভুল ধারণা হল ঃ মহান আল্লাহ বিশ্বের সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা সম্পর্কে উদাহরণতঃ মানুষের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে, তা ঘটার পূবেই অবগত আছেন এবং প্রভুর জ্ঞান হল ভুল-ভ্রান্তি বিবর্জিত। সুতরাং সংগত কারণেই সকল ঘটনা মহান আল্লাহর অনাদি জ্ঞানানুসারেই ঘটে থাকবে যার ব্যতিক্রম করা অসম্ভব। অতএব স্বাধীন নির্বাচনের কোন সুযোগ নেই।

জবাব ঃ সকল ঘটনা যেরূপেই ঘটুক না কেন, প্রভুর জ্ঞান সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং মানুষ কর্তৃক স্বাধীনভাবে নির্বাচিত কর্মকাণ্ডগুলোও স্বাধীনত্বের বৈশিষ্ট্যসহ মহান আল্লাহর অবগতির আওতায় অবস্থান করে। অতএব যদি জাব্‌রিয়াতের বৈশিষ্ট্য সহকারে কোন ঘটনা ঘটে, তবে তা খোদার জ্ঞান বহির্ভূত ঘটনা হিসেবে পরিগণিত হবে। যেমন ঃ মহান

আল্লাহ অবগত আছেন যে, কোন বিশেষ শর্তাধীন, কোন বিশেষ ব্যক্তি কোন কর্ম সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নিবে এবং তা সম্পন্ন করবে। এরূপ নয় যে, আল্লাহর জ্ঞান, স্বাধীন নির্বাচন ও ইচ্ছার সাথে উক্ত কর্মের সম্পর্ককে অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র ঘটনাটি ঘটা সম্পর্কেই অবগত। অতএব আল্লাহর অনাদি জ্ঞান, ইচ্ছা ও স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতার সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না।

জাব্‌রবাদীদের অপর একটি ভ্রান্ত ধারণা, ক্বাজা ও ক্বাদার সংশ্লিষ্ট যা তাদের মতে মানুষের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমরা পরবর্তী পাঠে এ বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব।

পাঠ - ১৯

ক্বাযা ও ক্বাদার

- ক্বাযা ও ক্বাদারের তাৎপর্য
- তাত্ত্বিক এবং প্রত্যক্ষ ক্বাযা ও ক্বাদার
- মানুষের এখ্তিয়ারের সাথে ক্বাযা ও ক্বাদারের সম্পর্ক
- একাধিক কারণের প্রভাব
- ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন
- ক্বাযা ও ক্বাদারের প্রতি বিশ্বাসের সুফল

ক্বাযা ও ক্বাদরের তাৎপর্য ঃ

ক্বাদার (قدر) শব্দটির অর্থ হল 'পরিমাপ' এবং তাক্বদির (تقدير) শব্দটির অর্থ হল 'পরিমাপন বা কোন কিছুকে নির্দিষ্ট পরিমাপে তৈরী করা' আর ক্বাযা (قضاء) শব্দটি 'চূড়ান্তভাবে সম্পন্নকরণ বা কর্ম সম্পাদন' (বুদ্ধিমত্তাগত প্রকারান্তরে) বা 'মীমাংসা' ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো এ দুটি শব্দ সমার্থবোধক শব্দরূপে 'ভাগ্যলিপি' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রভু কর্তৃক পরিমাপন অর্থ হল; মহান আল্লাহ সকল কিছুর জন্যেই সংখ্যাগত ও গুণগত স্থান, কাল ও পাত্রগত পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, যা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কারণ ও নির্বাহকের প্রভাবে বাস্তব রূপ লাভ করে থাকে। আর প্রভু কর্তৃক চূড়ান্তভাবে সম্পন্নকরণ বা মীমাংসার অর্থ হল এই যে, কোন ঘটনার ক্ষেত্র ও কারণ, ভূমিকাসমূহের উপযুক্ত যোগানের পর, মহান আল্লাহ ঐ ঘটনাকে নিশ্চিত ও চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করেন '

উপরোক্ত ব্যাখ্যানুসারে, তাক্বদিরের স্তর হল ক্বাযার পূর্বে, যার কয়েকটি পর্যায় বিদ্যমান। এ 'তাক্বদির' দূরবর্তী প্রারম্ভিকা (مقدمة البعيد) মধ্যবর্তী প্রারম্ভিকা (مقدمة المتوسط) ও নিকটবর্তী প্রারম্ভিকার (مقدّمة القريب) সমন্বয়ে রূপ পরিগ্রহ করে এবং কোন কোন শর্ত বা কারণের পরিবর্তনে পরিবর্তিত রূপ লাভ করে। যেমন ঃ ভ্রূণের দশাগুলো হল, যথাক্রমে শুক্রাণু (نطفه) জমাট রক্ত (علقه) মাংসপিণ্ড (مضغه) থেকে পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণে রূপান্তর। এ দশাগুলোই হল ভ্রূণের তাক্বদির, যা নির্দিষ্ট স্থান ও কালকেও সমন্বিত করে এবং এ পর্যায়গুলোর কোন একটির অনুপস্থিতি তার তাক্বদিরের পরিবর্তন বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু ক্বাযা হল একদশা বিশিষ্ট (دفعى) এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার শর্ত ও কারণের উপস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত –যা সুনিশ্চিত ও অলংঘনীয়।

اذا قضى امراً فانّما يقول له كن فيكون

তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন শুধু বলেন 'হও' এবং তা হয়ে যায় (সূরা আল্ ইমরান–৪৭) * ।

---

* এ ছাড়া নিম্নলিখিত আয়াতগুলোও দ্রষ্টব্য ঃ সূরা বাক্বারা–১১৭, সূরা মারিয়াম–৩৫, সূরা গাফির– ৬৮।

কিন্তু ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কখনো কখনো ক্বাযা ও ক্বাদার সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে তা 'সুনিশ্চিত ও অনিশ্চিত' এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। অপরদিকে সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত হয় বলেই কোন কোন রেওয়ায়েত ও দোয়ায় 'ক্বাযাকে' পরিবর্তনশীল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ সাদ্‌কাহ্‌, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা এবং দোয়া করা ইত্যাদি ক্বাযার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে বলে বর্ণিত হয়েছে।

তাত্ত্বিক এবং প্রত্যক্ষ ক্বাযা ও ক্বাদার ঃ

কখনো কখনো ঐশী 'তাক্বদির ও ক্বাজা' কথাটি, ঘটনা সংঘটনের প্রারম্ভিকা, কারণ ও শর্তের যোগান সম্পর্কে, তদনুরূপ তার সুনিশ্চিত সংঘটন সম্পর্কে 'মহান আল্লাহর জ্ঞান', অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর তখন একে 'তাত্ত্বিক ক্বাযা ও ক্বাদার' (القضا و القدر العلمى) বলা হয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো কোন ঘটনার সাথে তার পর্যায়ক্রমিক দশাগুলোর সম্পর্ক এবং অনুরূপ তাদের প্রত্যক্ষ সংঘটনে মহান আল্লাহর সম্পর্ক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর তখন একে প্রত্যক্ষ ক্বাযা ও ক্বাদার (القضا و القدر العينى) বলা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন আয়াত ও রেওয়ায়েত থেকে যতটুকু জানা যায় তাতে পরিদৃষ্ট হয় যে, সকল ঘটনা ঠিক যেরূপ বাস্তব জগতে সংঘটিত হবে, সে সম্পর্কে প্রভুর জ্ঞান, 'লৌহে মাহফুজ' নামক পবিত্র ও সমুন্নত সৃষ্ট বিষয়ে সংরক্ষিত আছে। যিনি মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে এর সান্নিধ্যে পৌঁছবেন, তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের সকল ঘটনা সম্পর্কে অবগত হবেন। অনুরূপ অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ফলকসমূহও (الواح) বিদ্যমান, যেখানে ঘটনাসমূহ অসমাপ্ত ও শর্তযুক্ত অবস্থায় লিপিবদ্ধ আছে। যদি কেউ (আল্লাহর অনুমতিক্রমে) এর নৈকট্যে সক্ষম হন তবে তিনি সীমাবদ্ধ সংবাদ সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন, যা শর্তাধীন ও পরিবর্তনযোগ্য। সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত আয়াতটি এ দু'ধরনের ভাগ্যলিপি সম্পর্কেই সাক্ষী প্রদান করে ঃ

يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب

আল্লাহর যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তাই প্রতিষ্ঠিত রাখেন আর তাঁরই নিকট আছে কিতাবের মূল। (সুরা রা' দ-৩৯)

উল্লেখ্য অনিশ্চিত ও শর্তাধীন 'তাক্বদীরসমূহকে' রেওয়ায়েতের ভাষায় 'বাদা (بداء) নামকরণ করা হয়েছে।

যা হোক 'তাত্ত্বিক ক্বাযা ও ক্বাদারের' প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর অনাদি জ্ঞান সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা অপেক্ষা সমস্যাসংকুল নয়। পূর্ববর্তী পাঠে খোদার জ্ঞান সম্পর্কে, জাব্‌রবাদীদের ভ্রান্ত ধারণার উপর আলোচনা করা হয়েছিল এবং সেখানে তাদের ধারণার অন্তঃসারশুন্যতা প্রতিপন্ন হয়েছিল।

কিন্তু 'প্রত্যক্ষ ক্বাযা ও ক্বাদারের' প্রতি বিশ্বাস বিশেষেকরে 'সুনিশ্চিত ভাগ্যলিপির' প্রতি বিশ্বাস কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হয়। সুতরাং ঐ সমস্যাগুলোর সমাধানে সচেষ্ট হব -যদিও এর সংক্ষিপ্ত উত্তর 'স্বাধীন প্রভাব' শিরোনামে একত্ববাদের আলোচনায় দেয়া হয়েছে।

মানুষের এখ্‌তিয়ারের সাথে ক্বাযা ও ক্বাদারের সম্পর্ক ঃ

ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, প্রত্যক্ষ ক্বাযা ও ক্বাদারের প্রতি বিশ্বাসের দাবি হল এই যে, সৃষ্ট বিষয়ের অস্তিত্বকে, সৃষ্টির শুরু থেকে বিকাশকাল পর্যন্ত ও তৎপর অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত, এমনকি দূরবর্তী প্রারম্ভিকার যোগান কালকেও প্রজ্ঞাবান প্রভুর জ্ঞানাধীন বলে বিশ্বাস করা। তেমনি সৃষ্টির শর্তসমূহের যোগান ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাকে প্রভুর ইচ্ছা বা ইরাদা সংশ্লিষ্ট বলে গণনা করা।[১]

অন্যকথায় ঃ সব কিছুরই অস্তিত্ব খোদার অনুমতি ও সুনির্ধারিত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন কিছুই অস্তিত্বের ময়দানে পা ফেলতে পারেনা। তেমনি সব কিছুই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদির ও ক্বাযার উপর নির্ভরশীল, যা ব্যতীত কোন অস্তিত্বশীলই স্বীয় আয়াতন, আকৃতি ও বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় না ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে না। এ সম্পর্কের বর্ণনা ও এর স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান হল প্রকৃতপক্ষে 'স্বাধীন প্রভাব' অর্থে তাওহীদেরই শিক্ষা, যা হল একত্ববাদের সর্বোচ্চস্তর এবং যা মানব সম্প্রদায়ের আত্মোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ

১। ক্বাযা ও প্রভুর ইরাদার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (বিষয়বস্তু হিসাবে) সূরা আল ইমরানের ৪৭ তম আয়াতকে সূরা ইয়াছিনের ৮২তম আয়াতের উপর সমাপতনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়।

ভূমিকা পালন করে থাকে -যেমনটি ইতিপূর্বে আমরা ইঙ্গিত করেছি।

বিষয়বস্তুর সংঘটন প্রভুর অনুমতি এবং তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এর প্রমাণ অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য ও সহজবোধ্য। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায় এবং প্রভুর ক্বাযায় এর নিশ্চিত নির্ধারণের সাক্ষ্য, দুষ্প্রাপ্যতার কারণে অধিকতর আলোচনা ও পর্যালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কারণ এ ধরনের বিশ্বাসের সাথে, 'আপন ভাগ্যলিপির পরিবর্তনে মানুষের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা' বা 'এখতিয়ারের' স্বীকৃতির সমন্বয় খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এর ফলেই এক শ্রেণীর মোতাকাল্লেমিন (আশায়েরী) যারা মানুষের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রভুর ক্বাযাকে স্বীকার করেছিলেন, তারা জাব্‌রবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। আবার অপর এক শ্রেণীর মোতাকাল্লেমিন (মো'তাযেলী) যারা জাব্‌র ও এর শোচনীয় পরিণতিকে গ্রহণ করতে পারেননি, তারা মানুষের স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডকে প্রভুর ক্বাযার অন্তর্ভুক্ত বলে মেনে নেননি। উভয়দলই নিজেদের মতের বিরোধী আয়াত ও রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে স্বীয় মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যেগুলো জাব্‌র ও তাফবিজ সম্পর্কে আলোচনায় কালমশাস্ত্রের বিভিন্ন পুস্তকে ও বিশেষ গবেষণাপত্রসমূহে সন্নিবেশিত আছে।

মূল সমস্যাটি হল ঃ যদি মানুষের কর্মকাণ্ড প্রকৃতই তার স্বাধীন নির্বাচনাধীন ও তার ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত হয়, তবে কিরূপে একে প্রভুর ইচ্ছা ও ক্বাযার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা সম্ভব? আবার যদি প্রভুর ক্বাযার সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে, তবে কিরূপে তাকে মানুষের স্বাধীন নির্বাচনাধীন ও ইচ্ছাধীন বলে গণনা করা সম্ভব?

অতএব এ সমস্যার সমাধানের জন্যে এবং মানুষের স্বাধীন নির্বাচনাধীন ও ইচ্ছাধীন কর্মকাণ্ডের স্বপক্ষে দলিলের সাথে, প্রভুর ক্বাযা ও ইচ্ছাধীন কর্মকাণ্ডের স্বপক্ষে দলিলের সমন্বয়ের জন্যে 'একই কার্যের একাধিক কারণ' শিরোনামে একটি আলোচনা ও পর্যালোচনায় প্রয়াসী হব, যাতে মানুষের ইচ্ছাধীন কর্মকাণ্ড ও মহান প্রভুর ইচ্ছাধীন কর্মকাণ্ডের স্বপক্ষ দলিল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়।

একাধিক কারণের প্রভাব ঃ

কোন একটি বিষয়ের অস্তিত্বের জন্যে একাধিক কারণের প্রভাব

বিভিন্নভাবে দৃষ্টিগোচর হয় ঃ

১। একাধিক কারণ যুগপৎ ও পাশাপাশি ক্রিয়া করে থাকে। যেমন ঃ বীজ, পানি ও তাপমাত্রা ইত্যাদির সমন্বয়ে বীজ বিদীর্ণ হয়ে অংকুরোদগম ঘটে।

২। কারণগুলো পালাক্রমে এরূপে ক্রিয়া করে যে, সৃষ্টের জীবদ্দশা একাধিক ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক ভাগ পালাক্রমে তাদের কোন একটি কারণের কার্যে (معلول) পরিণত হয়ে থাকে। যেমন ঃ বিমানের কয়েকটি মোটর পালাক্রমে পরিচালিত হয়ে একে গতি দান করে থাকে ।

৩। তাদের প্রভাবগুলো হল পারস্পরিক। যেমন ঃ কয়েকটি বল ঐগুলোর গতিপথে পরস্পরের সাথে যে সংঘর্ষ করে তাতে অথবা ধারাবাহিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রেও এরূপ পরিলক্ষিত হয়। এর অপর একটি উদাহরণ হল ঃ হস্তের গতিতে মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব, কলমের গতিতে হস্তের প্রভাব, লিখনের অস্তিত্বে কলমের প্রভাব ।

৪। পরস্পরের উল্লম্বে অবস্থানকারী কারণসমূহের পারস্পরিক প্রভাব এরূপ যে, এদের একটির অস্তিত্ব অপরটির উপর নির্ভরশীল (উচ্চক্রমানুসারে)। এটি পূর্ববর্তী (হস্ত, কলম ও ইচ্ছার) উদাহরণের ব্যতিক্রম, যেখানে কলমের অস্তিত্ব, হস্তের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল না; অনুরূপ হস্তের অস্তিত্ব, মানুষের ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল না।

যা হোক একক কার্যের উপর একাধিক কারণের প্রভাবের ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত সবগুলো অবস্থাই সম্ভব। তবে স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মানুষের ইরাদা ও মহান আল্লাহর ইরাদার প্রভাব শেষোক্ত প্রকারের মত। কারণ মানুষ ও তার ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব আল্লাহর ইরাদার উপর নির্ভরশীল।

একক কারণের উপর দু'টি কারণের সামষ্টিক প্রভাব, কেবলমাত্র তখনই অসম্ভব, যখন উভয়ই অস্তিত্বদাতা কারণ হবে, অথবা তাদের সমষ্টি নিষিদ্ধ এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য হবে। যেমন ঃ দু'ইরাদাকারীর (অনুভূমিক)* একই ইরাদায় অনুপ্রবেশ অথবা একই সৃষ্ট বিষয়ের জন্যে দু'চূড়ান্ত কারণের প্রভাব।

---

* মানুষের ইচ্ছা খোদার ইচ্ছার উল্লম্বে অবস্থান করে-অনুভূমিকা অবস্থানে বা খোদার সমান্তরালে নয়।

ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ঃ

উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যার আলোকে ইতিমধ্যেই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, মানুষের স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডের অস্তিত্বের সাথে মহান আল্লাহর ইরাদার কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় না। কারণ এরা পরস্পর পরস্পরের উল্লম্বে অবস্থান করে এবং পারস্পরিকভাবে কোন প্রকার বিরোধ বা সংঘর্ষ তাদের মধ্যে নেই।

অন্যকথায় ঃ কোন কর্মের সাথে মানব কর্তৃত্বের সম্পর্ক এক স্তরে এবং ঐ কর্মের অস্তিত্বের সাথে খোদার সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্তরে অবস্থান করে। আর এ স্তরে মানুষের অস্তিত্ব, যে বস্তুর উপর মানুষ ক্রিয়া করে তার অস্তিত্ব, কর্ম-সম্পাদনের উপকরণসমূহের অস্তিত্ব ইত্যাদি সব কিছুই খোদার উপর নির্ভরশীল।

অতএব শেষোক্ত শ্রেণীর চূড়ান্ত কারণরূপে মানুষের কর্মকাণ্ডের উপর তার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবের সাথে, খোদার উপর নির্ভরশীল চূড়ান্ত কারণের সকল সদস্যের অস্তিত্বের কোন বিরোধ নেই। এ বিশ্ব, মানুষ ও তার সকল মানবীয় মর্যাদার অস্তিত্ব মহান আল্লাহরই নিকট এবং তিনিই প্রতিনিয়ত ঐগুলোকে অস্তিত্ব প্রদান করে থাকেন; আর নতুন নতুন রূপে তাদেরকে সৃষ্টি করেন। কোন অস্তিত্বশীলই, কোন অবস্থায় ও কালেই তাঁর থেকে অনির্ভরশীল নয়। অতএব যে সকল কর্মকাণ্ড মানুষের নির্বাচনাধীন, সে সকল কর্মকাণ্ডও মহান আল্লাহর অমুখাপেক্ষী নয় এবং তাঁর ইচ্ছা ও ইরাদার সীমানাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। অনুরূপ সৃষ্টির সকল বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব, আয়তন, আকৃতিও মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদির ও ক্বাযার উপর নির্ভরশীল। এমন নয় যে, হয় মানুষের ইচ্ছার মুখাপেক্ষী, নতুবা মহান আল্লাহর ইরাদার মুখাপেক্ষী। কারণ এ ইরাদাদ্বয় পরস্পরের সমান্তরালে বা অনুভূমে অবস্থান করে না বা নিষিদ্ধ সমন্বয় (مانعة الجمع) নয় এবং কোন কর্ম সম্পাদনে এ ইরাদাদ্বয়ের প্রভাব পরস্পরের বিকল্প হিসাবে ক্রিয়া করে না। বরং মানুষের ইচ্ছাশক্তি তার মূল অস্তিত্বের মতই মহান আল্লাহর ইরাদার উপর নির্ভরশীল এবং মহান আল্লাহর এ ইরাদা তার অস্তিত্বলাভের জন্যে অপরিহার্য।

وماتشاؤن الا ان يشاء الله ربّ العالمين

তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (সূরা তাকবির- ২৯)

ক্বাযা ও ক্বাদারের প্রতি বিশ্বাসের সুফল ঃ

আল্লহ কর্তৃক নির্ধারিত ক্বাযা ও ক্বাদারের প্রতি বিশ্বাস, খোদা পরিচিতির সমুন্নত মূল্যবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মানুষের উৎকর্ষের কারণ বলে পরিগণিত হওয়া ছাড়াও এর বহুবিধ কার্যকরী প্রভাব বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে কোন কোনটি সম্পর্কে ইতির্পূবেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফলে এখানে আমরা অপর কিছুর বর্ণনা করব ঃ

যদি কেউ ঘটনার সংঘটনকে মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন ও ক্বাযা-ক্বাদরের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন তবে তিনি যে কোন অপ্রীতিকর অবস্থায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন না এবং ঐ পরিস্থিতির কাছে পরাজয় বরণ করেন না ও উৎকন্ঠিত হয়ে পড়েন না। বরং মনে করেন যে এ ঘটনাও মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা বা হিকমাতপূর্ণ বিন্যাস-ব্যবস্থারই অংশ এবং কল্যাণ ও হিকমাতের ছায়াতলেই সংঘটিত হয়েছে বা হয়ে থাকবে। ফলে সানন্দে এ অবস্থাকে স্বাগতম জানায় এবং ধৈর্য, আস্থা, তুষ্টি ও মহান আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করার মত কল্যাণের অধিকারী হয়ে থাকে।

অনুরূপ ক্বাযা ও ক্বাদারে বিশ্বাসীগণ জীবনে আমোদ-প্রমোদে মুহ্যমান, বিমোহিত কিংবা প্রতারিত হন না অথবা এগুলোর জন্যে অহংকার ও প্রাণ-চাঞ্চল্যতা প্রদর্শন করেন না বা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ামতসমূহকে আভিজাত্য ও আত্মম্ভরিতার বিষয়রূপে গণনা করেন না।

ক্বাযা ও ক্বাদরের প্রতি বিশ্বাসের এ মূল্যবান প্রভাব হল তা-ই যা নিম্নলিখিত আয়াতশরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ما اصاب من مصيبة فى الارض ولا فى انفسكم الا فى كتاب من قبل ان نبراها انّ ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما ءاتكم و الله لا يحبّ كلّ مختال فخور

পৃথিবীতে অথবা তোমাদের জীবনের উপর (অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে) কোন বিপর্যয় আসে না, কিন্তু এসবই পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেই লওহে মাহ্ফুযে লিপিবদ্ধ আছে; আর আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ কাজ। এটা এই জন্যে যে, যা কিছু তোমরা হারিয়েছ তাতে যেন বিমর্ষ এবং যা কিছু তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন তার প্রতি আসক্ত ও হর্ষোৎফুল্ল না হও, আল্লাহ উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে ভালবাসেন না। (সূরা হাদীদ- ২২,২৩)

কিন্তু স্মরণ রাখা উচিৎ যে, ক্বাযা ও ক্বাদার, আর স্বাধীন প্রভাবে একত্ত্ববাদের ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা যেন উদাসীনতা, অলসতা, হীনতা, অত্যাচারিত হওয়া এবং অন্যায়ের কাছে মাথা নত করার কারণ না হয়। আর এটাই সর্বদা স্মরণ করব যে, মানুষের চিরন্তন সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য স্বীয় নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতেই অর্জিত হয়ে থাকে।

لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت

সে ভাল যা উপার্জন করে তা তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তাও তারই। (সুরা বাকারা – ২৮৬)

তদনুরূপ,

و ان ليس للانسان الا ما سعى

আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে করে। (সুরা নাজম-৩৯)

পাঠ - ২০

আল্লাহ্‌র ন্যায়পরায়ণতা

- ভূমিকা
- ন্যায়পরায়ণতার তাৎপর্য
- প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ
- কয়েকটি প্রশ্নের জবাব

ভূমিকা ঃ

পূর্ববর্তী পাঠসমূহে বিভিন্ন বিষয়ে কালামশাস্ত্রবিদগণের দু'সম্প্রদায়ের (আশায়েরী ও মো'তাজেলী) মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ্য করেছি। এ বিষয়গুলোর মধ্যে কালাম, ইরাদা, গুণগত একত্ববাদ, জাব্‌র ও এখ্‌তিয়ার এবং ক্বাযা ও ক্বাদারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ দু'সম্প্রদায়ের মতামত ছিল চরম প্রান্তিক ও বাড়াবাড়ি ধরনের।

এ দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধপূর্ণ অপর একটি বিষয় হল প্রভুর ন্যায় পরায়ণতা (عدل الهی)। উল্লেখ্য এ বিষয়টির ক্ষেত্রে শিয়া মাযহাবের মতামত মো'তাজেলীদের অনুরূপ। আশায়রীদের প্রতিকুলে এ দু'সম্প্রদায়কে সম্মিলিতভাবে আদলিয়াহ (عدلية) নামকরণ করা হয়ে থাকে। কালামশাস্ত্রে এ বিষয়টির উপর এতই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, মুখ্য বিষয়সমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। এমনকি একে আক্বা'য়েদের মূলনীতি এবং শিয়া ও মো'তাজেলী মাযহাবের কালামশাস্ত্রের বিশেষত্ব বলেও মনে করা হয়েছে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আশায়েরীগণও আল্লাহর আদল বা ন্যায়বিচারকে অস্বীকার করেন না অর্থাৎ এমন নয় যে, আল্লাহকে অত্যাচারী (আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন) মনে করেন –যেখানে কোরানের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আল্লাহর ন্যায়বিচারের প্রমাণ বহন করে এবং যে কোন প্রকারের জুলুম ও অত্যাচারের অপবাদ থেকে প্রভুসত্তাকে পবিত্ররূপে প্রকাশ করে। বরং বিতর্কের বিষয় হল এটা যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কি শরীয়ত, কিতাব ও সুন্নতের সাহায্য ব্যতীত কোন কর্ম, বিশেষ করে ঐশী কর্মকাণ্ডের মানদণ্ড নিরূপণে সক্ষম যার উপর ভিত্তি করে কোন কর্মের গ্রহণ বা বর্জনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে মন্তব্য করা যাবে? যেমন ঃ বলবে যে, মু'মেনগণকে বেহেস্তে, আর কাফেরদেরকে দোযখে প্রেরণ করা মহান আল্লাহর জন্যে অপরিহার্য। না কি, এ ধরণের সিদ্ধান্তদান কেবলমাত্র ওহীর ভিত্তিতে রূপ পরিগ্রহ করে, যা ব্যতীত বুদ্ধিবৃত্তি কোন প্রকার সিদ্ধান্ত দিতে অপারগ?

অতএব বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু হল তাতেই, যাকে 'বুদ্ধিবৃত্তিক ভাল-মন্দ' (الحسن والقبح العقلی) বলা হয়ে থাকে। আশায়েরীরা একে অস্বীকার করে এবং সুনির্ধারিত বিষয়ে (امور تکوینی) বিশ্বাস স্থাপন করে, অর্থাৎ যা মহান

আল্লাহ্ সম্পাদন করেন তা-ই সুকর্ম, আর (বিধিগত বিষয়ে) তিনি যা আদেশ করেন তা-ই ভাল এমন নয় যে, যেহেতু কর্মটি ভাল, তাই তিনি এটা সম্পাদন করেন বা সম্পাদন করার আদেশ প্রদান করেন।

কিন্তু, আদলিয়াহগণ বিশ্বাস করেন যে, কর্মকাণ্ডসমূহ সুনির্ধারিত ও বিধিগত হিসেবে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিতকরণ ব্যতীতই, ভাল অথবা মন্দ নামে অভিষিক্ত হয়ে থাকে এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিও একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ভাল–মন্দকে অনুধাবন করতে ও প্রভুসত্তাকে সকল প্রকার মন্দকর্ম সম্পাদন করা থেকে পবিত্র ভাবতে সক্ষম। তবে তা মহান আল্লাহর প্রতি আদেশ-নিষেধ করা (মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন) অর্থে নয়। বরং এ অর্থে যে, কোন কর্ম মহান আল্লাহর কামালিয়াতের সাথে সম্পর্কিত কি-না। আর এর উপর ভিত্তি করেই মহান আল্লাহ্ কর্তৃক মন্দকর্ম সম্পাদনকে অসম্ভব বলে মনে করা হয়।

এটা অনস্বীকার্য যে, এ বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা এবং আশায়েরীদের পক্ষ থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক ভাল-মন্দের ধারণার অস্বীকৃতি ও অবশেষে যা তাদেরকে আদলিয়াহদের বিপরীত অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে, তার জবাব প্রদান, এ প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে অসম্ভব। অনুরূপ এ ব্যাপারে মো'তাযেলীদের বক্তব্যেরও অনেক দুর্বলতা থাকতে পারে, যে সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা উচিৎ। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক ভাল-মন্দের মূলভাষ্য শিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত, কিতাব ও সুন্নতের উৎস থেকে অনুমোদিত ও মাসুমগণ (আঃ) কর্তৃক গুরুত্বারোপকৃত হয়েছে ।

ফলে আমরা এখানে সর্বপ্রথমে আদলের ধারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করব। অতঃপর মহান আল্লাহর এ ক্রিয়াগত গুণের স্বপক্ষে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের উল্লেখ করব। সর্বশেষে এ বিষয়টি সম্পর্কে বিদ্যমান ভ্রান্ত ধারণাসমূহের জবাব প্রদানে সচেষ্ট হব।

আদলের (ন্যায়পরায়ণতার) তাৎপর্য ঃ

আদলের (عدل) আভিধানিক অর্থ হল বরাবর বা সমমান সম্পন্ন করা এবং সাধারণের ভাষায় অত্যাচারের (অপরের অধিকার হরণ) বিরুদ্ধে অপরের অধিকার সংরক্ষণার্থে ব্যবহৃত হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আদলকে নিম্নরূপে

সংজ্ঞায়িত করা যায়।

اعطاء كلّ ذى حق حقه

যার যার অধিকার তাকে প্রদান করা।

অতএব সর্বাগ্রে এমন এক অস্তিত্বকে বিবেচনা করতে হবে যার অধিকার আছে; অতঃপর তার সংরক্ষণকে ন্যায়বিচার বা আদল (عدل), আর তার লংঘনকে অত্যাচার বা জুলুম (ظلم) নামকরণ করা যায়। কিন্তু কখনো কখনো আদলের ধারণার সম্প্রসারণে বলা হয়ে থাকে ঃ

وضع كلّ شيء فى موضعه

প্রত্যেক বস্তুকেই তাদের নিজ নিজ স্থানে স্থাপিত।

অর্থাৎ সকল কিছুকে যথাস্থানে সংস্থাপন অথবা সকল কর্মকে উপযুক্তরূপে সম্পন্ন করণই হল 'আদল'। আর এ সংজ্ঞানুসারে আদল; প্রজ্ঞা (حكمت) ও ন্যায়ভিত্তিক কর্মের সমার্থবোধক অর্থ বা প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্ম অর্থে রূপ পরিগ্রহ করে। তবে কিরূপে 'অধিকারীর অধিকার' এবং সকল কিছুর যথোপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হয় –এ সম্পর্কে বক্তব্য অনেক –যা 'আখলাক্বের দর্শন' ও 'অধিকারের দর্শন' রূপে গুরুত্বপূর্ণ শাখা সৃষ্টি করেছে। স্বভাবতঃই এখানে আমরা এ বিষয়ের উপর আলোচনা করতে পারব না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল ঃ সকল বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই অনুধাবন করতে পারে যে, যদি কেউ কোন কারণ ছাড়াই কোন অনাথ শিশুর হাত থেকে এক টুকরা রুটিও ছিনিয়ে নেয় অথবা নিরপরাধ মানুষের রক্ত ঝরায়, তবে সে জুলুম করেছে এবং অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। আবার বিপরীতক্রমে, যদি কেউ ছিনতাইকারীর নিকট থেকে ছিনতাইকৃত রুটির লোকমা উদ্ধার করে, ঐ অনাথ শিশুকে ফিরিয়ে দেয় অথবা অপরাধী ঘাতককে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করে, তবে সে ন্যায়বিচার করেছে বা সঠিক কর্ম সম্পাদন করেছে। এ সিদ্ধান্তগুলো প্রভু কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-নিষেধের উপর নির্ভরশীল নয়। এমনকি যদি কেউ খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নাও হয়ে থাকে, তবে সেও এ ধরনের সিদ্ধান্তই নিবে।

কিন্তু এ ধরনের সিদ্ধান্তের গুঢ় রহস্য কী বা কোন সে শক্তির মাধ্যমে মানুষ ভাল-মন্দকে অনুধাবন করে ইত্যাদি বিষয়গুলোকে দর্শনের একাধিক শাখায় আলোচনা করতে হবে ।

সিদ্ধান্ত ঃ আদলের জন্যে বিশেষ ও সাধারণ এ দু'ধরনের ভাবার্থকে বিবেচনা করা যেতে পারে। এদের একটি হল 'অন্যের অধিকার সংরক্ষণ' এবং অপরটি হল 'প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্ম সম্পাদন' যেখানে 'অন্যের অধিকার সংরক্ষণ' এর একটি দৃষ্টান্তরূপে পরিগণিত হবে ।

অতএব আদলের অবিচ্ছেদ্য অর্থ, সকল মানুষকে বা সকল কিছুকে এক বরাবর বা এক রেখায় স্থাপন নয়। যেমন ঃ ন্যায়পরায়ণ শিক্ষক তিনিই নন যিনি পরিশ্রমী বা অলস নির্বিশেষে সকল ছাত্রকেই একরূপ প্রশংসা বা ভর্ৎসনা করবেন। অনুরূপ ন্যায়বিচারক তিনিই নন যিনি বিবাদপূর্ণ কোন সম্পদকে, কলহে লিপ্ত দু'পক্ষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করবেন। বরং ন্যায়পরায়ণ শিক্ষক তিনিই যিনি সকল ছাত্রকে তাদের যোগ্যতানুসারে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করবেন। তদনুরূপ ন্যায়বিচারক তিনিই যিনি বিবাদপূর্ণ সম্পদকে এর প্রকৃত মালিকের নিকট অর্পণ করবেন।

একইভাবে প্রভুর প্রজ্ঞা ও আদলের দাবী এটা নয় যে, সৃষ্টির সবকিছুকেই সমানভাবে সৃষ্টি করবেন। যেমন ঃ মানুষকেও শিং, কেশর বা পাখা ইত্যাদি দিবেন। বরং সৃষ্টিকর্তার প্রজ্ঞার দাবী হল এই যে, বিশ্বকে তিনি এরূপে সৃষ্টি করবেন যাতে সর্বাধিক কল্যাণ ও উৎকর্ষ অর্পিত হয় এবং বিভিন্ন সৃষ্ট বিষয় যেগুলো এ জগতের সুসংহত অংশসমূহ রূপে পরিগণিত, সে গুলোকে এমনভাবে সৃষ্টি করবেন, যেন ঐ চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের (উৎকর্ষ ও কল্যাণ) সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। অনুরূপ প্রভুর আদল ও প্রজ্ঞার দাবী হল এই যে, সকল মানুষকেই তার যোগ্যতানুসারে দায়িত্ব প্রদান। অতঃপর তার স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও প্রচেষ্টার আলোকে তার বিচার করণ এবং পরিশেষে তার কর্মফলস্বরূপ তাকে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করা।

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

আল্লাহ কারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। (সূরা বাকারা - ২৮৬)

و قضى بينهم بالقسط و هم لا يظلمون

তাদের মীমাংসা ন্যায়বিচারের সাথে করা হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (সূরা ইউনুস - ৫৪)

فاليوم لا تظلم نفس شيئا و لا تجزون الا ما كنتم تعملون

আজ কারও প্রতি জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করেছ কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে। (সুরা ইয়সীন - ৫৪)

প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ ঃ

ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রভুর ন্যায়পরায়ণতা এক দৃষ্টিকোণ থেকে মহান আল্লাহর হিকমাত বা প্রজ্ঞাধীন এবং অপর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রজ্ঞারই অভিন্ন রূপ। স্বভাবতঃই এর প্রমাণও সে যুক্তির মাধ্যমেই করা হবে যা প্রভুর প্রজ্ঞাকে প্রতিপাদন করার ক্ষেত্রে উপস্থাপন করা হয়েছিল। একাদশ পাঠে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে এখানে আমরা এ সম্পর্কে আর ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করব।

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, মহান আল্লাহ চূড়ান্ত স্বাধীনতা ও ক্ষমতার অধিকারী। সম্ভাব্য অস্তিত্বের জন্যে কোন কর্ম সম্পাদন করার বা না করার ক্ষেত্রে তিনি কোন শক্তি কর্তৃক প্রভাবিত বা কোন শক্তির নিকটই পরাভূত নন। বরং তিনি ইচ্ছে করলে কোন কিছু নাও করতে পারেন এবং যা তিনি সম্পাদনের ইচ্ছে করবেন তাই করবেন।

অনুরূপ তিনি কোন অর্থহীন ও অহেতুক ইচ্ছা পোষণ করেন না। বরং যা কিছু তাঁর পূর্ণতম গুণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই তিনি ইচ্ছা করেন। যদি তাঁর পূর্ণতম গুণ কোন কর্মকে দাবি না করে, তবে তিনি কখনোই তা সম্পাদন করেন না। যেহেতু মহান আল্লাহ চূড়ান্ত পূর্ণতার অধিকারী, সেহেতু তাঁর ইরাদাও মূলতঃ সৃষ্টির কল্যাণ ও পূর্ণতার দিকেই হয়ে থাকে এবং যদি কোন অস্তিত্বশীলের আস্তিত্ব বিশ্বে অনিবার্য অকল্যাণ ও অভিসম্পাতের কারণ হয়, তবে তা হয়ে থাকে প্রসঙ্গক্রমে। অর্থাৎ যেহেতু ঐ অকল্যাণ সর্বাধিক কল্যাণের অবিচ্ছেদ্য বিষয়, সেহেতু প্রভুর ইরাদা বা ইচ্ছা উক্ত সর্বাধিক কল্যাণের অনুগামী হয়ে থাকে।

অতএব প্রভুর পূর্ণতম গুণের দাবি এই যে, বিশ্ব এমনভাবে সৃষ্টি হবে যাতে সম্মিলিতভাবে সম্ভাব্য সর্বাধিক পূর্ণতা ও কল্যাণ অর্জিত হয়। আর এখানেই মহান আল্লাহর জন্যে প্রজ্ঞা (حكمت) নামক গুণটি প্রতিপন্ন হয়।

এর ভিত্তিতে যেখানেই মানুষের অস্তিত্বলাভের সম্ভাবনা বিদ্যমান ও তার অস্তিত্ব সর্বাধিক কল্যাণের উৎস, সেখানেই মানুষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রভুর ইচ্ছার সমাপতন ঘটেছে। মানুষের একটি মৌলিক বিশেষত্ব হল এখ্‌তিয়ার ও স্বাধীন ইচ্ছা এবং নিঃসন্দেহে স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতার অধিকার মানুষের একটি অস্তিত্বগত পূর্ণতা বলে পরিগণিত। আর যে অস্তিত্বশীল এ পূর্ণতার অধিকারী, সে অস্তিত্বশীল অপর কোন অস্তিত্বশীল, যা এর অধিকারী নয়, তা অপেক্ষা পূর্ণতর বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু স্বাধীনতার অধিকারী হওয়ার জন্যে অপরিহার্য হল ঃ মানুষ যেমনি সুকর্ম ও যথোপযুক্ত কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে অনন্ত ও চূড়ান্ত পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারবে তেমনি কুকর্ম ও অপছন্দনীয় কর্মে লিপ্ত হয়ে অনন্ত দুর্দশা ও ক্ষতির পথে পতিত হতে পারবে। তবে প্রভুর ইরাদার বিষয় হল মূলতঃ মানুষের পূর্ণতা প্রাপ্তি। কিন্তু মানুষের স্বাধীন নির্বাচনাধীন পূর্ণতার অবিয়োজন (لازمه) যেহেতু অধঃপতনের সম্ভাবনাযুক্ত, যা পাশবিক কামনা ও শয়তানী প্রবণতার অনুসরণে অর্জিত হয়, সেহেতু এ ধরনের স্বাধীন নির্বাচনাধীন অধঃপতনও সঙ্গত কারণেই প্রভুর ইরাদার বিষয়ে পরিণত হয়।

আবার যেহেতু সচেতনভাবে নির্বাচন করার জন্যে ভাল ও মন্দ পথগুলোর সঠিক পরিচিত প্রয়োজন সেহেতু মহান আল্লাহ মানুষকে যা কিছু তার কল্যাণ ও সৌভাগ্যের কারণ, তার প্রতি আহ্বান করেছেন এবং যা কিছু অধঃপতন ও অকল্যাণের কারণ, তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে পূর্ণতার পথ সুগম হয়। অনুরূপ যেহেতু আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব মানুষকে তার কর্মফলে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে এবং তা মহান আল্লাহর জন্যে কোন কল্যাণ (বা অকল্যাণ) বয়ে আনে না, সেহেতু প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি হল বান্দার ক্ষমতানুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করা। কারণ যে দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব, সে দায়িত্ব অর্পণ করাটা হবে অনর্থক ও অহেতুক কর্ম।

অতএব আদলের প্রথম পর্যায় (বিশেষ অর্থে) অর্থাৎ দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা, এ যুক্তিতে প্রতিপাদিত হয় যে, যদি মহান আল্লাহ বান্দাগণের ক্ষমতাতিরিক্ত দায়িত্ব তাদেরকে প্রদান করেন, তবে ঐ দায়িত্ব সম্পাদন অসম্ভব হবে এবং এটি একটি অনর্থক কর্ম বলে পরিগণিত হবে। (অথচ মহান আল্লাহর প্রজ্ঞার দাবি হল তিনি অনর্থক কোন কর্ম সম্পাদন করেন না)।

আবার বান্দাগণের মধ্যে বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা, এর উপর ভিত্তি করে প্রমাণিত হয় যে, এ বিচারকর্ম বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে বান্দাগণের অধিকার নির্ধারণের জন্যে সম্পাদিত হয়। যদি এ কর্ম ন্যায়নীতির পরিপন্থি হয় তবে উদ্দেশ্যহীন কর্ম বলে পরিগণিত হবে। (অথচ প্রজ্ঞাবান আল্লাহর পক্ষে উদ্দেশ্যহীন কর্ম সম্পাদন অসম্ভব, কারণ সেটা তাঁর প্রজ্ঞার ব্যতিক্রম)।

অবশেষে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা, সৃষ্টির চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের আলোকে প্রমাণিত হয়। কারণ যিনি মানুষকে তার সুকর্ম ও কুকর্মের প্রতিফল প্রদানের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, যদি তিনি তাদেরকে তাদের লভ্য ও প্রাপ্তির ব্যতিক্রম কোন পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করেন তবে তা তাঁরই উদ্দেশ্যকে ব্যহত করবে।

অতএব প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার সর্বজনস্বীকৃত ও সঠিক দলিল হল এই যে, তাঁর সত্তাগত গুণই প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ন্যায়পরায়ণ কর্মের কারণ এবং অত্যাচার, অবিচার অথবা অনর্থক ও অহেতুক কর্মের দাবিদার কোন গুণই তাঁর অস্তিত্বে বিরাজ করে না।

কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার জবাব ঃ

১। সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ করে মানুষের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান, কিরূপে তা আল্লাহর প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে? কেন প্রজ্ঞাবান ও ন্যায়পরায়ণ প্রভু সকল সৃষ্টিকেই এক রকম করে সৃষ্টি করেন নি?

জবাব ঃ অস্তিত্বলাভের ক্ষেত্রে সৃষ্টির বৈসাদৃশ্য, সৃষ্টি ব্যবস্থার অপরিহার্যতা ও কার্যকারণত্বের অধীন হয়ে থাকে। সৃষ্টিকুলের সকলেই এক রকম হওয়ার ধারণা হল একটি স্থুল চিন্তা এবং যদি কিঞ্চিত পর্যবেক্ষণ করি দেখতে পাব যে, এ ধরনের ধারণা সৃষ্টি ধারার বিরধী বৈ কিছু নয়। কারণ উদাহরণত ঃ যদি সকল মানুষই হয় পুরুষ অথবা স্ত্রী হত, তবে সৃষ্টির ধারা ব্যহত হত এবং মানব সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে যেত। আবার যদি সৃষ্টির সকলেই মানুষ হত তবে খাদ্যাহরণ ও অন্যান্য চাহিদা পূরণ সম্ভব হত না। অনুরূপ যদি সকল পশু-পাখী ও বৃক্ষরাজি একই ধরণের এবং একই রং ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হত, তবে

এ অসণিত কল্যাণ, মনোমুগ্ধকর ও মনোহর দৃশ্যের সৃষ্টি হত না। সৃষ্টির এ বৈচিত্র ও বৈসাদৃশ্য, বস্তুর পরিবর্তন ও বিবর্তন ধারায় একাধিক শর্ত ও কারণের অধীনে রূপ পরিগ্রহ করে। সুতরাং মহান আল্লাহ কোন কিছুকেই সৃষ্টির পূর্বে তার নির্দিষ্ট স্থান, কাল ও পাত্রে স্থান দেন না, যাতে ন্যায়-অন্যায়ের কোন স্থান থাকবে।

২) এ মহাবিশ্বে মানবজীবনের অস্তিত্ব, যদি প্রভুর প্রজ্ঞার দাবী হয়ে থাকে তবে কেন মানুষকে মৃত্যুদান করা হয় এবং তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয় ?

উত্তর ঃ প্রথমতঃ জীবন ও মৃত্যু, এ বিশ্বে সুনির্ধারিত নিয়ম-নীতির অধীন ও কার্যকারণত্বের সাথে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টি ব্যবস্থার জন্যে অপরিহার্য। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন জীবন্ত অস্তিত্বশীল মৃত্যু বরণ না করত, তবে পরবর্তী অস্তিত্বশীলের জন্যে কোন ক্ষেত্র প্রস্তুত হত না। ফলে পরবর্তীরা এ জীবন ও অস্তিত্বের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হত। তৃতীয়তঃ শুধুমাত্র মানুষের কথাই যদি ধরা হয় যে, সকল মানুষ অমর থাকুক, তবে অচিরেই তাদের জন্যে এ বিশ্বের আবাসস্থল সংকীর্ণ হয়ে পড়ত আর ব্যথা-বেদনা ও ক্ষুধার তীব্রতায় তখন সকলেই মৃত্যু কামনা করত। চতুর্থতঃ মানব সৃষ্টির পশ্চাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, তাকে অনন্ত সুখ ও বৈভবে পৌছানো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মানব সম্প্রদায় মৃত্যুর মাধ্যমে এ বিশ্ব থেকে স্থানান্তরিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ চূড়ান্ত উদ্দেশ্যে পৌছতে পারবে না।

৩) এ সকল দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, প্রকৃতিক দুর্যোগসমূহ (যেমন ঃ বন্যা ও ভূমিকম্প) ও সামাজিক সংকট (যেমন ঃ যুদ্ধ ও অত্যাচার) ইত্যাদির অস্তিত্ব কিরূপে মহান আল্লাহর ন্যায়পরয়ণতার সাথে সাযুজ্য রক্ষা করে ?

জবাব ঃ প্রথমতঃ অনাকাংখিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হল বস্তুগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও সংঘর্ষের অবিযোজ্য ফল। যেহেতু এগুলোর কল্যাণ, অকল্যাণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, সেহেতু প্রজ্ঞা-বিরোধী নয়। অনুরূপ সামাজিক অনাচারের উদ্ভব হল মানুষের স্বাধীনতারই অবিযোজ্য ঘটনা যা, প্রভুর প্রজ্ঞারই দাবি। তদুপরি, সামাজিক জীবনের কল্যাণ,অকল্যাণেরচেয়ে অধিক। আর যদি অকল্যাণ, কল্যাণের উপর আধিপত্য বিস্তার করত, তবে পৃথিবীতে কোন মানুষ

অবশিষ্ট থাকত না। দ্বিতীয়তঃ এ দুঃখ-দুর্দশা ও সংকটের অস্তিত্ব, একদিকে যেমন প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে মানুষের প্রচেষ্টা এবং জ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশের কারণ; অপরদিকে তেমনি, সংকটময় পরিস্থিতির সাথে সংগ্রাম করণের মাধ্যমে মানুষের বিকাশ, যোগ্যতার প্রস্ফুটন, অগ্রগতি ও পূর্ণতার জন্য এক বৃহত্তম নির্বাহক।

সর্বোপরি এ বিশ্বে দুঃখ-কষ্ট এবং যে কোন সংকটময় পরিস্থিতিতে যদি কেউ সত্যিকার অর্থেই ধৈর্য ধারণ করেন, তবে পরকালীন অনন্ত জীবনে মহামূল্যবান পুরস্কার লাভ করবেন এবং সর্বোত্তম পন্থায় এর বিনিময় পাবেন।

৪) এ জগতে সীমাবদ্ধ পাপাচারের জন্যে অনন্ত শাস্তি প্রদান, কি করে প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়?

জবাব ঃ সুকর্ম ও কুকর্ম এবং পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তির মধ্যে এক প্রকার কারণগত সম্পর্ক বিদ্যমান, যা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ওহীর মাধ্যমে আবিস্কৃত ও মানুষের কর্ণগোচর করা হয়েছে। যেমনকরে এ বিশ্বে কোন কোন ঘটনার সংঘটনে দীর্ঘকাল ধরে এর কুপ্রভাব বজায় থাকে। যেমন ঃ নিজের চোখ বা অন্যের চোখ বিনষ্ট করতে এক মুহূর্তের প্রয়োজন, কিন্তু আমৃত্যু এর প্রতিফল বহন করে যেতে হয়। তেমনি ভয়ংকর পাপকর্মসমূহেরও পরকালীন চিরস্থায়ী কুফল বজায় থাকে এবং যদি কেউ এ বিশ্বে এর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা (যেমন ঃ তওবাহ) না করে তবে এর কুফল তাকে অনন্তকাল পর্যন্ত বহন করতে হবে। যেমনকরে একমুহূর্তের অপরাধের ফলে কোন মানুষের আমৃত্যু অন্ধত্ব প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না, তেমনি ভয়ংকর পাপাচারের ফলে অনন্ত শাস্তিতে পতিত হওয়াও প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার ব্যতিক্রম নয়। কারণ এটি হল পাপীর সেই কর্মের ফল যাতে সে সচেতনভাবে লিপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

পথপ্রদর্শক পরিচিতি

পাঠ –১

নবুয়্যতের প্রসংগ কথা

- ভূমিকা
- বিষয়বস্তু আলোচনার উদ্দেশ্য
- কালামশাস্ত্রে গবেষণা পদ্ধতি

ভূমিকা ঃ

আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, একজন বিচক্ষণ মানুষের মত জীবন-যাপন করার নিমিত্তে যে সকল মৌলিকতম বিষয়সমূহের সমাধান করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও বিবেকবান মানুষের জন্যেই অপরিহার্য সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। মানুষ ও বিশ্বজগতের অস্তিত্ব কার থেকে ? এবং এ গুলোর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কার ?

২। জীবনের পরিশেষ এবং মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য কোথায় ?

৩। প্রকৃত সৌভাগ্য ও পূর্ণতালাভের জন্যে সঠিক পথের সন্ধান প্রাপ্তির উপর মানুষের যে নির্ভরশীলতা, তা কোন বিশ্বস্ত মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে? এবং তা কার নিয়ন্ত্রণাধীন ?

এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর সে মৌলিক ভিত্তিত্রয়ে (তাওহীদ, নবুয়্যত, পুনরুত্থান বা ক্বিয়ামত) বিদ্যমান, যেগুলো প্রতিটি ঐশী ধর্মেরই মৌলিকতম বিশ্বাসরূপে পরিগণিত ।

এ পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আমরা খোদা পরিচিতির উপর আলোচনা করেছি এবং এ উপসংহারে পৌছেছি যে, সকল সৃষ্ট বিষয়ই একক সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং সকলেই তাঁরই প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে; কেউই কোন অবস্থাতে বা কোন কর্মে বা কোন স্থানে অথবা কালেই তাঁর অমুখাপেক্ষী নয়।

এ বিষয়টিকে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলাম[১] এবং উল্লেখ করেছিলাম যে, এ ধরনের বিষয়বস্তুকে শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেই প্রমাণ করা যায়। কারণ বিশ্বাসগত পরিচিতি থেকে এবং আল্লাহর কালাম থেকে যুক্তি প্রদর্শন কেবলমাত্র তখনই যুক্তিযুক্ত হবে, যখন খোদার অস্তিত্ব, তাঁর কালাম এবং ঐ কালামের বিশ্বাসযোগ্যতা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপাদিত হবে।

---

[১]। উল্লেখ্য ঃ প্রসংগক্রমে পবিত্র কোরানের কিছু কিছু আয়াত উদ্ধৃত হয়েছিল, তবে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে নয় বরং ঐ বিষয়ে কোরানের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্তে।

যেমন ঃ নবী (সঃ) ও ইমামগণের (আঃ) বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা, তাঁদের নবুয়্যত ও ইমামতের প্রমাণ এবং তাদের বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণের উপর নির্ভরশীল।

অতএব মূল নবুয়্যতকেও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমেই প্রমাণ করা উচিৎ –যদিও পবিত্র কোরানের সত্যতা প্রমাণ করার পর আমরা এ বিষয়ের স্বপক্ষে উক্ত ঐশী উৎস থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারি। অনুরূপ পুনরুত্থানের (معاد) বিষয়টিকে ওহীর উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে –যদিও মূল পুনরুত্থান তত্ত্বটি, বুদ্ধিবৃত্তিক ও উদ্ধৃতিগত (نقلي) উভয়ভাবেই প্রতিপাদনযোগ্য।

অতএব এ দু'টি বিষয়কে (নবুয়্যত ও পুনরুত্থান) ব্যাখ্যায়িত করার জন্য সর্বাগ্রে নবুয়্যত ও পুনরুত্থানের মূল বিষয়টিকে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। অতঃপর যখন ইসলামের প্রবর্তকের (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)) নবুয়্যত এবং পবিত্র কোরানের সত্যতা প্রতিপন্ন হবে, তখন এ দু'টি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্যে কোরান এবং সুন্নাহ্ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করাই উল্লেখিত বিষয়দ্বয়ের অনুধাবনের জন্যে অপেক্ষাকৃত বেশী উপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী। তাই প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রথমে নবুয়্যাত সম্পর্কে আলোচনা করব। অতঃপর পুনরুত্থানের বিষয়টি তুলে ধরব। এখানে উল্লেখ্য যে, যদি কোন কোন ক্ষেত্রে কোন প্রামাণ্য বিষয়ের শরণাপন্ন হতে হয় তবে তাকে মূল বিষয়' হিসেবে যথাস্থানে প্রতিপাদন করব।

বিষয়বস্তুর আলোচনার উদ্দেশ্য ঃ

এ বিষয়ের আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, অস্তিত্বের স্বরূপ সম্পর্কে এবং সঠিক জীবনধারা সম্পর্কে পরিচিতি লাভের জন্যে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি ভিন্ন অপর একটি পন্থা বিদ্যমান, যেখানে ভুল-ত্রুটির কোন অবকাশ নেই। আর এ পন্থাটি হল 'ওহী' (وحي), যা প্রকারান্তরে ঐশী শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত এবং তা আল্লাহর কোন কোন নির্বাচিত বান্দাগণের জন্যে নির্ধারিত। সাধারণ মানুষ এ ওহীর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নন। কারণ তারা এরূপ কোন দৃষ্টান্ত স্বীয় অভ্যন্তরে খুঁজে পান না। তবে বিভিন্ন আলামত ও ইঙ্গিত থেকে ওহীর

অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হন এবং ওহী লাভ সম্পর্কে আম্বিয়াগণের (আঃ) দাবির স্বীকৃতি প্রদান করে থাকেন। স্বভাবতঃই যখন কারও উপর ওহীর অবতরণ সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় তখন অন্যান্যদের দায়িত্ব হল তার মাধ্যমে যে নিদের্শ অবতীর্ণ হয়েছে তাকে গ্রহণ করা ও তদানুসারে কর্ম সম্পাদন করা। কেউই এ ওহীর বিরোধিতা করে অব্যাহতি পাবে না, যদি না তা কোন নির্দিষ্ট স্থান, কাল ও পাত্রের জন্যে নির্ধারিত হয়।

অতএব এ খণ্ডের মূল আলোচিত বিষয়গুলো হল ঃ

নবীগণের (আঃ) নবুয়্যত ঘোষণার গুরুত্ব, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে এ ওহীর পবিত্রতার গুরুত্ব, এমনকি মানুষের নিকট পৌছান অবস্থায়ও এর অবিকৃতির গুরুত্ব। অন্যকথায় ঃ ওহীর গ্রহণ ও পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে নবীগণের (আঃ) পবিত্রতার (عصمت) অপরিহার্যতা এবং তৎসম অপরের জন্যে তাঁদের নবুয়্যতের প্রমাণবহ পন্থার অনিবার্যতা।

বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে ওহী ও নবুয়্যতের মূল বিষয়সমূহের সমাধানের পর অন্যান্য বিষয়সমূহের পালা আসে। যেমন ঃ নবীগণের (আঃ) সংখ্যাধিক্য, ঐশী গ্রন্থসমূহ, সর্বশেষ নবী ও ঐশী গ্রন্থের নির্ধারণ, তদনুরূপ তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন।

কিন্তু এ বিষয়গুলোর সবগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করা সহজসাধ্য নয়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্ধৃতিগত (نقلي) ও বিশ্বাসগত (تعبدي) যুক্তির অবতারণা করা অনিবার্য।

কালামশাস্ত্রে গবেষণার পদ্ধতি ঃ

সাম্প্রতিক আলোচনার ভিত্তিতে দর্শন ও কালামশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্যগুলো সুস্পষ্ট হয়েছে। কারণ দর্শন শুধুমাত্র ঐ সকল বিষয় সম্পর্কেই আলোচনা করে থাকে, যেগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপাদনযোগ্য। অপরদিকে কালামশাস্ত্র ঐ বিষয়গুলোকেই সমন্বিত করে, যেগুলো উদ্ধৃতিগত ও বিশ্বাসগত যুক্তির সাহায্য ব্যতীত প্রতিপাদন যোগ্য নয়।

অন্যকথায় ঃ দর্শন ও কালামশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে

সম্পর্ক হল, ছেদক সম্পর্ক[১] (العموم والخصوص المطلق)। অর্থাৎ দর্শন ও কালামশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু কিছু অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও (যেগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ায় প্রমাণ করা হয়) উভয়েরই কিছু কিছু স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয় রয়েছে। তবে দর্শনের স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়গুলো বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতেই প্রমাণিত হয়, যা কালামশাস্ত্রের অন্তর্গত আলোচ্য বিষয়ের ব্যতিক্রম। কারণ কালামশাস্ত্রের বিষয়গুলো উদ্ধৃতিগত ও বিশ্বাসগত যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। মোদ্দাকথা কালামশাস্ত্রের গবেষণা পদ্ধতি হল যুগ্ম ও সমন্বিত পদ্ধতি। এ শাস্ত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতি যেমন প্রয়োগ হয়, তেমনি বিশ্বাসগত পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, দর্শন ও কালামশাস্ত্রের মধ্যে দু'টি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। যথা ঃ

১। উভয়েই অভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের (যেমন ঃ খোদা পরিচিতি) অধিকারী হলেও কিছু কিছু স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়ের অধিকারী, যেগুলো সংশ্লিষ্ট শাস্ত্র ভিন্ন অপরটির আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

২। দর্শনশাস্ত্রে সকল বিষয়কে বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করা হয়ে থাকে, যা কালামশাস্ত্রের ব্যতিক্রম -যেখানে কিছু কিছু বিষয় (যেমন ঃ দর্শন ও কালামশাস্ত্রের অভিন্ন বিষয়সমূহ) বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে, কিছু কিছু বিষয় (যেমন ঃ ইমামত) উদ্ধৃতিগত পদ্ধতিতে, আবার কিছু কিছু বিষয় (যেমন ঃ পুনরুত্থানের মূল বিষয়টি) উপরোল্লিখিত এ উভয় পদ্ধতিতেই প্রমাণ করা হয়ে থাকে।

স্মরণ থাকা প্রয়োজন যে, কালামশাস্ত্রের স্বতন্ত্র বিষয়সমূহ, যেগুলো উদ্ধৃতগত ও বিশ্বাসগত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হয়, সেগুলো এক শ্রেণীর নয়। বরং একশ্রেণীর বিষয়সমূহ, বিশেষকরে রাসুল (সঃ) এর উক্তি আচার-ব্যবহারের (সুন্নত) সত্যতা, প্রত্যক্ষভাবে পবিত্র কোরানের আয়াতসমূহের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে (অবশ্য বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে পবিত্র কোরানের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর)। অতঃপর অপর কিছু বিষয়, যেমন ঃ হযরত রাসুল (সঃ)

---

[১]। যদি দর্শন ও কালামশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলো যথাক্রমে A সেট ও B সেটের সদস্য হয়, তবে তাদের সম্পর্ককে $A \times B$ রূপে দেখানো যায়। অর্থৎ A সেটের কিছু কিছু সদস্য B সেটের সদস্যদের অনুরূপ, আবার কিছু কিছু ভিন্ন রকমের।

এর উত্তরাধিকারী নির্বাচন ও পবিত্র ইমামগণের (আঃ) বক্তব্যের সঠিকত্ব, মহানবী (সঃ) এর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়। এ ছাড়া অন্য আর এক শ্রেণীর বিষয়সমূহ, ইমামগণের (আঃ) বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়ে থাকে।

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, উদ্ধৃতিগত যুক্তির মাধ্যমে যে ফলাফল অর্জিত হয় তা একমাত্র তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন এগুলোর সনদ চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট হবে।

পাঠ – ২

মানুষের জন্যে ওহী ও নবুয়্যতের প্রয়োজনীয়তা

- নবীগণকে প্রেরণের আবশ্যকতা
- মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা
- নবীগণকে প্রেরণের উপকারিতা

নবীগণকে প্রেরণের আবশ্যকতা ঃ

এ বিষয়টি নবুয়্যতের আলোচনার মৌলিকতম বিষয় বলে পরিগণিত। এ বিষয়টিকে প্রমাণ করার জন্যে এমন একটি দলিলের অবতারণা করতে হবে, যা নিম্নলিখিত ভূমিকাত্রয়ের উপর নির্ভরশীল ঃ

১। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল এই যে, স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ড ও স্বীয় উৎকর্ষের পথ অতিক্রমের মাধ্যমে এমন চূড়ান্ত পূর্ণতা অর্জন করা, যা একমাত্র স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অর্থাৎ মানুষকে এ জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে মহান আল্লাহর উপাসনা ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহভাজন হতে পারবে, যা পরিপূর্ণ মানুষের জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রভুর প্রজ্ঞাপূর্ণ ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে মানুষের পূর্ণতা ও সৌভাগ্যকে সমন্বিত করেছে। কিন্তু মানুষের এ সমুন্নত ও অমূল্য সৌভাগ্য যেখানে স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ড ব্যতীত অর্জিত হয় না, সেখানে মানুষের জীবনপথ দু'ধারার সম্মুখে অবস্থান লাভ করেছে, যাতে তার জন্যে নির্বাচন ও মনোনয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং স্বভাবতঃই এদের একটি হল দুর্দশা ও শাস্তির পথ, যা সঙ্গত কারণেই (মৌলিকভাবে নয়) প্রভুর ইরাদার বিষয়ে পরিণত হয়।

এ ভূমিকাটি প্রভূর প্রজ্ঞা ও আদলের (প্রথম খণ্ডের ১১ ও ২০ নং পাঠ) আলোচনায় প্রসঙ্গতঃ সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

২। সচেতনভাবে স্বাধীন নির্বাচনের জন্যে, কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা ও বাস্তবে ঐ সকল কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত ক্ষেত্রের যোগান এবং ঐ গুলোর প্রতি আভ্যন্তরীণ ঝোঁক বা আকর্ষণ ছাড়াও সুকর্ম ও কুকর্ম, উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত পথের সঠিক পরিচিতির প্রয়োজন। মানুষ তখনই স্বীয় উৎকর্ষের পথকে স্বাধীন ও সচেতনভাবে নির্বাচন করতে পারবে, যখন এর উদ্দেশ্য ও এ উদ্দেশ্যে পৌঁছার পথ সম্পর্কে এবং এর উত্থান-পতন, ভাঙ্গা-গড়া ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবগত থাকবে। অতএব প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি হল, উল্লেখিত পরিচিতিসমূহ সম্পর্কে অবহিতকরণের জন্যে উপযুক্ত মাধ্যমকে মানুষের অধিকারে প্রদান করা। নতুবা এমন কারও মত হবে যে, কোন অতিথিকে অতিথিশালায় নিমন্ত্রণ করল, অথচ ঐ অতিথিশালায় পৌঁছার পথ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিল না। আর এ ধরনের আচরণ নিঃসন্দেহে প্রজ্ঞার পরিপন্থী ও অনাকাংখিত বলে পরিগণিত

হবে।

এ ভূমিকাটির সুস্পষ্ট এবং অধিকতর ব্যখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই ।

৩। ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের সাহায্যে অর্জিত মানুষের সাধারণ ও পারিপার্শিক পরিচিতি, জীবনের প্রয়োজনসমূহ মিটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সকল প্রকারের ব্যক্তিগত ও সামাজিক, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রকৃত কল্যাণ ও পূর্ণতার পথের শনাক্তকরণের জন্যে যথেষ্ট নয়। অতএব এ ঘাটতি পূরণের জন্যে যদি অপর কোন পথ না থাকত, তবে মানব সৃষ্টির পশ্চাতে প্রভুর উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটত না।

উপরোক্ত তিনটি ভূমিকা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, সার্বিক উৎকর্ষের পথ পরিচিতির জন্যে, ইন্দ্রিয় ও জ্ঞান ছাড়াও অপর একটি উপায় মানুষের অধিকারে অর্পণ করা প্রভুর প্রজ্ঞা বা হিকমতেরই দাবি; যাতে মানব সম্প্রদায় প্রত্যক্ষভাবে অথবা কোন ব্যক্তির মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে, এ থেকে লাভবান হতে পারে[১] আর তা হল ওহীর মাধ্যম, যা নবীগণের (সঃ) অধিকারে প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ও অন্যান্যরা তাঁদের মাধ্যমে তা থেকে লাভবান হয়ে থাকে। আর এভাবে মানুষ চূড়ান্ত পূর্ণতা ও কল্যাণের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

এ ভূমিকাত্রয়ের মধ্যে শেষোক্ত ভূমিকাটি সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকতে পারে। ফলে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে আরও অধিক ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজন মনে করছি, যাতে সার্বিক পূর্ণতার পথে মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ও ওহীর উপর তার নির্ভরশীলতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয়।

মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ঃ

সার্বিকভাবে জীবনের সঠিক কর্মসূচীর শনাক্তকরণের জন্যে মানব

---

[১]। এ দলিলটি তত্ত্বীয় বিষয় (বিদ্যমান) থেকে কার্যকরী বিষয়ের (করণীয়) ও কার্যের জন্যে কারণের অপরিহার্যতার যৌক্তিক প্রমাণের দৃষ্টান্তসমূহ থেকে অর্জিত ফলাফল ও অনূরূপ প্রভুর কারণত্বের প্রমাণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান।

অস্তিত্বের প্রারম্ভ ও তার অস্তিত্বের জন্যে সম্পন্ন ক্রিয়াদি, অন্যান্য অস্তিত্বশীলের সাথে তার যে সম্বন্ধ, একই শ্রেণীর ও অন্যান্য শ্রেণীর সৃষ্ট বিষয়াদির সাথে তার যে সম্পর্ক বিদ্যমান এবং তার কল্যাণ ও অকল্যাণের ক্ষেত্রে এ বহুবিধ সম্পর্কের যে প্রভাব ইত্যাদি সকল কিছু সম্পর্কে অবগত হওয়া অপরিহার্য। অনুরূপ বিভিন্ন প্রকার লাভ-ক্ষতি ও কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদির জ্ঞান লাভ ও মূল্যায়নের প্রয়োজন, যাতে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে বৈচিত্রময় বিশেষত্বের অধিকারী এবং বিভিন্ন পরিবেশ ও সমাজে বসবাসকারী মিলিয়ন মিলিয়ন সংখ্যক মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু এ সমস্ত বিষয়াদি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ একজন বা কয়েকজনের জন্যে শুধু দুঃসাধ্যই নয় বরং শত-সহস্র সংখ্যক মানবিক বিভাগে বিশেষজ্ঞ সমষ্টিও, এ ধরণের কোন জটিল সূত্রের আবিষ্কার এবং সুনির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত নিয়মরূপে উপস্থাপন করতে অক্ষম যাতে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, বস্তুগত, মানসিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধিত হতে পারে এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের সাংঘর্ষিক পর্যায়ে (যা অধিকাংশ সময়ই পরিদৃষ্ট হয়) অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণটি অগ্রাধিকার পেতে পারে। মানব সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে নিয়ম-নীতির পরিবর্তন ধারা শত-সহস্র বিশেষজ্ঞ ও গবেষকের সহস্রাব্দীর প্রচেষ্টা ও গবেষণার ফলেও যে অদ্যাবধি সঠিক, পরিপূর্ণ ও সার্বিক নিয়ম-ব্যবস্থার আবিষ্কারে অপারগ তা তারই প্রমাণবহ। অনুনরূপ নীতি প্রণয়নের বিশ্বসভায় সর্বদা নিজেদের গড়া বিধানের দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হয় এবং কোন না কোন ধারার রহিতকরণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংস্করণ ও পূর্ণতা বিধানে প্রয়াসী হয়।

আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবেনা যে, এ (প্রচলিত) বিধানসমূহের প্রণয়নেও প্রভুর নিয়ম ব্যবস্থা ও ঐশী বিধানের যথেষ্ট শরণাপন্ন হতে হয়েছে। অনুরূপ লক্ষ্যণীয় যে, পৃথিবীর সকল আইনবিদ ও নীতিনির্ধারকের সকল প্রচেষ্টা ও গুরুত্ব শুধুমাত্র পার্থিব ও সামাজিক কল্যাণকে ঘিরেই ছিল ও আছে এবং কখনোই পারলৌকিক কল্যাণ অথবা পার্থিব ও বস্তুগত লাভ-ক্ষতির বিষয়সমূহ বিবেচিত হয়নি ও হয় না। আবার এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বিবেচনা করতে চাইলেও কখনোই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পার্থিব ও বস্তুগত কল্যাণ-অকল্যাণকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত

চিহ্নিত করা গেলেও আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক কল্যাণের বিষয়াদি ঐন্দ্রিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নির্ধারণযোগ্য নয়। তদনুরূপ ঐ গুলোর যথাযথ মূল্যায়ন এবং বস্তুগত ও পার্থিব কল্যাণের সাথে বিরোধপূর্ণ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণটিকে শানাক্তকরণও সম্ভব নয়।

এানব প্রণীত প্রচলিত নিয়ম-নীতির আলোকে শত-সহস্রাব্দী পূর্ব মানুষের জ্ঞান সম্পর্কে কার্যকর ধারণা পাওয়া যেতে পারে এবং এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে, প্রাথমিক যুগের মানুষ জীবনের সঠিক কর্মসূচী বিধানের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের মানুষের চেয়ে অনেক অক্ষম ছিল। আবার যদি মনেও করা হয় যে, আধুনিক যুগের মানুষ সহস্র সহস্রাব্দীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সঠিক, পূর্ণ ও ব্যাপক বিধান ব্যবস্থার জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়েছে এবং এ বিধান ব্যবস্থাই পারলৌকিক ও অনন্ত সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম। তথাপি এ প্রশ্নের অবকাশ থাকে যে, ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় বিলয়ন বিলিয়ন মানুষকে তাদের অজ্ঞতার উপর ছেড়ে দেয়া কিরূপে প্রভুর প্রজ্ঞার সাথে ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে ?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সূচনালগ্ন থেকে শেষাবধি মানব সৃষ্টির পশ্চাতে বিদ্যমান উদ্দেশ্য তখনই বাস্তবায়নযোগ্য হবে যখন জীবনের বাস্তবতা এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্যে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি ভিন্ন অপর একটি মাধ্যমের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে। আর তা ওহী ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

প্রসঙ্গক্রমে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মানব সম্প্রদায়ের প্রথম ব্যক্তিও আল্লাহর নবী হবেন। যাতে জীবনের সঠিক কর্মসূচী সম্পর্কে তিনি পরিচিতি লাভ করতে পারেন এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্বয়ং তাঁর ক্ষেত্রেও বাস্তবায়িত হয় ও তৎপর অন্যান্য মানুষ তার মাধ্যমে হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। আর এটা উল্লেখিত প্রমাণেরই দাবি।

নবীগণকে প্রেরণের উপকারিতা ঃ

আল্লাহর নবীগণ মানুষের প্রকৃত পূর্ণতার সঠিক পথনির্দেশনা প্রদান এবং ওহী লাভ ও মানুষের নিকট তার প্রচার ছাড়াও মানুষের উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ

করা হল ঃ

১। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সেগুলোকে অনুধাবন করতে সক্ষম। কিন্তু হয় যথেষ্ট সময় ও অভিজ্ঞতার অভাবে অথবা বস্তুগত বিষয়াদির প্রতি গুরুত্বারোপ ও পাশবিক প্রবৃত্তির আধিক্যের কারণে এগুলো সম্পর্কে বিস্মৃত ও অজ্ঞতায় পতিত হয় কিংবা কুশিক্ষা ও অপপ্রচারের কারণে সেগুলো লোকচক্ষুর আড়ালে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ধরনের বিষয়াদিও নবীগণ কর্তৃক বিবৃত হয় এবং উত্তর উত্তর স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে সে গুলোর সার্বিক বিস্মৃতিতে বাধা প্রদান করা হয়। একই সাথে সঠিক ও যৌক্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভ্রমাত্মক যুক্তির অবতারণা ও কুশিক্ষাকে প্রতিরোধ করা হয়।

এখানেই নবীগণকে মুযাক্যির (مذكر = যিনি স্মরণ করিয়ে দেন), নাযির (نذير = ভয় প্রদর্শনকারী) এবং পবিত্র কোরানকে যিক্র (ذكر =স্মরণ), যিক্‌রা (ذكري) ও যিক্‌রাহ (ذكرة) নামকরণের স্বার্থকতা প্রতিপন্ন হয়ে থাকে।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আঃ) নবুয়্যতের রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে বলেন ঃ

ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكّروهم منسيّ نعمته و يحتجّوا عليهم بالتبليغ

অর্থাৎ মহান আল্লাহ স্বীয় পয়গাম্বরগণকে উত্তর উত্তর প্রেরণ করেছেন যাতে ফিতরাতের বিনিময়ে মানুষকে সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যের জন্য আহ্বান করতে পারেন, অজস্র বিস্মৃত নিয়ামতের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন এবং প্রচার ও সত্য বর্ণনা করে তাদের প্রতি দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারেন।

২। মানুষের পরিচর্যা, বিকাশ ও উৎকর্ষের ক্ষেত্রে আচরণগত আদর্শের অস্তিত্ব হল একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী, যার গুরুত্ব মনোবিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহর নবীগণ পরিপূর্ণ মানুষ ও ঐশী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হিসেবে সর্বোত্তমভাবে এ দায়িত্ব পালন করেন এবং মানুষকে বিভিন্ন মুখি শিক্ষা ও জ্ঞানদান ছাড়াও তাদের প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধিতেও ভূমিকা রাখেন। আমরা জানি যে, পবিত্র কোরানে 'প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধি' শব্দদ্বয় যুগ্মভাবে স্মরণ করা হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিশুদ্ধিকে (تذكية), এমনকি প্রশিক্ষণের (تعليم) উপরও অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

৩। মানব সমাজে নবীগণের উপস্থিতির অপর একটি সুফল হল, তাঁরা উপযুক্ত পরিস্থিতিতে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনগত নেতৃত্ব প্রদান করে থাকেন। নিঃসন্দেহে পবিত্র ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব হল, কোন সমাজের জন্যে মহান প্রভুর এক পরম অনুগ্রহ, যার মাধ্যমে নানা প্রকার সামাজিক অসঙ্গতি ও অনাচারের প্রতিরোধ করা হয় এবং সমাজ বিরোধ, বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলতা থেকে মুক্তি পায়। আর এ ভাবেই সমাজ বাঞ্ছিত পূর্ণতা ও উৎকর্ষের দিকে পরিচালিত হয়।

পাঠ – ৩

কয়েকটি প্রশ্নের জবাব

- অধিকাংশ মানুষ কেন নবীগণ কর্তৃক হিদায়াত প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন?
- মহান আল্লাহ কেন বিরোধ ও বিচ্যুতির পথ রোধ করেন নি?
- নবীগণ কেন প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন না ?

কয়েকটি প্রশ্নের জবাব ঃ

নবুয়্যতের অপরিহার্যতা সম্পর্কে যে প্রমাণটি উপস্থাপন করা হয়েছে তার উপর একাধিক প্রশ্ন ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকতে পারে। এখন আমরা সেগুলোর অবতারণা ও উত্তর দানের চেষ্টা করব ঃ

১। যদি মহান আল্লাহর প্রজ্ঞার দাবি এটাই হয় যে, নবীগণের নবুয়্যতের মাধ্যমে সকল মানুষ হিদায়াত প্রাপ্ত হবে, তবে কেন তাদের সকলেই এক বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানে প্রেরিত হয়েছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থান এ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে? বিশেষ করে প্রাচীনকালে যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সংবাদ আদান-প্রদানের মাত্রা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ, ধীর গতির এবং সম্ভবতঃ এমন কোন জাতি বা গোষ্ঠী থাকতে পারে যারা নবীগণের আহ্বান সম্পর্কে কোনভাবেই অবগত ছিল না।

জবাব ঃ প্রথমতঃ নবীগণের আবির্ভাব কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল না এবং পবিত্র কোরানের আয়াত থেকে আমরা এ প্রমাণ পাই যে, প্রতিটি গোত্র ও জাতির জন্যেই কোন না কোন নবী ছিলেন। যেমন ঃ

وان من امّة الا خلا فيها نذير

এবং এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সর্তককারী প্রেরিত হয়নি। (সূরাঃ ফাতির - ২৪)

অনুরূপ,

و لقد بعثنا في كلّ امّه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت

এবং আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্যে আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরাঃ নাহ্‌ল- ৩৬)

পবিত্র কোরানে যদিও মুষ্টিমেয় কিছু নবীগণের (আঃ) নাম উল্লেখ হয়েছে, তবে তার অর্থ এ নয় যে, নবীগণের সংখ্যাও তা-ই ছিল। বরং স্বয়ং পবিত্র কোরানেই সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, এমন অনেক নবী ছিলেন যাদের নাম এ পবিত্র কিতাবে উল্লেখ হয়নি। যেমন ঃ

ورسلالم نقصصهم عليك

এবং অনেক রাসুল যাদের কথা তোমাকে বলিনি। (সূরা ঃ নিসা ১৬৪)

দ্বিতীয়ত ঃ উল্লেখিতি প্রমাণটির দাবি ছিল এই যে, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি বহির্ভূত অপর কোন মাধ্যমও থাকা উচিৎ, যার মাধ্যমে মানুষ হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। কিন্তু হিদায়াত প্রাপ্তি দু'টি শর্তে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাস্তবরূপ লাভ করে থাকে। একটি হল ঃ ব্যক্তি স্বয়ং প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত এ নিয়ামত বা অনুগ্রহ থেকে লাভবান হতে চাইবেন। অপরটি হল ঃ অন্যরা এ হিদায়াতের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না। অধিকাংশ মানুষ স্বেচ্ছাচারিতার কারণে হিদায়াত প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তেমনি অপর সিংহভাগ আবার প্রচারের প্রসারে প্রতিবন্ধকতার ফলে বঞ্চিত হয়েছেন। আমরা জানি আল্লাহর প্রেরিত পূরুষগণ এ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্যে সদা সচেষ্ট ছিলেন এবং আল্লাহর শত্রুদের সাথে, বিশেষ করে শক্তিধর ও দাম্ভিকদের সাথে সংগ্রামরত ছিলেন। আর আল্লাহর বাণী প্রচার ও মানুষকে হিদায়াতের পথে নবীগণের মধ্যে অনেকেই নিজ জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে যদি অনুসারী ও সহযোগী সংগ্রহ করতে পারতেন তবে অত্যাচারী ও স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আর এ অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শ্রেণীই হল দ্বীনের প্রসারের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, মানবীয় উৎকর্ষের পথ স্বাধীন নির্বাচনাধীন হওয়ার অপরিহার্য অর্থ হল ঃ এ সকল ঘটনাগুলো এমনভাবে রূপ পরিগ্রহ করবে যে, সুপথ ও কুপথের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে। তবে স্বৈরাচারী ও মিথ্যাবাদীর প্রভাব যদি এমন স্থানে পৌঁছে যে, অপরের হিদায়াতের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং কোন সমাজে সত্যের আলোকবর্তিকা সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হয়ে যায় তবে ঐ অবস্থায় মহান আল্লাহ কোন না কোন অদৃশ্য উপায়ে ও অসাধারণ পথে সত্যের অনুসারীগণকে সাহায্য করে থাকেন।

সিদ্ধান্ত ঃ যদি এ ধরনের কোন প্রতিবন্ধকতা নবীগণের (আঃ) প্রচারের পথে না থাকত তবে তাঁদের আহ্বান সকল বিশ্ববাসীর কর্ণগোচর হত এবং ওহী ও নবুয়্যতের মাধ্যমে এ হিদায়াতের ঐশী অনুগ্রহ থেকে উপকৃত হত। অতএব অধিকাংশ মানুষের হিদায়াত প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার অপরাধ তাদের উপরই বর্তায়, যারা নবীগণের আহ্বানের এবং প্রচার ও প্রসারের পথে বাধাঁ সৃষ্টি

করেছিল।

২। যদি নবীগণ মানব সম্প্রদায়ের উৎকর্ষের পথকে সুগম করার জন্যে নবুয়্যত লাভ করে থাকেন তবে কেন তাঁদের আগমন সত্ত্বেও এত অপরাধ ও অনাচারের উদ্ভব হয়েছে এবং অধিকাংশ মানুষ অধিকাংশ সময়ই কুফর ও গুণাহে লিপ্ত হয়েছে; এমনকি ঐশী ধর্মসমূহের অনুসারীদের পরস্পরের মধ্যেও শত্রুতা ও বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে এবং রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে? মহান প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি কি এটা ছিল না যে, মহান আল্লাহ অন্য কোনভাবে এ সকল অনাচার ও বিশৃংখলার পথ রোধ করবেন যাতে ন্যূনতমপক্ষে ঐশীধর্মসমূহের অনুসারীগণ পরস্পর কলহে লিপ্ত না হয়?

জবাব ঃ মানুষের স্বাধীন বিশেষত্বযুক্ত উৎকর্ষের উপর চিন্তা করলে উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। কারণ, যেমনটি বলা হয়েছে যে, প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি হল স্বাধীনভাবে (বাধ্যতামূলক নয়) উৎকর্ষ লাভের সকল ক্ষেত্র ও শতের্র যোগান দিবেন যাতে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ সত্যপথ শনাক্ত করতঃ সে পথ পরিক্রমণের মাধ্যমে উৎকর্ষ ও সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। কিন্তু এ ধরনের উৎকর্ষের জন্যে শর্ত ও কারণের উপস্থিতির অর্থ এ নয় যে, সকল মানুষ ঐগুলোর সদ্ব্যবহার করে বাধ্যতামূলক সঠিক পথ বেছে নিবে। পবিত্র কোরানের ব্যাখ্যানুসারে, মহান আল্লাহ মানব সম্প্রদায়কে সঙ্গত শর্তেই এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন যে, তাদের মধ্যে কারা উত্তম কর্ম সম্পাদন করে তা পরীক্ষা করবেন।[১] অনুরূপ পবিত্র কোরানে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, যদি মহান আল্লাহ চাইতেন তবে সকলকেই সরল পথে পরিচালনা করতে পারতেন এবং বিচ্যুতি ও বক্রতার পথকে সম্পূর্ণরূপে রোধ করতে পারতেন।[২] কিন্তু এ অবস্থায় নির্বাচনের কোন সুযোগই অবশিষ্ট থাকত না এবং মানুষের আচরণ মানবিক মূল্যবোধ বর্জিত হত। আর সেই সাথে স্বাধীন ও নির্বাচন ক্ষমতার অধিকারী মানব সৃষ্টির পথে প্রভুর উদ্দেশ্য ব্যাহত হত।

সিদ্ধান্ত ঃ অন্যায়, ব্যভিচার, কুফর ও গুণাহের প্রতি মানুষের ঝোঁক

১। সূরা হুদ-৭, সূরা কাহাফ-৭, সূরা মূলক-২, সূরা মায়িদাহ-৪৮, সূরা আনা'ম-১৬৫।

২। সূরা আনা'ম- ৩৫, ১০৭, ১১২,১৩৭,১২৮, সূরা ইউনুছ -৯৯, সূরা হুদ-১১৮, সূরা নাহল - ৯, ৯৩ সূরা শূরা-৮, সূরা শুয়ারা- ৪, সূরা বাকারা - ২৫৩।

হল ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতারই প্রমাণবহ। আর এ ধরনের অসদাচরণের ক্ষমতা তার সৃষ্টি রহস্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এবং ঐগুলোর আনুসঙ্গিক ফলাফল, তাদেরই অনুগামী। প্রভুর ইরাদা মূলতঃ মানুষের উৎকর্ষকেই সমন্বিত করলেও, যেহেতু এ সমন্বয় স্বাধীনতার শর্তাধীন, সেহেতু স্বেচ্ছাচারিতা থেকে উৎসারিত অধঃপতন ও বিচ্যুতিকে প্রতিহত করে না। সর্বোপরি প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি এ নয় যে, চাক বা না চাক স্বীয় চাওয়া পাওয়া ও ইরাদার বিরুদ্ধে সঠিক পথে পরিচালিত হবে ।

৩। প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি হল এই যে, মানব সম্প্রদায় অধিকতর ও উত্তমরূপে উৎকর্ষ ও সৌভাগ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। তাহলে এটাই কি শ্রেয়তর নয় যে, মহান আল্লাহ প্রকৃতির রহস্যসমূহকে ওহীর মাধ্যমে মানুষের নিকট প্রকাশ করবেন যাতে বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত লাভ করে মানুষ স্বীয় উৎকর্ষের পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে? যেমনকরে গত কয়েক শতাব্দীতে অনেক প্রাকৃতিক শক্তি, কারণ ও দৈনন্দিন সামগ্রীর আবিষ্কার সভ্যতার বিকাশে বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করেছে এবং শারীরিক সুস্থতা ও বিভিন্ন ব্যাধির বিরুদ্ধে সংবাদ বিনিময়, যোগযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও অমূল্য পরিবর্তন এনেছে। এটা অনস্বীকার্য যে, নবীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের মাধ্যমে ও সুখ-শান্তির উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে যদি মানুষকে সাহায্য করতেন তবে নিজেদের সামাজিক প্রভাব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উত্তমরূপে তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারতেন।

জবাব ঃ ওহী ও নবুয়্যতের মূল প্রয়োজন ঐ সকল ক্ষেত্রেই, যেখানে মানুষ পরিচিতির সাধারণ মাধ্যম দ্বারা ঐগুলোকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয় এবং ঐগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ফলে প্রকৃত উৎর্ষের পথ নির্ধারণ করে সে পথ পরিক্রমণে অপারগ হয়। অন্যকথায় ঃ নবীগণের (আঃ) মূল দায়িত্ব এই যে, মানব সম্প্রদায়কে সঠিক দিকনির্দেশনা পাবার ও উৎকর্ষ লাভের পথে সহায়তা করা যাতে সর্বাবস্থায় স্বীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছতে তাদের সকল শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করতে সক্ষম হয় –হোক সে যাযাবর সম্প্রদায় ও খিমাবাসী কিংবা হোক মহাসাগর অভিযাত্রী ও মহাকাশচারী। কিন্তু তাদেরকে মানুষের প্রকৃত মূল্যবোধসমূহ সম্পর্কে জানতে হবে। জানতে হবে মহান আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের কী কর্তব্য রয়েছে,

কী দায়িত্ব রয়েছে তাদের পরস্পরের প্রতি কিংবা স্বগোত্রের ও অন্য গোত্রের সৃষ্টের প্রতি, যাতে ঐ কর্তব্যগুলো যথাস্থানে সম্পাদনের মাধ্যমে প্রকৃত উৎকর্ষ ও অনন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে। অপরদিকে শক্তি ও সামর্থ্যের বিভিন্নতা, প্রাকৃতিক ও প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা কোন বিশেষ সময়ে বা বিভিন্ন কালে, কোন বিশেষ কারণানুসারে প্রকাশ লাভ করে এবং প্রকৃত উৎকর্ষ ও চিরন্তন ভাগ্যলিপির ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে না। যেমন ঃ আজকের যুগের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বস্তুগত ও পার্থিব উন্নয়নের কারণ হলেও, মানুষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলেনি। বরং নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, এ কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি হল এই যে, মানব সম্প্রদায় বস্তুগত বৈভবসমূহকে ব্যবহার করে পার্থিব জীবন নির্বাহ করবে এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ওহীর মাধ্যমে স্বীয় পরিক্রমণের পথকে প্রকৃত উৎকর্ষ ও চিরন্তন সৌভাগ্যের দিকে পরিচালিত করবে। কিন্তু শারীরিক ও আত্মিক সামর্থ্যের বিভিন্নতা; অনুরূপ প্রাকৃতিক ও সামাজিক শর্তসমূহের বৈচিত্রময়তা; তদনুরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান থেকে লাভবান হওয়ার ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্রিকতা ইত্যাদি একাধিক কারণ ও সুনির্দিষ্ট শর্তের অধীন, যা কার্যকারণ বিধি মোতাবেক উৎপত্তি লাভ করে। আর এ বিভিন্নতা, মানুষের চিরন্তন ভাগ্যলিপি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করে না । বরং তা কতইনা উত্তম যে, কোন ব্যক্তি বা সমষ্টি এক অনাড়ম্বর জীবনাতিবাহিত করেছেন এবং বৈষয়িক ও পার্থিব বৈভব থেকে ন্যূনতম স্বাদ গ্রহণ করেছেন। আর এমতাবস্থায় উৎকর্ষ ও সৌভাগ্যের সমুন্নত শিখরে স্থান লাভ করেছেন। অপরদিকে কতইনা হতভাগ্য সে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর, যারা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও জীবন উপকরণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অকৃতজ্ঞতা, দাম্ভিকতা ও অপরের প্রতি অত্যাচার ও অন্যায়ের ফলে নিকৃষ্টতম নরকে পতিত হয়েছে।

তবে আল্লাহ প্রেরিত পুরুষগণ মূল দায়িত্ব পালন (অর্থাৎ প্রকৃত উৎকর্ষ ও অনন্ত সৌভাগ্যের পথে পরিচালনা) ব্যতীত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় পার্থিব জীবন-যাপনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন এবং যেখানেই প্রভুর প্রজ্ঞা প্রয়োজন মনে করেছে সেখানেই কিছুটা হলেও অজ্ঞাত বাস্তবতা ও রহস্যের পর্দা উন্মোচন করেছে, যেমনটি হযরত দাউদ (আঃ), সোলায়মান (আঃ) ও

যুলক্বারনাইনের (আঃ) জীবদ্দশায় পরিলক্ষিত হয়।[1] এ ছাড়া আল্লাহর নবীগণ সমাজের তত্ত্বাবধান ও সফলভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রেও সচেষ্ট ছিলেন -যেমনটি হযরত ইউসূফ (আঃ) মিশরে সম্পাদন করেছিলেন।[2] কিন্তু এ সমুদয় কর্মের সবগুলোই ছিল তাঁদের মূল দায়িত্ব ভিন্ন বাড়তি খেদমত ।

অনুরূপ আল্লাহর নবীগণ তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কোন বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রয়োগ করেননি সেক্ষেত্রে বলতে হয় ঃ নবীগণের (আঃ) মূল লক্ষ্য (যেমনটি ইতিপূর্বেও একাধিকবার বলা হয়েছে) সচেতন ও স্বাধীনভাবে নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। আর যদি বল প্রয়োগের মাধ্যমে বিপ্লব করতে চাইতেন তবে মানুষের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক বিকাশলাভ ও স্বাধীনভাবে উৎকর্ষ লাভ ঘটত না। বরং জনগণ শক্তি ও চাপের নিকট আত্মসমর্পণ করে তাদের অনুসরণ করত -- প্রভুর প্রতি অনুরাগবশতঃ ও স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে নয়। আমীরুল মু'মেনীন আলী (আঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

যদি মহান আল্লাহ চাইতেন তবে নবীগণের আবির্ভারের সময় তাঁদের জন্যে স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণিমুক্তার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিতেন, ফল-মূলে পরিপূর্ণ বাগান তাদের অধিকারে প্রদান করতেন এবং আকাশে উড্ডয়নরত পক্ষীকুল ও ভূমিতে বিচরণরত সকল কিছুকেই তাঁদের সেবায় নিয়োজিত করতেন। আর যদি তা-ই করতেন তবে পরীক্ষা ও পুরস্কারের ক্ষেত্র ব্যাহত হত এবং যদি চাইতেন নবীগণকে এমন দুর্লভ ক্ষমতা ও অটুট সম্মান, রাজ্য ও শাসনক্ষমতার অধিকারী করতেন যে, অন্যান্যরা লোভ ও ভীতির বশবর্তী হয়ে তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করবে এবং দাম্ভিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে দূরে থাকবে, তবে ঐ অবস্থায় প্রবৃত্তি ও মূল্যবোধসমূহ এক সমান হত। কিন্তু মহান আল্লাহ এমনটি চেয়েছেন যে, নবীগণের (আঃ) অনুসরণ, তাঁদের কিতাবসমূহকে স্বীকার করা ও তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ নিখুঁতভাবে ও একমাত্র খোদাপ্রীতির ফলেই ঘটবে। আর পরীক্ষা যত বৃহত্তর হবে, প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার ও প্রতিদানের

১। সূরা আম্বিয়া- (৭৮-৮২), সূরা কাহাফ (৮৩-৯৭), সূরা ছাবা (১০- ১৩) উল্লেখ্য কয়েকটি রেওয়ায়েত অনুসারে, যুলক্বারনাইন নবী ছিলেন না বরং আল্লাহর ওলী ছিলেন বলে জানা যায়।
২। সূরা ইফসুফ – ৫৫

পরিমাণও ততবেশী বৃদ্ধি পাবে।[১] তবে যদি কোন জনসমষ্টি স্বাধীন নির্বাচন ও অনুরাগের বশবর্তী ও সত্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আল্লাহর অনুগত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং ঐশী উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যে বিশেষ করে অন্যায়, অত্যাচার নির্মূল করার জন্য ও মু'মেনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্যে বিভিন্ন শক্তি ও প্রতিপত্তির আশ্রয় নেয়, তবে তা অনাকাংখিত হবে না; যার উদাহরণ হযরত সোলায়মানের (আঃ) শাসন ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। ২

১। নাহ্জুল বালাগাহ্ খোতবায়ে ক্বাসেয়াহ, সূরা যোখরোফ -(৩১ -৩৫)।
২। সুরা আম্বিয়া-(৮১-৮২), সূরা নামল-(১৫-৪৪)।

পাঠ – ৪

নবীগণের পবিত্রতা

- ওহী যে কোন প্রকার বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষিত থাকার অপরিহার্যতা
- অন্যান্য ক্ষেত্রে পবিত্রতা
- নবীগণের পবিত্রতা

ওহী যেকোন প্রকার বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষিত থাকার অপরিহার্যতা ঃ

প্রয়োজনীয় পরিচিতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধ তার ঘাটতি পূরণের জন্যে ওহীর অপরিহার্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর, অন্য একটি বিষয়ের অবতারণা হয়ে থাকে। আর তা নিম্নরূপ ঃ

যেহেতু সাধারণ কোন মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিতির এ মাধ্যম থেকে লাভবান হওয়া সম্ভব নয় বা প্রভুর পক্ষ থেকে ওহী লাভ করার কোন যোগ্যতা ও ক্ষমতা তাদের নেই, পবিত্র কোরাণ এ প্রসঙ্গে বলে ঃ

و ما كان الله ليطلعكم على الغيب و لكنّ الله يجتبي من رسله من يشاء

অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদেরকে অবহিত করবেন না; তবে আল্লাহ্ তার রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। (সূরা আলে ইমরান - ১৭৯)

সেহেতু আল্লাহর বাণী বিশেষ ব্যক্তিবর্গের (নবীগণ) মাধ্যমে মানুষের নিকট পৌঁছানো অনিবার্য। কিন্তু এ ধরণের বাণীর সত্যতার কী নিশ্চয়তা রয়েছে কোথা থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারব যে, স্বয়ং পয়গাম্বর (আঃ) সঠিকভাবে উক্ত ওহী গ্রহণ ও মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন? অনুরূপ যদি আল্লাহ এবং নবীর মধ্যে কোন মাধ্যমের অস্তিত্ত্ব থাকে তিনি ও সঠিকরূপে এ ওহী বহন করেছেন, তার কী নিশ্চয়তা রয়েছে? কারণ ওহীর মাধ্যম তখই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে ও মানুষের জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ করতে পারবে যখন তা প্রেরণের পর্যায় থেকে শুরূ করে মানুষের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত যে কোন প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষিত থাকবে। নতুবা মাধ্যমের ভুল-ভ্রান্তি ও অসারতার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং এর বিশ্বস্ততা হারানোর কারণ হয়। অতএব কোন পথে এ নিশ্চয়তা পাওয়া যেতে পারে যে, আল্লাহর বাণী সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক রূপে মানুষের নিকট পৌঁছেছে ?

ওহীর স্বরূপ যখন মানুষের নিকট অজ্ঞাত থাকে এবং ওহী লাভের জন্যে যখন কোন যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা তার না থাকে, নিঃসন্দেহে তখন কাজকর্মের সঠিকতার জন্যে নিয়ন্ত্রন ও তত্ত্বাবধানের কোন পন্থা থাকে না। শুধুমাত্র ঐ অবস্থায়ই বুঝতে পারবে যে বিষয়বস্তুতে কোন ব্যতিক্রম রয়েছে যখন তা নিশ্চিত বুদ্ধিবৃত্তিক নিয়মের পরিপন্থী হবে। যেমন ঃ কেউ দাবি করল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নিকট বাণী এ সেছে যে, বিপ্রতী পদ্বয়ের সমষ্টি বৈধ বা

অনিবার্য কিংবা (আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন) আল্লাহর পবিত্র সত্তার এশধিকত, যৌগিকত ও বিলুপ্তি সম্ভব ইত্যাদি। তবে বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চিত রূপে এগুলোর বাতুলতা প্রমাণ করতঃ তার দাবির অসারতা প্রতিপন্ন করতে সক্ষম। কিন্তু ওহীর প্রয়োজনীয়তা ঐ সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যক্ত হয়, যেখানে বুদ্ধিবৃত্তি ঐ বিষয়গুলোকে প্রমাণ করার কোন পথ খুঁজে না পায় এবং বিষয়বস্তুর মূল্যায়ণের মাধ্যমে ঐ গুলোর সত্যতা বা অসত্যতা নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়। আর এ সকল ক্ষেত্রে কোন পথে ওহীর বিষয়বস্তুর সত্য প্রমান এবং ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষিত বলে প্রতিপাদন করা যেতে পারে ?

জবাব ঃ যেমনিকরে প্রভুর প্রজ্ঞাকে বিবেচনা করে বুদ্ধিবৃত্তি (দ্বিতীয় খণ্ডের ২ নং পাঠে উপস্থাপিত দলিল অনুসারে) অনুধাবন করতে পারে যে, বাস্তবতা সম্পর্কে পরিচিত লাভ ও কর্তব্য নির্ধারণ করার জন্যে অন্য কোন পন্থা থাকতে হবে –যদিও এর স্বরূপ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞাতব্য না হয়। আর এ ভাবেই বুদ্ধিবৃত্তি উপলব্ধি করে যে, আল্লাহর বাণী নির্ভুল ও অবিচ্যুত অবস্থায় মানুষের নিকট পৌঁছবে –এটাই হল মহান প্রভুর প্রজ্ঞা বা হিকমাতের দাবি। নতুবা উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

অন্যভাবে বলা যায় ঃ আল্লাহর বানী এক বা একাধিক মাধ্যমে মানুষের নিকট পৌঁছানো উচিৎ যাতে স্বাধীন ভাবে উৎকর্ষ লাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় ও মান সৃষ্টির পশ্চাতে বিদ্যমান প্রভুর উদ্দেশ্য বাস্তুব রূপ লাভ করতে পারে – এ বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার পর প্রভুর পূর্ণতম গুণের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকার বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষিত থাকবে। কারণ যদি মহান আল্লাহর কামনা এই না হয় যে, তাঁর বাণীসমূহ নির্ভুল ও সঠিকভাবে বান্দাদের নিকট পৌঁছবে, তবে তা তাঁরই প্রজ্ঞার পরিপন্থী হবে। আর প্রভুর প্রজ্ঞাময় ইরাদা এটাকে অস্বীকার করে। আবার যদি মহান আল্লাহ অবগত না থাকেন যে, স্বীয় বাণীকে কোন পথে ও কায় মাধ্যমে প্রেরণ করবেন যাতে নির্ভুল ও অবিচ্যুত অবস্থায় মানুষের নিকট পৌঁছবে, তবে তা তাঁর অশেষ জ্ঞানের পরিপন্থী হবে। অনুরূপ যদি কোন উপযুক্ত মাধ্যম নির্বাচন করতে ও তাকে শয়তানী আক্রমণ থেকে রক্ষতরতে ব্যর্থ হন,তবে তা তাঁর অসীম ক্ষমতার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হবে না।

অতএব মহান আল্লাহ যেহেতু সব কিছুর উপর জ্ঞান রাখেন, সেহেতু এটা অসম্ভব যে, এমন কোন মাধ্যম নির্বাচন করেছেন যে, তার ভুল-ক্রটি সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না। পবিত্র কোরানে এ সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে যে,

الله اعلم حيث يجعل رسالته

আল্লাহ তাঁর রিসালাতের ভার কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভাল জানেন। (সূরা আন্‌আম – ১২৪)

অনুরূপ প্রভুর অসীম পরাক্রমের কথা বিবেচনা করলে এ সম্ভাবণা ও থাকে না যে, তিনি তাঁর বাণীকে শয়তানের প্রভাব থেকে সংরক্ষণ করতে অপারগ ছিলেন। পবিত্র কোরনা এ সম্পর্কে বলে ঃ

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احداً. الا من ارتضى من رسول فانّه يسلك من بين يديه و من خلفه رصداً. ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربّهم و احاط بما لديهم واحصى كلّ شيء عدداً.

তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন কিনা তা জানার জন্য; রাসূলগণের নিকট যা আছে তা তাঁর জ্ঞানগোচরে এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন। (সূরা জিন্ন ২৬ - ২৮)

তাদনুরূপ প্রভুর প্রজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, তিনি চাননি, তাঁর বাণীকে ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষণ করতে, এ কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। পবিত্র কোরাণের বাণী এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ঃ

ليهلك من هلك عن بيّنة و يحيى من حيّ عن بينة

যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্যসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে। (সূরা আনফাল – ৪২)

অতএব প্রভুর জ্ঞান, ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার দাবি এই যে, মহান আল্লাহ স্বীয় বাণীকে সঠিক ও অবিচ্যুত অবস্থায় মানুষের নিকট পৌঁছে দিবেন। আর এভাবে ওহীর অবিচ্যুত ও সংরক্ষিত থাকা, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিপন্ন হল।

উল্লেখিত যুক্তির মাধ্যমে ফেরেস্তাগণ অথবা ওহী বহনকারী ফেরেস্তাগণ পবিত্র ওহীর গ্রাহক হিসেবে নবীগণের পবিত্রতা প্রমাণিত হয়। তদনূরূপ ওহী প্রচারের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃদ যে কোন প্রকার ভুল-ক্রটি থেকে তাদের সংরক্ষিত থাকার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়। অপরদিকে ওহী বহণকারী ফেরেস্তার বিশ্বস্ততা, আল্লাহর আমানত রক্ষায় তার পারংগমতা, শয়তানদের প্রভাবকে প্রতিহত করা, নবীগণের বিশ্বস্ততা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি মানুষের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত ওহীর পবিত্রতার সংরক্ষণের ব্যাপারে কোরানের গুরুত্তারোপের বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।[১]

অন্যান্য ক্ষেত্রে পবিত্রতা ঃ

উল্লেখিত যুক্তির ভিত্তিতে ফেরেস্তাগণ ও নবীগণের (আঃ) যে পবিত্রতা প্রতিপন্ন হয়েছে তা ওহীর প্রাপ্তি ও প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পবিত্রতা প্রমানের জন্যে আরো কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলো এ বিভক্ত করা যায় ঃ

১। ফেরেস্তাগণের পবিত্রতা সংক্রান্ত বিষয়

২। নবীগণের পবিত্রতা সংক্রান্ত বিষয়

৩। অন্যান্য কিছু ব্যক্তিবর্গের পবিত্রতা সংক্রান্ত বিষয়, যেমন ঃ পবিত্র ইমামগণ(আঃ) ফাতিমা যাহ্‌রা সালামুল্লাহ আলাইহা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের পবিত্রতা।

ওহী গ্রহণ ও বহনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে ফেরেস্তাগণের পবিত্রতার ব্যাপারে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ একটি হল ঐ সকল ক্ষেত্রে ওহীর ফেরেস্তাগণের পবিত্রতা, যা ওহীর গ্রহণ ও পৌঁছানোর সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এবং আপরটি হল অন্যান্য ফেরেস্তাগণ, যাদের ওহী সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে কোন প্রকারের সংশ্লিষ্টতা নেই। যেখন ঃ রিয্‌ক সংশ্লিষ্ট আ'যল লিপিবদ্ধ করণ সংশ্লিষ্ট, রূহ পুর্ণগ্রহণ সংশ্লিষ্ট ইত্যাদি ফেরেস্তাগণ।

১। সূরা শুয়ারা-১৯৩; সূরা তাক্‌বির-২১; সূরা আ'রাফ-৬৮; সূরা শু'য়ার-১০৭, ১২৫, ১৪৩, ১৬২, ১৭৮; সূরা দোখান-১৮; সূরা তাকবির-২০; সূরা নাজম-৫; সূরা আলহাক্কাহ (৪৪- ৪৭); সূরা জিন্ন (২৬ - ২৮)।

রিসালাত সংশ্লিষ্ট নয় এমন সকল বিষয়ে নবীগণের পবিত্রতার ক্ষেত্রে ও দু'টি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য ঃ একটি হল সকল প্রকার ইচ্ছাকৃত গুনাহ থেকে নবীগণের পবিত্রতা সংক্রান্ত ব্যাপার অপরটি হল যে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি থেকে তাঁদের পবিত্র সংক্রান্ত ব্যাপার। ঠিক এ দু'টি বিষয়কেই নবী নন এমন কারও ক্ষেত্রেও আলোচনা করা যেতে পারে।

যা হোক ওহীর গ্রহণ ও বহণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে ফেরেস্তাগণের পবিত্রতার বিষয়টি তখই বুদ্ধিবৃত্রিক দলিলের মাধ্যমে প্রতিপাদনযোগ্য হবে যখন ফেরেস্তাগণের স্বরূপ সম্পর্কে জানা যাবে। কিন্তু তাঁদের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা যেমন সহজসাধ্য নয়; তেমনি তা এ আলোচ্য বিষয়ের সংশ্লিষ্ট ও নয়। এ দৃষ্টিকোন থেকে শুধুমাত্র ফেরেস্তাগণের পবিত্রতার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনকারী পবিত্র কোরানের দু'টি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েই তুষ্ট থাকব। যথা ঃ

بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون

তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে ভাগে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। (সূরা আম্বিয়া-২৬, ২৭)

لايعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون

(ফেরেস্তাগণ) যারা অমান্য করে না, আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে। (সূরা তাহরীম – ৬)

উক্ত আয়াতদ্বয় এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, ফেরেস্তাগণ আল্লাহর সম্মানিত বান্দা যারা শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশেই তাদের কর্ম সম্পাদন করেন এবং কখনোই তাঁর আদেশ লংঘন করেন না। যদিও সকল ফেরেস্তার ক্ষেত্রে উক্ত আয়াতদ্বয়ের সার্বজনীন তার ব্যাপারটি আলোচনা ও পর্যালোচনার দাবি রাখে, তবু ঐগুলো ফেরাস্তাগণের পবিত্রতাকে প্রতিপাদন করে।

নবীগণ ব্যতীত অন্য মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিবর্গের পবিত্রতার ব্যাপারটি ইমামতের আলোচনার সাথে অধিকতর সাযুজ্যপূর্ণ। এ দৃষ্টিকোন থেকে এ খানে আমরা নবীগনের পবিত্রতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের আলোচনায় মনোনিবেশ করব। যদি ও এ বিষয়গুলোর কোন কোন টিকে শুধুমাত্র উদ্ধৃতিগত ও বিশ্বাসগত

দলিলের মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে কিতাব ও সুন্নাহর প্রমাণিত হওয়ার পরই এর অবতারণা করা উচিৎ কিন্তু আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্যে ঐগুলোকে এখানেই আলোচনা করব। তবে কিতাব ও সুন্নাহর বৈধতাকে মূল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে যথাস্থানে তা প্রতিপান করব।

নবীগনের পবিত্রতা ঃ

গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে নবীগণ কতটা পবিত্র সে সম্পর্কে মুসলমানদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিশ্বাস যে, নবীগন। দ্বাদশ ইমামিয়া শিয়াদের বিশ্বাস যে, নবীগণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ছোট বড় সকল গুনাহ থেকে পবিত্র এবং এমনকি ভুলক্রমেও তাদের দ্বারা কোন প্রকার গুনাহ সংঘটিত হয় না। কিন্তু কোন কোন গোষ্ঠীর মতে নবীগণ শুধুমাত্র বড় গুণাহসমূহ থেকে পবিত্র, আবার কেউ কেউ বয়ঃপ্রাপ্তি (بلوغ) থেকে পবিত্র মনে করেন, কেউবা আবার নবুয়্যত লাভ থেকে। সুন্নী সম্প্রদায়ের (হাশভিয়্যাহ ও কোন কোন আহলে হাদীস) কোন কোন গোষ্ঠী মূলত ঃ নবীগণের পবিত্রতাকেই অস্বীকার করেছেন এবং যে কোন প্রকারের গুনাহে লিপ্ত হওয়াকে এমনকি নবুয়্যতের সময় ও ইচ্ছাকৃতভাবেও সম্ভব বলে মনে করেছেন।

নবীগণের পবিত্রতাকে প্রমান করার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা প্রয়োজন মনে করি ঃ

প্রথমত ঃ নবীগণের এবং কোন কোন ব্যক্তিবর্গের পবিত্র থাকার অর্থ শুধুমাত্র গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা নয়। কারণ হতে পারে কোন সাধারণ মানুষও গুনাহ লিপ্ত হয় না, বিশেষ করে যদি আয়ষ্কাল ক্ষুদ্র হয়। বরং এর অর্থ হল ঃ ব্যক্তি দৃঢ় আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান যে, কঠিন সংকটময় মুহূর্তেও তা তাকে গুনাহে লিপ্ত হওয়াথেকে বিরত রাখে আর এ আত্মিক দৃঢ়তা গুনাহের কুৎসিত রূপ সম্পর্কে সার্বক্ষণিক পূর্ণ সচেতনতা ও কুমন্ত্রণাযুক্ত প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করার দৃঢ় সংকল্প থেকে অর্জিত হয়। যেহেতু এ ধরণের আত্মিক দৃঢ় তা একমাত্র মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে বাস্তব রূপ লাভ করে, সেহেতু এর কর্তৃত্ব মহান আল্লাহরই। নতুবা এমনটি নয় যে, মহান আল্লাহ পবিত্র ব্যক্তিগণকে

বাধ্যতামূলকভাবে গুনাহ থেকে বিরত রাখেন এবং তার স্বাধীনতাকে হরণ করেন।

যারা আল্লাহর মনোনীত বান্দা অর্থাৎ নুবয়্যত বা ইমামতের অধিকারী তাদের পবিত্রতাকে অন্য এক অর্থে মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্কিত করা হয়। আর তা এই যে, মহান আল্লাহ তাঁদের পবিত্রতার নিশ্চয়তা বিধান করেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ কোন ব্যক্তির পবিত্র তার অপরিহার্য অর্থ হল, যে সকল কর্ম তার জন্যে নিষিদ্ধ সেগুলোকে বর্জন করা। যেমনঃ যে সকল গুনাহ সকল শরীয়তে নিষিদ্ধ ও যে সকল কর্ম সম্পাদনের সময় স্বীয় সংশ্লিষ্ট শরীয়তে নিষিদ্ধ সেগুলোকে ত্যাগ করা। অতএব যে সকল কর্ম স্বীয় শরীয়তে এবং তার নিজের জন্যে বৈধ এবং তাঁর পূর্ববর্তী শরীয়তে নিষিদ্ধ ছিল এবং পরবর্তীতে নিষিদ্ধ হবে, সে সকল কর্ম সম্পাদনে কোন নবীর পবিত্রতা ক্ষুন্ন হয় না।

তৃতীয়ত ঃ গুনাহ যা থেকে স্বয়ং মা'চুম পবিত্র, তা এমন কর্ম যে, তাকে হারাম (حرام) বলে প্রকাশ করা হয়। তদনূরূপ এমন কর্ম যাকে ওয়াজেব (واجب) বলে প্রকাশ করা হয় তাকে ত্যাগ করার অর্থও গুনাহ। কিন্তু গুনাহ শব্দটি ও তার সমার্থক শব্দসমূহের যেমন ঃ জাম্ব (ذنب) ই'সিয়ান (عصيان) ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তৃততর অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা তারকে আউলাকেও (ترك الاولي) অন্তর্ভুক্ত করে । আর এ ধরনের গুণাহে লিপ্ত হওয়া ই'সমাত (عصمة) বা পবিত্রতা বহির্ভূত নয়।

পাঠ – ৫

নবীগণের পবিত্রতার স্বপক্ষে দলিলসমূহ

- ভূমিকা
- নবীগণের পবিত্রতার স্বপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলসমূহ
- নবীগণের পবিত্রতার স্বপক্ষে উদ্ধৃতিগত দলিলসমূহ
- নবীগণের পবিত্রতার গূঢ় রহস্য

ভূমিকা ঃ

ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত যে কোন প্রকার গুনাহ থেকে নবীগণের পবিত্রতার বিশ্বাস হল, শিয়া সম্প্রদায়ের দৃঢ় ও প্রসিদ্ধতম বিশ্বাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যা পবিত্র ইমামগণ (আঃ) তাঁদের অনুসারীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে এর বিরোধীদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। এ বিষয়ের উপর তাঁদের বিতর্কের মধ্যে প্রসিদ্ধতম একটি হল, ইমাম রেজার (আঃ) বিতর্ক যা হাদীস গ্রন্থসমূহ ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত আছে।

তবে মোবাহের (مباح) (অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে যে সকল কাজ করলে ছওয়াব বা গুনাহ কোনটিই নেই) ক্ষেত্রে ইমামগণের ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে কম-বেশী মতপার্থক্য বিদ্যমান এবং এ প্রসঙ্গে আহলে বাইতের (আঃ) নিকট থেকে বিবৃত রেওয়ায়েত ও মতবিরোধ বিবর্জিত নয়। আর এগুলোর উপর গবেষণার জন্যে বিস্তৃত সময়ের প্রয়োজন। তাই যে কোন ভাবেই হোক না কেন একে (মোবাহের ক্ষেত্রে ত্রুটিহীন) অপরিহার্য বিশ্বাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

নবীগণের (আঃ) পবিত্রতার (عصمت) স্বপক্ষে যে সকল দলিলের অবতারণা করা হয়, সেগুলোকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ একটি হল বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলসমূহ এবং অপরটি হল উদ্ধৃতিগত (نقلي) দলিলসমূহ। যদিও উদ্ধৃতিগত দলিলসমূহের আস্থাশীলতা অধিকতর, তবু আমরা এখানে দু'টি বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল উপস্থাপনে প্রয়াসী হব। অতঃপর কোরান থেকে কিছু দলিল উপস্থাপন করব।

নবীগণের পবিত্রতার স্বপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলসমূহ ঃ

গুনাহ থেকে নবীগণের (আঃ) অনিবার্য পবিত্রতার স্বপক্ষে প্রথম বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলটি হল ঃ নবীগণের নবুয়্যত লাভের মূল উদ্দেশ্যই হল, মানুষের জন্যে প্রভু কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব পালন ও সত্যের পথে মানুষকে পরিচালিত করা। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই হলেন মানুষকে সঠিক পথে হিদায়াতের জন্যে প্রভুর প্রতিনিধি। এখন এ ধরনের প্রতিনিধি ও দূতগণই যদি আল্লাহর অনুগত ও

আজ্ঞাবহ না হন এবং স্বয়ং তাঁরাই যদি স্বীয় রিসালাতের ব্যতিক্রম কাজ করেন, তবে জনগণ তাঁদের এহেন আচরণকে কথা ও কাজের অসামঞ্জস্যতা বলে বিবেচনা করবে। ফলে তাঁদের কথার উপর জনগণের আর কোন প্রয়োজনীয় আস্থা থাকবে না। আর তখন তাঁদের নবূয়্যত লাভের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে না।

অতএব আল্লাহর প্রজ্ঞা ও অনুগ্রহের দাবি হল এই যে, নবীগণ হবেন পবিত্র ও নিস্পাপ ব্যক্তিত্ব এবং এমনকি ভূলবশতঃও কোন অযথা কর্ম তাঁদের দ্বারা সংঘটিত হবে না, যাতে জনগণ ভাবতে না পারে যে, ভুল-ভ্রান্তির অজুহাত তুলে তারা গুনাহে লিপ্ত হতে পারেন।

নবীগণের (আঃ) পবিত্রতার স্বপক্ষে দ্বিতীয় দলিলটি হল ঃ

নবীগণ ওহীর বিষয়বস্তু ও স্বীয় রিসালাতকে মানুষের নিকট বর্ণনা এবং মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করার দায়িত্ব ছাড়াও মানুষকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ, পরিশুদ্ধকরণ ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে চূড়ান্ত উৎকর্ষে পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। অন্যকথায়ঃ তারা প্রশিক্ষণ ও পথনির্দেশনার দায়িত্ব ছাড়া ও (আধ্যাত্মিক) প্রশিক্ষণের দায়িত্বেও নিয়োজিত, যা সার্বজনীন এবং যা সমাজের যোগ্যতম ও প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গকেও সমন্বিত করে। আর এ ধরনের দায়িত্বের অধিকারী কেবলমাত্র তাঁরাই হতে পারেন, যারা মানবীয় উৎকর্ষের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছেছেন এবং যারা পূর্ণতম আত্মিক দৃঢ়তার (পবিত্রতার দৃঢ়তা) অধিকারী।

তাছাড়া প্রশিক্ষকের আচার-ব্যবহার, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তার বক্তব্য অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং যদি কারও আচরণগত দিক থেকে দুর্বলতা থাকে তবে তার বক্তব্যও আশানুরূপ প্রভাব ফেলে না ।

অতএব কেবলমাত্র তখনই সমাজের প্রশিক্ষক হিসেবে নবীগণকে নবুয়্যত প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে, যখন তাঁরা তাঁদের কথায় ও কর্মে যে কোন প্রকারের ভূল-ক্রটির উর্ধ্বে থাকবেন।

নবীগণের পবিত্রতার স্বপক্ষে উদ্ধৃতিগত দলিলসমূহ ঃ

১। পবিত্র কোরান মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গকে মোখলাস (مخلص)

অর্থাৎ আল্লাহর জন্যে পরিশুদ্ধ হয়েছেন[১] বলে নামকরণ করেছে যাদেরকে বিপথগামী করার দূরাশা স্বয়ং ইবলিসেরও ছিলনা বা নেই। ইবলিস যখন সকল আদমসন্তানকে বিপথগামী করার সংকল্প করেছিল তখনও মোখলাসিনকে (مخلصين) তার এ সংকল্প বহির্ভূত ধরে নিয়েছিল। যেমনটি পবিত্র কোরানে এসেছে ঃ

قال فبعزّتك لاغوينّهم اجمعين الاّ عبادك منهم المخلصين

সে (ইবলিস) বলল আপনার ক্ষমতার শপথ, আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করব, তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাগণকে নহে। (সূরা সাদ- ৮২, ৮৩)

নিঃসন্দেহে বিপথগামিতা থেকে সংরক্ষিত থাকার কারণেই ইবলিস তাদেরকে বিপথগামী করার দুরাশা করেনি; নতুবা তারাও তার শত্রুতার আওতায় রয়েছেন। সুতরাং যদি সম্ভব হত তবে কখনোই তাদেরকে বিপথগামী করা থেকে বিরত হত না।

অতএব মোখলাস (مخلص) অভিধাটি মা'সুমের (معصوم) সমান হবে। যদিও এ গুণটিকে নবীগণের (আঃ) জন্যে নির্ধারণ করার কোন দলিল আমাদের কাছে নেই, তবু নিঃসন্দেহে তাঁরাও এ গুণের অন্তর্ভুক্ত। যেমন ঃ পবিত্র কোরান কিছু সংখ্যক নবীকে মোখলাসিন বলে পরিগণনা করেছে। উদাহরণতঃ উল্লেখযোগ্য যে,

واذكر عبدنا ابراهيم واسحاق و يعقوب اولى الايدى و الابصار انّا اخلصناهم بخالصةٍ ذكرى الدّار

স্মরণ কর আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা, তাঁরা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণের অধিকারী করেছিলাম এবং তা ছিল পরলোকের স্মরণ । (সূরা সাদ্ -৪৫,৪৬)

অনুরূপ,

واذكر في الكتاب موسى انّهُ كان مخلصا و كان رسولا نبياً

১। লক্ষ্যণীয় (مخلـص) (ل এর উপর ফাতহ) (ل এর নীচে জার) থেকে আলাদা। প্রথমটির অর্থ হল ঃ আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ (خالص) করেছেন। আর দ্বিতীয়টির অর্থ হল ঃ কোন ব্যক্তি তার কর্মগুলোকে নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করেন ।

স্মরণ কর এই কিতাবে উল্লিখিত মুসার কথা, সে বিশুদ্ধচিত্ত রাসূল ও নবী ছিল। (সূরা মারিয়াম - ৫১)

তদনুরূপ কঠিন সংকটময় মুহূর্তেও হযরত ইউসূফের (আঃ) নিশ্চত বিচ্যুতি থেকে সংবক্ষিত থাকার কারণ হিসেবে তাঁর মোখলাস হওয়াকে দলিল রূপে উল্লেখ করে পবিত্র কোরানে বলা হয় ঃ

كذالك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين

তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্যে এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাগণের অন্তর্ভূক্ত। (ইউসুফ-২৪)

২। পবিত্র কোরান নবীগণের (আঃ) আনুগত্যকে নিঃশর্তে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছে। উদাহরণতঃ উল্লেখযোগ্য যে,

و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله

শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর আনুগত্য করা হবে। (সূরা নিসা– ৬৪)

আর নিঃশর্তভাবে তাঁদের আনুগত্য একমাত্র তখনই সঠিক হবে, যখন তারা সম্পূর্ণরূপে প্রভুর অনুগত হবেন এবং তাদের অনুসরণ আল্লাহর আজ্ঞাবহতার বিরোধী হবে না। নতুবা নিঃশর্তভাবে মহান আল্লাহর অনুগত হওয়া, নিঃশর্তভাবে তাদের অনুগত হওয়ার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করবে, যারা ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নন।

৩। পবিত্র কোরান, আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত মর্যাদা তাঁদের জন্যেই নির্ধারণ করেছে যারা জুলুম দ্বারা কলুষিত নন। যেমনঃ স্বীয় সন্তানদের জন্যে ইমামতের মর্যাদা প্রার্থনা করলে ইব্রাহীমকে (আঃ) জবাবে বলা হয় ঃ

لا ينال عهدى الظالمين

আল্লাহ বলিলেন আমার প্রতিশ্রুতি সীমালংঘনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নহে। (সূরা বাকারা – ১২৪)

এ ছাড়া আমরা জানি যে, প্রতিটি গুনাহের অর্থই হল কমপক্ষে নিজের উপর জুলুম করা এবং কোরানের মতে সকল গুনাহগারই 'জালিম' (ظالم) বলে পরিচিত।

অতএব নবীগণ অর্থাৎ মহান আল্লাহ কর্তৃক যারা রিসালাত ও নবুয়্যতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, তারা যে কোন প্রকার গুনাহ ও জুলুম থেকে পবিত্র হবেন।

উল্লেখ্য অন্যান্য আয়াত এবং অসংখ্য রেওয়ায়েত থেকেও নবীগণের (আঃ) নিষ্পাপত্ব (عصمت) প্রমাণ করা সম্ভব। তবে এখানে আমরা সে গুলোর আলোচনা থেকে বিরত থাকব।

নবীগণের পবিত্রতার গূঢ় রহস্য ঃ

এ পাঠের শেষ অংশে নবীগণের (আঃ) পবিত্রতার রহস্য সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যথোপযুক্ত মনে করছি ।

ওহী লাভের ক্ষেত্রে তাঁদের পবিত্রতার রহস্য হল, মূলতঃ ওহীর অনুধাবন যা ভুল-ত্রুটি সমন্বিত নয় এবং যিনি তা লাভ করলেন তিনি এমন এক বিশেষ বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী, যা তিনি প্রত্যক্ষভাবে লাভ করেছেন। একইভাবে ওহী প্রেরণকারীর সাথে ওহীর সম্পর্ককেও (ফেরেস্তা মধ্যস্থতায় থাকুক বা না থাকুক) তিনি উপলব্ধি করে থাকেন। পবিত্র কোরান এ সম্পর্কে বলে ঃ

ما كذب الفؤاد ما رأي

যা সে দেখেছে তার অন্তকরণ তা অস্বীকার করেনি। (সূরা নাজম – ১১)

এটা কখনোই সম্ভব নয় যে, ওহীর গ্রাহক দ্বিধাগ্রস্ত থাকবেন যে, ওহী পেলেন কি-না? অথবা কে তাঁকে ওহী করেছেন ? কিংবা তার বিষয়বস্তু কী ? যদিও কোন কোন কাল্পনিক গল্পে এসেও থাকে যে, কোন নবী তাঁর নবুয়্যতের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হয়েছে কিংবা ওহীর বিষয়বস্তুকে অনুধাবন করেননি অথবা ওহী প্রেরণকারীকে চিনতে পারেননি, তবে তা চরম মিথ্যাবাদিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ ধরনের মিথ্যাচার তো সে কথার মত যে, কেউ স্বীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে অথবা বিবেকসম্পন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে সন্দেহ করে !

যা হোক প্রভুর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে (মানুষের নিকট প্রভুর বাণী পৌঁছে দেয়া) নবীগণের (আঃ) পবিত্রতার গূঢ় রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে কিছুটা ভূমিকা দেয়া প্রয়োজন। আর তা হল ঃ

মানুষের স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডগুলো এভাবে বাস্তবায়িত হয় যে, কোন কাংখিত বিষয়ের প্রতি মানুষের অভ্যন্তরে এক অনুরাগ সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন কারণের উপস্থিতিতে এর প্রতি আন্দোলিত হয়। অতঃপর বিভিন্ন জ্ঞান ও উপলব্ধির আলোকে কাংখিত উদ্দেশ্যে পৌঁছার পথ নির্বাচন করে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মগুলো সম্পাদন করে থাকে। অপরদিকে একাধিক প্রবৃত্তি ও প্রবণতার সমাবেশ হলে এদের মধ্যে সর্বোত্তম ও গুরুত্বপূর্ণটিকে শনাক্তকরণ ও নির্বাচন করার চেষ্টা করে । কিন্তু কখনো কখনো জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার ফলে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর বিষয়ের মূল্যায়ন ও শনাক্তকরণে ব্যর্থ হয়। অথবা উৎকৃষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা বা বদাভ্যাস ও কুপ্রবণতার কারণে কুপ্রবৃত্তিকে নির্বাচন করে থাকে কিংবা সঠিক চিন্তা করার ও উৎকৃষ্টতরটি নির্বাচন করার কোন অবকাশ তার থাকে না।

অতএব মানুষ বাস্তবতাকে যত ভালভাবে চিনবে, ঐগুলো সম্পর্কে যতবেশী জ্ঞাত হবে কিংবা যতবেশী গুরুত্ব প্রদান করবে এবং স্বীয় প্রবৃত্তি ও প্রবণতাসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে যতটা দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী হবে, সঠিক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ততটা সফল হবে ও ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ থেকে ততোধিক নিরাপদে থাকবে ।

আর এ কারণেই প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে উৎকর্ষ ও কল্যাণের এমন স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হন যা নিষ্পাপত্বের সীমানার অতি নিকটবর্তী এবং এমনকি কুকর্ম ও গুনাহকে নিজেদের কল্পনায়ও স্থান দেন না। যেমন ঃ কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই বিষাক্ত ও জীবন নাশক ঔষধসমূহ কিংবা নোংরা ও পচা বস্তু খাওয়ার চিন্তা করতে পারেন না ।

এখন মনে করি যে, বাস্তবতাকে চিনার জন্যে কোন ব্যক্তির প্রতিভা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং তিনি আত্মিক পরিশুদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করেছেন। যেমনটি পবিত্র কোরানের ভাষায় (يكاد زيتها يضئ ولولم تمسسه نار) অর্থাৎ নির্ভেজাল যয়তুনের তৈলের মত এমন নির্মল ও দাহ্য, যেন আগুনের সংস্পর্শ ব্যতীতই স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রজ্জ্বলন প্রায় অবস্থা। আর এ ধরনের তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও আত্মিক পরিশুদ্ধির কারণে মহান আল্লাহর আধ্যাত্মিক পরিচর্যার ছায়াতলে আশ্রয় পেয়ে থাকেন এবং রূহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা কর্তৃক সহায়তা পেয়ে থাকেন। আর এরূপ ব্যক্তিই অবর্ণনীয় গতিতে উৎকর্ষ বা কামালের পথ

অতিক্রম করবেন; অর্থাৎ শতাব্দীর পথ এক রাতে অতিক্রম করবেন এবং শৈশবে, এমনকি মার্তৃগর্ভেও অন্য সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবেন। সকল গুনাহ ও পাপাচারের কদর্যতা এ ধরনের ব্যক্তিবর্গের নিকট এতই সুস্পষ্ট, যা অন্যের জন্যে বিষপান ও নিকৃষ্ট দুর্গন্ধযুক্ত খাবার গ্রহণের ক্ষতির মত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। আর যেমন করে একজন সাধারণ মানুষ উল্লেখিত কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত থাকতে বাধ্য নন, তেমনি পবিত্র বান্দাগণের গুনাহ থেকে বিরত থাকাও কোনভাবেই তাঁদের এখতিয়ারের সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না।

পাঠ – ৬

কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার জবাব

- পুরস্কার লাভের জন্যে মা'সুমগণের কী অধিকার আছে ?
- কেন মা'সুমিন পাপ স্বীকার করেছেন ?
- নবীগণের ক্ষেত্রে শয়তানের হস্তক্ষেপ কিরূপে তাঁদের পবিত্রতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে ?
- হযরত আদমের (আঃ) প্রতি বিস্মৃতি ও পাপের অভিযোগ।
- কোন কোন নবীর উপর মিথ্যাচারের অপবাদ
- মুসা (আঃ) কর্তৃক ক্বিবতীকে হত্যা
- মহানবীকে (সঃ) তাঁর রিসালাতের ব্যাপারে সন্দেহ করতে নিষেধ করা

কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার জবাব ঃ

নবীগণের পবিত্রতা সম্পর্কে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।-এখন আমরা সেগুলোর উল্লেখ করতঃ জবাব প্রদান করব ঃ

১। প্রথম ভ্রান্ত ধারণাটি হল এই যে, মহান আল্লাহ যদি নবীগণকে (আঃ) পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখেন, যার অপরিহার্য অর্থ হল দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা বিধান। তবে এ অবস্থায় তাঁদের কোন স্বাধীন বিশেষত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং দায়িত্ব পালনের জন্যে ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার জন্যে কোন পুরস্কারের উপযুক্ত হতে পারেন না। কারণ যদি মহান আল্লাহ অন্য কোন ব্যক্তিকেও মা'সুমরূপে নির্বাচন করতেন তবে তিনিও তাঁদের মতই হতেন।

এ বিষয়টির জবাব পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে পাওয়া যায় এবং তা হল এই যে, মা'সুম হওয়ার অর্থ দায়িত্ব পালনে ও গুনাহ থেকে বিরত থাকায় বাধ্য থাকা নয় (যেমনটি পূর্ববর্তী পাঠে সুস্পষ্ট হয়েছে)। অনুরূপ মা'সুমগণের (আঃ) জন্যে মহান আল্লাহকে রক্ষাকারী বলে জানার অর্থ, তাঁদের স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মের দলিলকে অস্বীকার করা নয়। কারণ যদিও সব কিছুই পরিশেষে প্রভুর সুনির্ধারিত ইরাদার সাথে সম্পর্কিত হয় (যেমনটি একত্ববাদের আলোচনায় ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে) এবং যেখানে কোন কর্ম সম্পাদনে প্রভুর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণা থাকবে সেখানে উক্ত কর্মের সাথে তার সম্পর্ক হবে কিন্তু প্রভুর ইরাদা মানুষের ইরাদার উল্লম্বে অবস্থান করে অনুভূমে নয় কিংবা পরস্পরের প্রতিস্থাপক রূপেও নয়।

কিন্তু মা'সুমগণের (আঃ) প্রতি প্রভুর বিশেষ অনুগ্রহ অন্যান্য কারণ, শর্ত ও উপকরণ, যেগুলো বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্যে সরবরাহ করা হয় সেগুলোর মতই তাঁদের দায়িত্বকে গুরুতর করে এবং তদনুরূপ তাঁদের কর্মের পুরস্কার যেরূপ বৃদ্ধি পায় তেমনি বিরোধিতা হেতু শাস্তিও। আর এভাবেই তাদের পুরস্কার ও শাস্তির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও স্বীয় এখ্‌তিয়ারের সদ্ব্যবহারের কারণে কখনোই তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবেন না। এ ধরনের ভারসাম্যের দৃষ্টান্ত সকল ব্যক্তিবর্গ যারা বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। যেমন ঃ মহানবীর (সঃ) পরিবারবর্গ ও আলেমগণের দায়িত্ব স্পর্শকাতর ও

গুরুতর।[১] আর তাই তাদের সুকর্মের পুরস্কার যেমন অধিকতর, তেমনি পাপাচারের (লিপ্ত হলে) শাস্তিও।[২] এ কারণেই যে কেউ আধ্যাত্মিকভাবে যত উচ্চে আরোহণ করবে তার জন্যে অধঃপতনের আশংকা এবং ভুল-ভ্রান্তির ভয়-ভীতিও ততোধিক।

২। অপর ভ্রান্ত ধারণাটি হল ঃ নবীগণ (আঃ) ও অন্যান্য মা'সুমিনের (আঃ) দোয়া ও মোনাজাত থেকে যতটুকু জানা যায় তাতে পরিদৃষ্ট হয় যে, তাঁরা নিজেদেরকে গুনাহগার মনে করেছেন এবং এ জন্যে ক্ষমা প্রর্থণা করেছেন। আর এ ধরনের স্বীকারোক্তি থাকা সত্ত্বেও কিরূপে তাঁদেরকে মাসুম বলা যাবে ?

এর জবাব এই যে, হযরত মা'সুমিন (আঃ) যারা মর্যাদার দিক থেকে উৎকর্ষ ও প্রভুর সান্নিধ্যের অধিকারী এবং নিজেদের জন্যে অন্য সকলের চেয়ে অধিক দায়িত্বের অধিকারী মনে করতেন। এমনকি তাদের প্রিয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও প্রতি মনোনিবেশ করাই বেশ বড় রকমের গুনাহ বলে গণনা করতেন এবং এ জন্যেই বিনীত ও ক্ষমাপ্রার্থী হতেন। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, নবীগণের পবিত্রতার অর্থ এ নয় যে, সকল কর্ম যেগুলোকে কোনভাবে গুনাহ নামকরণ করা যায়, সেগুলো থেকে বিরত থাকা। বরং তাদের পবিত্রতার অর্থ হল, অনিবার্য কর্তব্যের বিরোধীতা করা থেকে ও শরীয়ত নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা।

৩। তৃতীয় ভ্রান্ত ধারণাটি হল ঃ কোরানের একটি আয়াতে নবীগণের (আঃ) পবিত্রতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁরা মোখলাসিনের (مخلصين) অন্তর্ভুক্ত এবং শয়তান তাঁদের কাছে কোন কিছু আশা করে না। অথচ স্বয়ং পবিত্র কোরানেই নবীগণের উপর শয়তানের প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ

يا بنى ءادم لا يفتننكم الشّيطان كما اخرج ابويكم من الجنّة

হে বনী আদম ! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই বিভ্রান্ত না করে – যেভাবে

১। কোরান এ সম্পর্কে বলে ঃ (সূরা আহযাব–৩২) يا نساء النّبيّ لستنّ كاحد من النساء...
–হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও . . .

২। যেমনটি রেওয়ায়েতে এসেছে : يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد
– আলেমের একটি গুনাহ ক্ষমা করার পূর্বে জাহেলের সাত্তরটি গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত হতে বহিষ্কৃত করেছিল। (সূরা আ'রাফ – ২৭)

উল্লেখিত আয়াতটিতে শয়তান কর্তৃক হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়াকে প্রতারিত করার মাধ্যমে বেহেস্ত থেকে বহিষ্কারের কথা বলা হয়েছে । অন্য একটি আয়াতে হযরত আয়্যুবের (আঃ) বক্তব্য তুলে ধরা হয়। যথা ঃ

انّى مسّنى الشّيطان بنصب و عذاب

শয়তানতো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। (সূরা সাদ্‌ – ৪১)

অনুরূপ অপর একটি আয়াতে সকল নবীগণের (আঃ) জন্যে এক ধরনের শয়তানী আবেশের প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা ঃ

وما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبىّ الا اذا تمنّى القى الشيطان في امنيّته

আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তাদের যে কেউ যখনই কিছু আকাংখা করেছে তখনই শয়তান তার আকাংখায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। (সূরা হাজ্জ – ৫২)

এর জবাব এই যে, উক্ত আয়াতগুলোর কোনটিতেই নবীগণের (আঃ) যে, সকল কর্ম শয়তানের প্ররোচনায় অপরিহার্য দায়িত্বের লংঘন বলে পরিগণিত হতে পারে তার উল্লেখ নেই। তবে সূরা আ'রাফের ২৭ নম্বর আয়াতে নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে ভক্ষণের ব্যাপারে শয়তানের প্ররোচনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, যা হারামভুক্ত কোন নিষেধ ছিল না। বরং শুধুমাত্র আদম (আঃ) ও হাওয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, ঐ বৃক্ষ থেকে আহার গ্রহণ করা জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হওয়া ও পৃথিবীতে অবরোহণের কারণ হবে। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনা তাঁদের এ দিকনির্দেশনামূলক (ارشادي) নিষেধের সীমালংঘনের কারণ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐ জগৎ, কর্তব্যের জগৎ ছিল না এবং তখনও কোন শরীয়ত নাযিল হয় নি। অপরদিকে সূরা সাদের ৪১ নম্বর আয়াতে, শয়তানের মাধ্যমে হযরত আয়্যুবের (আঃ) উপর যে কষ্ট ও যন্ত্রনা আপতিত হয়েছিল সে সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য করার ব্যাপারে কোন প্রমাণ উক্ত আয়াতে নেই। আবার সূরা হাজ্জের ৫২ নম্বর আয়াতটি এমন সকল প্রতিবন্ধকতা সংশ্লিষ্ট, যা শয়তান নবীগণের (আঃ) কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে এবং মানুষের হিদায়াতের ক্ষেত্রে তাঁদের আকাংখার পথে সৃষ্টি করে। কিন্তু

অবশেষে মহান আল্লাহ তার সকল চক্রান্ত ও প্রবঞ্চনাকে নস্যাত করে সত্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেন ।

৪। চতুর্থ ভূল ধারণাটি হল ঃ সূরা তোহার ১২১ তম আয়াতে হযরত আদম (আঃ) এর পাপ সম্পর্কে এবং একই সূরার ১১৫ তম আয়াতে তার ভ্রান্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাহলে এ ধরনের পাপ ও ভ্রান্তি কিরূপে হযরত আদমের (আঃ) ইসমাত বা পবিত্রতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে ?

এ ভ্রান্ত ধারণাটির জবাব পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, পাপ ও ভ্রান্তি অপরিহার্য কর্তব্যের লংঘন ছিল না।

৫। পঞ্চম ভ্রান্ত ধারণাটি হল এই যে, পবিত্র কোরানে কোন কোন নবীগণের (আঃ) মিথ্যা বলা সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে। যেমন ঃ সূরা সাফ্‌ফাতের ৮৯ তম আয়াতে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) বক্তব্য থেকে বলা হয় ঃ

فقال انی سقیم

অতঃপর সে বলল, "আমি অসুস্থ"।

অথচ তিনি অসুস্থ ছিলেন না। অনুরূপ সূরা আম্বিয়ার ৬৩ তম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

قال بل فعله كبير هم هذا

তিনি বললেন ঃ বরং এদের প্রধানই তো এ কাজটি করেছে।

অথচ স্বয়ং ইব্রাহীমই (আঃ) মূর্তিগুলোকে ভেংগেছিলেন, আবার সূরা ইউসুফের ৭০ তম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ثمّ أذن مؤذن ايتها العير إنكم لسارقون

অতঃপর এক আহবায়ক চীৎকার করে বলল ঃ 'হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।

অথচ হযরত ইউসুফের (আঃ) ভাইগণ চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হননি। এর জবাব এই যে, এ ধরনের বক্তব্য যেগুলো কোন কোন রেওয়ায়েতের মতে তৌরিয়াহ (توريه যার অন্য অর্থ হল, ইরাদা করা) নামকরণ করা হয়ে থাকে, সেগুলো অপেক্ষাকৃত বৃহওর কল্যাণের স্বার্থে ব্যক্ত হয়েছিল এবং কোন কোন আয়াত অনুসারে বলা যেতে পারে ঐগুলো ঐশী ইলহামের মাধ্যমেই সংঘটিত

হয়েছিল, যেমন ঃ হযরত ইউসুফের (আঃ)-এর কাহিনীতে বলা হয় ঃ

كذالك كدنا ليوسف

এভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। (সূরা ইউসুফ –৭৬)

যা হোক এ ধরনের মিথ্যা (তৌরিয়াহ), গুনাহ বা ইসমাত বিরোধী নয়।

৬। ষষ্ঠ ভ্রান্ত ধারণাটি হল ঃ হযরত মুসার (আঃ) ঘটনায় এসেছে যে, বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তির সাথে কলহে লিপ্ত কিবতীর এক ব্যক্তিকে হযরত মুসা (আঃ) হত্যা করেছিলেন। আর এ কারণেই মিশর থেকে পলায়ন করেছিলেন এবং যখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরাউন ও তার সঙ্গীদেরকে আহ্বান করার জন্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন ঃ

ولهم عليّ ذنب فاخاف ان يقتلون

আমার বিরুদ্ধে তো তাদের অভিযোগ আছে; আমি আশংকা করি তারা আমাকে হত্যা করবে। (সূরা শুয়ারা – ১৪)

অতঃপর উল্লেখিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ফেরাউনের কর্ণগোচর করা হলে, তার জবাবে হযরত মুসা (আঃ) বলেন ঃ

فعلتها اذا و انا من الضالين

আমি তো এটা করেছিলাম তখন, যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ। (সূরা শুয়ারা – ২০)

অতএব এ ঘটনাটি কিরূপে 'নবুয়্যতের ঘোষণার পূর্বেও নবীগণের ইসমাতের' ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে ?

এর উত্তর হল এই যে, প্রথমতঃ কিবতীর ঐ ব্যক্তির হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ছিল না। বরং মুষ্টাঘাতের ফলে দূর্ঘটনাবশতঃ ঘটেছিল। দ্বিতীয়তঃ ولهم عليّ ذنب অর্থাৎ "আমার বিরুদ্ধে তো তাদের অভিযোগ আছে" এ কথাটিতে ফেরাউন সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে যার অর্থ হল 'তারা আমাকে [মুসা (আঃ)] হত্যাকারী ও অপরাধী মনে করে এবং ভয় করি যে, তারা আমাকে প্রতিশোধ স্বরূপ হত্যা করবে। তৃতীয়তঃ و انا من الضّالين অর্থাৎ 'যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ' এ কথাটি হয় ফেরাউন সম্প্রদায়ের সাথে আপোসরফা করার জন্যে বলা হয়েছে যে, 'ধরা যাক তখন আমি বিপথগামী ছিলাম কিন্তু এখন মহান

আল্লাহ আমাকে হিদায়াত করেছেন এবং চূড়ান্ত যুক্তি-প্রমাণ সহকারে তোমার নিকট পাঠিয়েছেন' অথবা (ضلال) অর্থাৎ বিপথগামী শব্দটি এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে যে, উক্ত কর্মের পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন। মুসা (আঃ) কর্তৃক আল্লাহর অপরিহার্য আদেশের লংঘনের কোন প্রমাণ নেই।

৭। সপ্তম ভ্রান্ত ধারণাটি হল ঃ সূরা ইউনূসের ৯৪ তম আয়াতে মহানবীকে (সঃ) উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে ঃ

فان كنت في شكّ ممّا انزلنا اليك فسئل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحقّ من ربّك فلا تكوننّ من الممترين

আমি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তুমি সন্দিগ্ধচিত্ত হও তবে তোমার পূর্বের কিতাব যারা পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর; তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। তুমি কখনো সন্দিগ্ধচিত্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।

অনুরূপ সূরা বাকারার-১৪৭ তম, সূরা আলে ইমরানের-৬০ তম, সূরা আনআমের-১১৪ তম, সূরা হুদের-১৭ তম এবং সূরা সাজ্‌দার-২৩ তম আয়াতেও তাঁকে সন্দেহ ও দ্বিধাগ্রস্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব কিরূপে বলা যেতে পারে যে, ওহীর উপলব্ধি সন্দেহাতীত ও দ্বিধাহীন ?

এর জবাব হলঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে হযরতের (সঃ) দ্বিধাগ্রস্ততার কোন প্রমাণ নেই। বরং এ প্রমাণ বহন করে যে, মহানবীর রিসালাত এবং কোরানর ও এর বিষয়বস্তুর সত্যতায় কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের উক্তির উদ্দেশ্য হল এরূপযে, দ্বার নাড়লে দেয়াল শুনে।

ايّاك اعنى واسمعى يا جارة

৮। অষ্টম ভ্রান্ত ধারণাটি হল ঃ পবিত্র কোরানে নবী (সঃ)-এর এমন কিছু গুনাহ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যা মহান আল্লাহ ক্ষমা করেছিলেন। যেমন ঃ বলা হয়েছে যে,

ليغفرلك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر

যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন। (সূরা ফাতহ-২)

জবাব এই যে, এ আয়াতে উল্লেখিত (ذنب) অপরাধের অর্থ হল

এমন সকল গুনাহ যা মোশরেকরা মহানবীর (সঃ) উপর হিজরতের পূর্বে ও পরে আরোপ করেছিল। যেমনঃ তাদের দেবতাদেরকে অবজ্ঞা করা ইত্যাদি। আর ক্ষমা করার অর্থ হল ঐ সকল কর্মের সম্ভাব্য কুপ্রভাব থেকে রক্ষাকরণ এবং এর প্রমাণ হল এই যে, মক্কা বিজয়কে ঐগুলোর (মোশরেক কর্তৃক আরোপিত অপরাধ) ক্ষমা হিসেবে গণ্য করে বলা হয়েছে ঃ

انا فتحنالك فتحا مبينا. ليغفر......

নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়। (সূরা ফাত্হ -১)

আর নিঃসন্দেহে যদি ঐ সকল গুনাহের অর্থ প্রকৃতই গুনাহ হত তবে সে সকল গুনাহের ক্ষমার জন্যে কোনভাবেই মক্কা বিজয়কে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হত না।

৯। নবম ভ্রান্ত ধারণাটি হল ঃ পবিত্র কোরান হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক তাঁর পালকপুত্র যাইদের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বলে ঃ

و تخشى الناس والله احق ان تخشاه

তুমি লোকনিন্দার ভয় করছিলে অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত ছিল। (সূরা আহযাব-৩৭)

অতএব কিরূপে এ ধরনের ব্যাখ্যা ইসমাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে ?

জবাব হল ঃ নবী (সঃ) এ ভয়ে ভীত ছিলেন যে, মহান আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে অন্ধকার যুগের একটি কুপ্রথার (পালক পুত্রকে, সত্যিকার পুত্রের সমান মনে করা) অপসারণের চেষ্টা করলে, জনগণ ইমানের দুর্বলতার কারণে একে নবীর (সঃ) ব্যক্তিগত চাহিদা বলে মনে করবে যা দ্বীনের ব্যাপারে তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে অবহিত করেন যে, এ কুপ্রথার উচ্ছেদ গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে নবী (সঃ) এর কার্যকর সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁর (আল্লাহ্র) ইরাদার বিরোধিতা করার ভয় অপেক্ষাকৃত বেশী উপযোগী। অতএব এ আয়াত কোন ভাবেই নবী (সঃ) এর তিরস্কার হওয়ার প্রমাণ বহন করে না।

১০। দশম ভ্রান্ত ধারণাটি হল ঃ পবিত্র কোরান কোন কোন ক্ষেত্রে মহানবীকে (সঃ) তিরস্কার করেছে। যেমন ঃ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার ব্যাপারে নবী (সঃ) কর্তৃক কোন কোন ব্যক্তিকে অনুমতি দান প্রসঙ্গে বলা হয় ঃ

عفا الله عنك لم اذنت لهم.......

আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। কেন সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদেরকে চিনার আগেই তাদেরকে অনুমতি দিলে? (সূরা তওবাহ -৪৩)

অনুরূপ কোন কোন স্ত্রীকে তুষ্ট করার জন্যে কিছু হালাল বিষয়কে (নিজের জন্য) নিষিদ্ধ করা প্রসঙ্গে বলে ঃ

يا ايّها النبىّ لم تحرم ما احلّ الله لك تبتغى مرضات ازواجك

হে নবী ! আল্লাহ তোমার জন্যে যা কিছু বৈধ করেছেন, তোমার স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কেন তা নিজের জন্য অবৈধ করছো? (সূরা তাহরীম – ১)

তাহলে এ ধরনের তিরস্কার কিরূপে তাঁর ইসমাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে ?

এর জবাব এই যে, এ ধরনের উক্তির অর্থ হল তিরস্কারের আড়ালে প্রশংসা করা। আর এর মাধ্যমে নবী (সঃ) এর অপরিসীম উদারতা ও অনুগ্রহের প্রমাণ মিলে যে, মোনাফেক ও কলুষিত হৃদয়ের মানুষকেও তিনি নিরাশ করতেন না এবং তাদের গোপন অপরাধের পর্দা উন্মোচন করতেন না। অনুরূপ স্ত্রীগণের তুষ্টি এ জন্যে ছিল যে, তিনি স্বীয় চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে স্ত্রীগণের চাওয়া-পাওয়ার অগ্রাধিকার দিতেন এবং মোবাহ বিষয়কে শপথের মাধ্যমে নিজের জন্যে নিষিদ্ধ করে ছিলেন –এ রূপ নয় যে, (العيذ بالله) মহান আল্লাহর আদেশকে পরিবর্তন করেছিলেন এবং কোন হালালকে মানুষের জন্যে হারাম করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতগুলো এক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ সকল আয়াতের মত, যেগুলো কাফেরদের হিদায়াতের ব্যাপারে নবী (সঃ) এর অবর্ণনীয় আন্তরিক ইচ্ছার ইংগিত বহন করে। যেমন ঃ

لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين

তারা ঈমান আনছে না এ কারনেই মনে হচ্ছে অতিমনোকষ্টে নিজের জীবনকে বিপন্ন করবে! (সূরা শুয়ারা-৩)

অথবা ঐ আয়তটি যাতে মহান আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে নবী (সঃ) এর অপরিসীম যন্ত্রণা সহ্য করা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে ঃ

طه. ما انزلنا عليك القرءان لتشقى

তা'হা, তোমাকে ক্লেশ দেয়ার জন্যে আমি তোমার নিকট কোরান অবতীর্ণ করিনি। (সূরা তোহা – ১)

অতএব তা মহানবী (সঃ) এর ইসমাতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

পাঠ - ৭

মু'জিযাহ

- নবুয়্যতকে প্রমাণের উপায়সমূহ
- মু'জিযাহর সংজ্ঞা
- অলৌকিক বিষয়সমূহ
- প্রভু কর্তৃক সংঘটিত অলৌকিক বিষয়সমূহ
- নবীগণের (আঃ) মু'জিযাহর বৈশিষ্ট্য



নবুয়্যতকে প্রমাণের উপায়সমূহ ঃ

নবুয়্যত অধ্যায়ের তৃতীয় মূল আলোচ্য বিষয়টি হল এই যে, সত্যনবীগণের দাবির সত্যতাকে এবং মিথ্যানবীদের দাবির অসারতাকে কিরূপ অন্যদের জন্যে প্রমাণ করা যেতে পারে ?

নিঃসন্দেহে যদি এমন কোন দুষ্কৃতিকারী ও গুনাহে কলুষিত ব্যক্তি নবুয়্যতের দাবি করে, যার কুপ্রবনাতার কুৎসিত দিকগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তি অনুধাবন করতে পারে, তবে এমন কোন ব্যক্তির দাবির কোন বিশ্বাসযোগ্যতা ও সত্যতা থাকবে না এবং নবীগণের জন্যে বর্ণিত ইসমাতের শর্তের আলোকে তার এ দাবির অসারতা প্রমাণ করা সম্ভব –বিশেষ করে যদি এমন কোন বিষয়ের দিকে আহবান করে, যা বুদ্ধিবৃত্তি ও ফিতরাত বিরোধী হয় অথবা যদি তার বক্তব্য স্ববিরোধী হয়।

অপরদিকে কোন ব্যক্তির এমন সুখ্যাতিপূর্ণ অতীত বিদ্যমান যে, নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা তার দাবির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে –বিশেষ করে বুদ্ধিবৃত্তি যদি তার আহবানকৃত বিষয়ের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে। অনুরূপ, অন্য কোন নবীর ভবিষ্যদ্বানী ও পরিচয় করিয়ে দেয়ার মাধ্যমেও কোন ব্যক্তির নবুয়্যতকে এরূপে প্রমাণ করা সম্ভব, যার ফলে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের জন্যে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

কিন্তু যদি কোন সম্প্রদায়ের নিকট কারও নবুয়্যতের সত্যতা প্রমাণের জন্য বিশ্বাসযোগ্য কোন সূত্র না থাকে অথবা অপর কোন নবী কর্তৃক ঐ ব্যক্তির নবুয়্যতের সুসংবাদ ও অনুমোদন প্রাপ্তির সংবাদ ঐ জনগোষ্ঠীর নিকট যদি না পৌঁছে থাকে তবে তার নবুয়্যতের প্রমানের জন্য অন্য কোন উপায়ের প্রয়োজনীয়তা থাকাটা স্বাভাবিক । আর তাই মহান আল্লাহ তার পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার আলোকে এ পথটি উন্মুক্ত করেছেন এবং নবীগণকে এমন কিছু মু'জিযাহ দান করেছেন, যেগুলো তাঁদের দাবির সত্যতাকে নির্দেশ করে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ঐগুলোকে আয়াত (آيات) [১] বা নিদর্শনসমূহ নামকরণ করা হয়েছে।

১। আয়াত শব্দটি অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। উদাহরণতঃ উল্লেখযোগ্য বিদ্যমান বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রভুর জ্ঞান, ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার নিদর্শন – হোক সে সাধারণ বা অসাধারণ।

অতএব সত্য নবীগণের (আঃ) দাবির সত্যতাকে তিনভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে। যথা ঃ

১। বিশ্বাসযোগ্য সূত্রসমূহ থেকে, যেমন ঃ আজীবন সত্যবাদীতা ও সঠিক পথে থাকা সত্যপথ থেকে অবিচ্যুত থাকা ও ন্যায়পরায়ণ থাকা। তবে এ উপায়টি ঐ সকল নবীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা বর্ষ পরম্পরায় জনগণের মাঝে জীবন-যাপন করেছেন এবং যারা সংশ্লিষ্ট সমাজে চারিত্রিক দিক থেকে সুপরিচিত। কিন্তু যদি কোন নবী শৈশবে বা যৌবনে এবং জনগণ কর্তৃক তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সুনির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্ত হওয়ার পূর্বেই রিসালাতের অধিকারী হন তবে উল্লেখিত পদ্ধতিতে তাঁর দাবির সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

২। পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোন নবী কর্তৃক পরিচয় উপস্থাপনার মাধ্যমে ঃ এ পদ্ধতিও ঐ জনসমষ্টির জন্যেই প্রযোজ্য যারা অন্য কোন নবীকে শনাক্ত করতে পেরেছেন এবং তাঁর প্রদত্ত সুসংবাদ ও অনুমোদন সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছেন। স্বভাবতঃই এ পথটি পূর্ববর্তী নবীর জন্যেও প্রযোজ্য নয়।

৩। মু'জিযাহ প্রদর্শনের মাধ্যমে যা বিস্তৃত ও সার্বজনীনভাবে কার্যকরী। ফলে আমরা এ পদ্ধতিটির আলোচনায় মনোনিবেশ করব।

মু'জিযাহর সংজ্ঞা ঃ

মু'জিযাহ বলতে বুঝায় –অলৌকিক কোন বিষয়কে, যা মহান আল্লাহর ইচ্ছায় নবুয়্যতের দাবিদার কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় এবং যা তাঁর দাবির সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ।

লক্ষ্যণীয় যে, এ সংজ্ঞাটিতে তিনটি বিষয় সন্নিহিত আছে। যথা ঃ

ক) এমন কিছু অলৌকিক বিষয়ের অস্তিত্ব রয়েছে যেগুলো সাধারণ ও জ্ঞাত কোন কারণের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে না।

খ) এ অলৌকিক বিষয়সমূহের মধ্যে কতিপয় আল্লাহর বিশেষ ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমে নবীগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

গ) এ ধরনের অলৌকিক বিষয়সমূহই কেবল নবীগণের দাবির সত্যাতার নিদর্শন হতে পারে। আর তখন এগুলোকে পরিভাষাগত অর্থে মু'জিযাহ (معجزه) নামকরণ করা হয়ে থাকে।

এখন আমরা উপরোক্ত সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ত্রয় সম্পর্কে আলোচনায় মনোনিবেশ করব।

অলৌকিক বিষয়সমূহ ঃ

এ বিশ্বে যে সকল বিষয় সংঘটিত হয়, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই এমন সকল কারণের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসে যেগুলোকে বিভিন্ন পরীক্ষাগারে শনাক্তকরণ সম্ভব। যেমন ঃ পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ বিষয়। কিন্তু বিরল ক্ষেত্রসমূহে এ অলৌকিক বিষয়সমূহের কিছু কিছু অন্য কোনভাবে সংঘটিত হয় এবং ঐগুলোর সঠিক কারণসমূহকে ঐন্দ্রিয় পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্তকরণ ও পর্যবেক্ষণ করা যায় না। কারণ এ ধরনের বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে অন্য এক শ্রেণীর নির্বাহক কার্যকর। যেমন ঃ যোগীদের বিভিন্ন বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, এ সকল কর্মকাণ্ড বস্তুগত ও অভিজ্ঞতালব্ধ নিয়মের ভিত্তিতে সংঘটিত হয় না। আর এ ধরনের বিষয়সমূহই অলৌকিক বিষয় (خارق العادة) নামে পরিচিত।

প্রভু কর্তৃক সংঘটিত অলৌকিক ঘটনা ঃ

অলৌকিক ঘটনাসমূহকে সার্বিকভাবে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়! একটি হল ঐ সকল ঘটনা যাদের কারণসমূহ সাধারণ না হলেও ঐ সকল অসাধারণ কারণসমূহ মোটামুটি মানুষের আওতাধীন এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে ঐ গুলোকে অর্জন করা সম্ভব। যেমন ঃ যোগীদের কর্মকাণ্ড। আর অপরটি হল ঐ সকল অলৌকিক ঘটনা যেগুলোর বাস্তবায়ন প্রভুর বিশেষ অনুগ্রহ ও অনুমতির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ঐ গুলোর অধিকার মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তিদেরকে প্রদান করা হয় না। অতএব উপরোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর অলৌকিক ঘটনাসমূহের দু'টি মৌলিক বিশেষত্ব বিদ্যমান। যথা ঃ

প্রথমতঃ শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণযোগ্য নয় এবং দ্বিতীয়তঃ অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় না ও অন্য কোন নির্বাহিকের নিকট পরাভূত হয় না ।

আর এ ধরনের অলৌকিক বিষয়সমূহ একমাত্র আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গেরই অধীন এবং কখনোই বিপথগামী ও কলুষিতদের নাগালে আসে না। কিন্তু শুধুমাত্র নবীগণের জন্যেই নির্দিষ্ট নয়। বরং কখনো কখনো আল্লাহর অন্যান্য ওলীগণও এগুলোর অধিকারী হতে পারেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কালামশাস্ত্রের পরিভাষায় বর্ণিত (দ্বিতীয় শ্রেণীর) সকল অলৌকিক ঘটনাকে মু'জিযাহ (معجزه) বলা হয় না এবং এ ধরনের যে সকল কর্মকাণ্ড নবীগণ ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে সংঘটিত হয় সেগুলোকে সাধারণত কেরামত (كرامت) নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন ঃ প্রভু প্রদত্ত অসাধারণ জ্ঞান শুধুমাত্র নবুয্যতের ওহী সংশ্লিষ্ট নয় এবং যখন এ ধরনের জ্ঞান (নবী ভিন্ন) অন্য কাউকে প্রদত্ত হয়, তখন এলহাম (الهام), তাহ্‌দিস (تحديث) ইত্যাদি নামকরণ করা হয়।

যা হোক এ দু'ধরনের (ঐশ্বরিক ও অনৈশ্বরিক) অলৌকিক ঘটনাসমূহকে শনাক্তকরণের উপায় জ্ঞাত হল অর্থাৎ যে সকল অলৌকিক ঘটনা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণযোগ্য অথবা যদি অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে ঐগুলোর সংঘটন ও অগ্রগতিকে রোধ করা যায় এবং ঐগুলোর প্রভাব নস্যাৎ করা যায় তবে ঐগুলো প্রভু কর্তৃক সংঘটিত অলৌকিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ঃ কোন ব্যক্তির দুষ্কৃতি ও অন্যায় বিশ্বাস ও চরিত্রকে মহান আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কহীনতার এবং তার কর্মগুলো শয়তানী ও স্বেচ্ছাচারী হওয়ার নিদর্শনরূপে গণনা করা যেতে পারে।

এখানে অন্য একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করাটা যুক্তিযুক্ত মনে করছি। আর তা হল এই যে, ঐশ্বরিক অলৌকিক ঘটনাসমূহের কর্তা হিসেবে মহান আল্লাহকে মনে করা যেতে পারে (সকল সৃষ্ট বিষয় যেমন ঃ সাধারণ ঘটনাসমূহের কর্তৃত্ব ব্যতীতও) –এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, ঐ গুলোর সংঘটন তাঁর বিশেষ অনুমতির সাথে সম্পর্কিত।[১] অনুরূপ ঐগুলোর মাধ্যম হিসেবে উদাহরণতঃ

১। সূরা রা'দ – ৩৭, সূরা গাফির – ৭৮।

ফেরাস্তাগণ অথবা নবীগণের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা যেতে পারে। আর তা এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তাঁরা মাধ্যম হিসাবে বা নিকটবর্তী কর্তা হিসেবে ভূমিকা রাখেন। যেমনকরে পবিত্র কোরান মৃতদেরকে জীবিতকরণ, অসুস্থকে আরোগ্যদান এবং পাখী সৃষ্টিকে ঈসার (আঃ) কর্তৃত্ব বলে উল্লেখ করেছে।[১] সুতরাং এ দু'ধরনের কর্তৃত্বের উদ্ধৃতি দেয়ার মধ্যে বিরোধ ও বৈপরীত্য নেই। কারণ প্রভুর কর্তৃত্ব বান্দাদের কর্তৃত্বের উল্লমে অবস্থান করে।

নবীগণের মু'জিযাহর বৈশিষ্ট্য ঃ

মু'জিযাহর সংজ্ঞায় তৃতীয় যে বিষয়টি সম্পর্কে ইংগিত করা হয়েছে তা এই যে, মু'জিযাহ নবীগণের দাবির সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে, যখন অলৌকিক বিষয়সমূহকে কালামশাস্ত্রের পরিভষায় মু'জিয়াহ নামকরণ করা হয় যখন প্রভুর বিশেষ অনুমতির প্রমাণ ছাড়াও নবীগণের নবুয়্যতের দলিলস্বরূপ সংঘটিত হয়। আর এর ভাবার্থের কিছুটা সম্প্রসারণ করলে, ঐ সকল অলৌকিক বিষয়কেও সমন্বিত করে, যা ইমামতের দাবির সত্যতার প্রমাণ হিসেবে সংঘটিত হয়ে থাকে। আর এভাবে কেরামত (كرامت) পরিভাষাটি অন্যান্য ঐশ্বরিক অলৌকিক বিষয়সমূহ, যেগুলো আল্লাহর ওলীগণের মাধ্যমে, যাদুকর ভাগ্যগণক ও যোগীদের বিভিন্ন কর্মের মত শয়তানী ও কুমন্ত্রণাপ্রসূত অলৌকিক বিষয়সমূহের প্রতিকূলে সংঘটিত হয়। এ ধরনের (শয়তানী) কর্মগুলো একদিকে যেমন শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণযোগ্য, অপরদিকে তেমনি বৃহত্তর শক্তির নিকট পরাভূত হয় এবং সাধারণতঃ ঐগুলোর অনৈশ্বরিকতার প্রমাণ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও আচরণে প্রতিফলিত হয়।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, নবীগণের (আঃ) মু'জিযাহসমূহ যা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে তা হল তাঁদের নবুয়্যতের দাবির সত্যতা। কিন্তু রিসালাতের বিষয়বস্তুর সঠিকতা এবং আদিষ্ট বিষয়সমূহের আনুগত্যের অপরিহার্যতা অপ্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় ঃ নবীগণের

১। সূরা আল ইমরান -৪৯, সূরা মায়িদাহ্ -১১০

নবুয়্যতকে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে এবং তাদের সংবাদের বিষয়বস্তুর বিশ্বস্ততা বিশ্বাসগত (تعبدي) দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।[১]

১। এ বইয়ের প্রথম খণ্ডের পাঠ – ৪ ও দ্বিতীয় খণ্ডের পাঠ – ১ দ্রষ্টব্য।

পাঠ - ৮

কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার জবাব

- মু'জিযাহ কি কার্যকারণ বিধির লংঘন নয়?
- অলৌকি বিষয়সমূহের সংঘটন কি আল্লাহর নিয়মের পরিবর্তন নয়?
- ইসলামের নবী কেন মু'জিযাহ প্রদর্শনে বিরত থাকতেন?
- মু'জিযাহ কি বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল, না ইক্বনায়ী (পরিতৃপ্তকারী) দলিল?

কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার জবাব ঃ

মু'জিযাহ সম্পর্কে একাধিক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত। এখন আমরা ঐগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করব।

১। প্রথম ভ্রান্ত ধারণাটি হল ঃ সকল বস্তুগত বিষয়ের জন্যেই বিশেষ কারণ বিদ্যমান, যাকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষ-নিরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করা সম্ভব। পরীক্ষাগারের প্রচলিত সরঞ্জামের মাধ্যমে পরীক্ষার অনুপযোগী বিষয়সমূহের কারণ সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা, কোন বিষয়ের জন্যে সাধারণ কারণের অনুপস্থিতির দলিল নয়। অতএব অলৌকিক বিষয়সমূহ শুধুমাত্র এ হিসেবেই গ্রহণযোগ্য হবে যে, এ গুলো অজ্ঞাত কোন কারণ ও নির্বাহিকের প্রভাবে অস্তিত্ব লাভ করে থাকে। সর্বোপরি যতক্ষণ পর্যন্ত এ অলৌকিক বিষয়সমূহের কারণ অজ্ঞাত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ গুলোকে মু'জিযাহরূপে গণনা করা যেতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষ-নিরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্তকরণযোগ্য কারণকে অস্বীকার করার অর্থ হল কার্যকারণ বিধির ব্যতিক্রম, যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

জবাব ঃ কার্যকারণ বিধির আবেদন এর চেয়ে অধিক নয় যে, সকল নির্ভরশীল অস্তিত্বের জন্যই কোন না কোন কারণ বিদ্যমান। কিন্তু সকল কারণই যে, জ্ঞাত হবে তা কখনোই কার্যকারণ বিধির জন্যে অপরিহার্য নয় এবং এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি পাওয়া যাবে না। কারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিধি প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং অতিপ্রাকৃতিক বিষয়সমূহের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব অথবা তাদের প্রভাবকে কখনোই পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত সরঞ্জামের মাধ্যমে প্রমাণ করা যাবে না।

কিন্তু অজ্ঞাত কারণের জ্ঞানরূপে মু'জিযাহর যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে তা সঠিক নয়। কারণ যদি এ জ্ঞান সাধারণ কারণের মতই লব্ধ হয় তবে অন্যান্য সাধারণ ঘটনার সাথে এর কোন পার্থক্য থাকবে না এবং কখনোই একে অলৌকিক ঘটনা হিসেবে গণনা করা যাবে না। আবার যদি উল্লেখিত জ্ঞান অসাধারণ পথে অর্জিত হয় তবে তা অলৌকিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যখন মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে নবুয়্যতের সাক্ষীরূপে সংঘটিত হবে তখন তা এক প্রকার মু'জিযাহরূপে পরিগণিত হবে। যেমন ঃ মানুষের সঞ্চয় ও খাদ্য

সম্পর্কে হযরত ঈসার (আঃ) জ্ঞান, তাঁর একটি মুজিযাহরূপে পরিগণিত হয়েছে। পবিত্র কোরানের আয়াত এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ঃ

وانبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم

আর যা কিছু আহার কর এবং নিজেদের গৃহে মওজুদ কর তা তোমাদেরকে বলে দিব। (সূরা আলে ইমরান – ৪৯)

কিন্তু মু'জিযাহর অন্যান্য প্রকরণকে অস্বীকার করে একে শুধুমাত্র উল্লেখিত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা যাবে না। কারণ তখনও এ প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায় যে, এ কার্যকারণ বিধির দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টির সাথে অন্যান্য অলৌকিক ঘটনার কী পার্থক্য বিদ্যমান?

২। দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণা ঃ আল্লাহর নিয়ম এরূপ যে, সকল কিছুকেই স্বতন্ত্র কারণের মাধ্যমে অস্তিত্বে আনয়ন করেন। আর কোরানের পবিত্র আয়াত অনুসারে আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন হয় না।[১] অতএব অলৌকিক ঘটনাসমূহ যে, আল্লাহর নিয়মে পরিবর্তন করে তা এ ধরনের আয়াতের মাধ্যমে অস্বীকৃত হয়।

এ ভ্রান্ত ধারণাটি পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ধারণাটির মতই। তবে এতটুকু পার্থক্য বিদ্যমান যে, পূর্বোক্তটিতে কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছিল কিন্তু এখানে কোরানের আয়াতের মাধ্যমে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে । যা হোক এর উত্তর হল ঃ কারণ ও উপকরণসমূহকে কেবলমাত্র সাধারণ উপকরণ ও কারণসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধকরণ আল্লাহর অপরিবর্তনশীল নিয়মের অন্তর্ভুক্ত বলে গণনা করা অযৌক্তিক। নতুবা তা ঐ ব্যক্তির দাবির মত হবে যে মনে করে 'তাপের একমাত্র কারণ হল আগুন ' আর এটি হল আল্লাহর অপরিবর্তনশীল নিয়মের অন্তর্ভূক্ত! আর এ ধরনের দাবির প্রতিকূলে বলা যেতে পারে যে, বিভিন্ন প্রকারের কার্যের জন্যে একাধিক প্রকারের কারণের উপস্থিতি এবং সাধারণ কারণকে, অসাধারণ কারণের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন, সর্বদা এ বিশ্বে বিদ্যমান। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে একে আল্লাহর নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করা উচিৎ এবং কারণসমূহকে শুধু সাধারণ কারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধকরণই হল আল্লাহর নিয়মের পরিবর্তন, যা পবিত্র কোরানের উল্লেখিত আয়াতসমূহে অস্বীকার করা হয়েছে।

১। সূরা ইসরা – ৭৭, সূরা আহযাব – ৬২, সূরা ফাতির – ৪৩, সূরা ফাত্হ – ২৩

যাহোক, আল্লাহর নিয়মের অপরিবর্তনশীলতার প্রমাণ বহনকারী আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করা, যেখানে সাধারণ কারণের প্রতিস্থাপনহীনতা আল্লাহর অপরিবর্তনশীল নিয়মসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হয়, তা অযৌক্তিক চিন্তা বৈ কিছু নয়। তদুপরি মুজিযাহ ও অলৌকিক ঘটনার প্রমাণবহ অসংখ্য আয়াত উপরোক্ত ব্যাখ্যার অসারতার সুস্পষ্ট দলিল। উল্লেখিত আয়াতসমূহের সঠিক ব্যাখ্যার জন্যে তাফসিরগ্রন্থসমূহে অনুসসন্ধান করতে হবে।

এখানে আমরা সংক্ষেপে বলব যে, এ শ্রেণীর আয়াতসমূহ কারণের একাধিক্যের ও সাধারণ কারণের আসাধারণ কারণ কর্তৃক প্রতিস্থাপনের বিরোধী নয়। বরং কার্যের কারণহীনতার বিরোধী। সর্বোপরি সম্ভবত এটুকু বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, উল্লেখিত আয়াতসমূহের বিষয়বস্তুর নিশ্চিত পরিমাণ (القدر المتيقن) [১] অসাধারণ কারণসমূহের প্রভাবকে স্বীকার করে।

৩। তৃতীয় ভ্রান্ত ধারণা ঃ পবিত্র কোরানে এসেছে যে, মানুষ উত্তর উত্তর ইসলামের নবীর (সঃ) নিকট মু'জিযাহ ও অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শণের জন্যে আবেদন করত। কিন্তু হয়রত (সঃ) এ ধরনের আবেদনের জবাব প্রদানে বিরত থাকতেন। [২] যদি মু'জিযাহ প্রদর্শন নবুয়্যতের প্রমাণের জন্যে একটি উপায় হয়ে থাকে তবে কেন নবী (সঃ) এ উপায়টি ব্যবহার করেন নি ?

জবাব ঃ এ ধরনের আয়াতসমূহ ঐ সকল আবেদন সংশ্লিষ্ট, যা সত্য প্রকাশ করার ও প্রাগুক্ত তিনটি পথের প্রতিটি পথেই নবুয়্যাত প্রতিপাদিত হওয়ার পর আক্রোশ ও শত্রুতাবশতঃ অথবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে করেছিল, সত্যানুসন্ধিৎসা বশতঃ নয়।[৩] আর এ ধরনের আবেদনে সাড়া দেয়া প্রভুর প্রজ্ঞা সঙ্গত নয়।

আর এর ব্যাখ্যা এরূপ ঃ মু'জিযাহ এ বিশ্বে বিদ্যমান বিন্যাস ব্যবস্থার একটি ব্যতিক্রমী বিষয় যা কখনো কখনো মানুষের আবেদনের জবাবস্বরূপ [যেমন ঃ হযরত সালেহর (আঃ) উটনী] আবার কখনো বা প্রারম্ভিকভাবেই

১। নিশ্চিত পরিমাণ বা ক্বাদরুলমোতায়াক্কান হল উসূলে ফিকাহ্র একটি পরিভাষা।

২। সূরা আনআম – ৩৭, ১০৯; সূরা ইউনুস – ২০; সূরা রা'দ – ৭; সূরা আম্বিয়া – ৫

৩। সূরা আনআম – ৩৫, ১২৪; সূরা তোহা – ১৩৩; সূরা সাফ্ফাত – ১৪; সূরা ক্বামার – ২; সূরা শুয়ারা – ৩, ৪, ১৯৭; সূরা ইসরা – ৫৯; সূরা রূম – ৫৮।

[যেমন ঃ ঈসার (আঃ) মু'জিযাহ] সংঘটিত হত। আর এ মু'জিযাহ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর নবীগণকে (আঃ) পরিচিতকরণ এবং তাঁদের নবুয়্যতের দাবির স্বপক্ষে চূড়ান্ত যুক্তি-প্রমাণ পেশ করণ –নবীগণের (আঃ) আহবানে সাড়া দেয়ার জন্যে বাধ্য করতে ও জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করতে নয় অথবা চিত্তবিনোদনের উপকরণ সরবরাহ ও সাধারণ কারণ ও কারণত্বের বিন্যাস ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করার জন্যে নয়। আর এ ধরনের উদ্দেশ্য সকল আবেদনেরই ইতিবাচক জবাব দেয়ার অবকাশ দেয় না। বরং এদের কোন কোনটির পক্ষে সাড়া দেয়া প্রজ্ঞাবিরোধী ও অনর্থক বৈ কিছু নয়। যেমন ঃ যে সকল আবেদন স্বাধীনভাবে নির্বাচনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ও জনগণকে নবীগণের (আঃ) অহবানে সাড়া দেয়ার জন্য বল প্রয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল অথবা সত্যানুসন্ধিৎসা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ও শত্রুতাবশতঃ করা হত। কারণ যদি ঐ সকল আবেদনে সাড়া দেয়া হত তবে একদিকে মু'জিযাহ প্রদর্শন বেলেল্লাপনায় পর্যবসিত হত এবং মানুষ শুধুমাত্র চিত্তবিনোদনের বিষয় হিসাবেই এটাকে গ্রহণ করত অথবা ব্যক্তিগত বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে নবীগণের পাশে জোটবদ্ধ হত। অপর দিকে পরীক্ষা ও স্বাধীন নির্বাচনের দ্বার বন্ধ হত এবং মানুষ অসন্তুষ্টচিত্তে বাধ্য হয়ে নবীগণের (আঃ) আনুগত্য স্বীকার করত। আর উল্লেখিত উভয় প্রক্রিয়াই প্রজ্ঞা ও মু'জিযাহ প্রদর্শনের পরিপন্থী ছিল।

বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত প্রভুর প্রজ্ঞাপন্থী অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই মানুষের আবেদন গ্রহণ করা হত। যেমন ঃ ইসলামের নবী (সঃ) এর মাধ্যমেও অসংখ্য মু'জিযাহ প্রদর্শিত হয়েছিল, যেগুলোর অধিকাংশ বহুবর্ণিত উদ্ধৃতির (হাদীসে মুতাওয়াতির) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এ গুলোর শীর্ষে রয়েছে চিরন্তন মু'জিযাহ পবিত্র কোরান, যার আলোচনা পরবর্তীতে আসবে।

৪। চতুর্থ ভ্রান্ত ধারণা ঃ মু'জিযাহ যে দৃষ্টিকোণ থেকে প্রভুর বিশেষ অনুমতির সাথে সম্পর্কিত সে দৃষ্টিকোণ থেকে তা মহান আল্লাহর সাথে মু'জিযাহ প্রদর্শনকারীর বিশেষ সম্পর্কের নিদর্শনরূপে গণনা করা যেতে পারে। আর তা এ যুক্তিতে যে, তাকে বিশেষ অনুমতি দেয়া হয়েছে। অন্যকথায় ঃ মহান আল্লাহ স্বীয় কীর্তিকে তারই (মু'জিযাহ প্রদর্শনকারী) ইরাদার প্রবাহ ধারায়, তাঁর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছেন। কিন্তু এ ধরনের শর্তের বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল এটা নয় যে, ওহীর প্রেরণ ও গ্রহণের মত অপর একটি সম্পর্ক মহান আল্লাহ ও মু'জিযাহ

প্রদর্শনকারীর মধ্যে বিদ্যমান। অতএব মু'জিযাহকে নবুয়্যতের দাবির সত্যতার জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলরূপে গণ্য করা যায় না এবং সর্বোচ্চ হলেও একে সম্ভাব্য ও ইক্বনায়ী (إقناعي) (পরিতৃপ্তকারী) দলিল হিসেবে গণনা করা যেতে পারে।

জবাব ঃ অলৌকিক কর্মকাণ্ডগুলো (ঐশ্বরিক অলৌকিক বিষয় হলেও) স্বয়ংক্রিয় পন্থায় ওহীর সম্পর্কের জন্যে কোন দলিল নয়। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আল্লাহর ওলীগণের কেরামতকেও তাঁদের নবুয়্যতের দলিলরূপে গণ্য করা যায় না। কিন্তু বিবেচনার বিষয় হল তাঁর ক্ষেত্রেই যিনি নবূয়্যতের দাবি করেছেন এবং এর প্রমাণ স্বরূপ মু'জিযাহ প্রদর্শন করেছেন। মনে করুন, যদি এ ধরনের কেউ মিথ্যার বশবর্তী হয়ে নবূয়্যত দাবী করত (অর্থাৎ সে বিভৎস ও কদর্যপূর্ণ গুনাহে লিপ্ত হল, যা ইহ ও পরকালে কুৎসিততম অনাচার বলে পরিচিত)[১] তবে কখনোই সে মহান আল্লাাহর সাথে এ ধরনের সম্পর্কের যোগ্যতাসম্পন্ন হত না এবং প্রভুর প্রজ্ঞা কখনোই মু'জিযাহ প্রদর্শনের ক্ষমতা তাকে প্রদান সঙ্গত মনে করত না, যার মাধ্যমে সে মানুষকে বিপথগামী করত।[২]

সিদ্ধান্ত ঃ বুদ্ধিবৃত্তি স্পষ্টতঃই অনুধাবন করতে পারে যে, যদি কেউ মহান আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কের ও মু'জিযাহ প্রদর্শনের ক্ষমতা প্রাপ্তির যোগ্যতা রাখে তবে কখনোই স্বীয় প্রভুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না অথবা তাঁর বান্দাদের বিপথগামিতা ও অনন্ত দুর্দশার কারণ হতে পারে না।

অতএব মু'জিযাহ প্রদর্শন হল নবূয়্যতের দাবির সত্যতার জন্যে চূড়ান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল।

১। সূরা আনআম – ২১, ৯৩, ১৪৪; সূরা আ'রাফ – ৩৭; সূরা ইয়ুনুস – ১৭; সূরা হুদ – ১৮; সূরা কাহাফ – ১৫; সূরা আনকাবুত – ৬৮; সূরা শূরা – ২৪।

পাঠ – ৯

নবীগণের বিশেষত্বসমূহ

- নবীগণের সংখ্যাধিক্য
- নবীগণের সংখ্যা
- নবুয়্যত ও রিসালাত
- উলুল আজম নবীগণ
- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

নবীগণের সংখ্যাধিক্য ঃ

এ পর্যন্ত পথপরিচিতি ও নবুয়্যতের তিনটি মূলবস্তু আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল। ইতিমধ্যে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ইহ ও পরকালীন সৌভাগ্যের জন্যে যে সকল জ্ঞাতব্য মানুষের জন্যে অপরিহার্য সে গুলোর সবগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া তার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে অসম্ভব সেহেতু প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি হল –নবী অথবা নবীগণকে নির্বাচন করতঃ প্রয়োজনীয় সকল বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ দিবেন যাতে অবিচ্যুত ও সঠিক অবস্থায় ঐ বিষয়গুলোকে অন্য সকল মানুষের নিকট পৌঁছাতে পারেন। অপরদিকে এ মনোনীত ব্যক্তিগণকে এরূপে মানুষের নিকট পরিচয় করাবেন, যাতে তাঁদের স্বপক্ষে চূড়ান্ত দলিল উপস্থাপিত হয় এবং এর সার্বজনীন পন্থা হল, মু'জিযাহ প্রদর্শন।

উপরোক্ত বিষয়কে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি। কিন্তু উল্লেখিত দলিলটিতে নবীগণের সংখ্যাধিক্য, কিতাবসমূহ ও ঐশী বিধানসমূহের কোন প্রমাণ উপস্থাপিত হয়নি। ধরা যাক, যদি মানুষের জীবন এরূপ হত যে, একজন নবী বিশ্বের শেষাবধি এমনভাবে সকল মানব সম্প্রদায়ের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারতেন যে, সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় একই নবীর বাণীর মাধ্যমে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারত, তবে তা অযৌক্তিক হত না।

কিন্তু আমরা জানি যে, প্রথমতঃ প্রতিটি মানুষেরই (নবীগণেরও) আয়ুষ্কাল সীমাবদ্ধ। আর প্রভুর প্রজ্ঞার দাবিও এটা ছিলনা যে, সর্বপ্রথম নবীই পৃথিবীর শেষ লগ্ন পর্যন্ত জীবন-যাপন করবেন এবং সকল মানুষকেই ব্যক্তিগতভাবে পথনির্দেশ দিবেন।

দ্বিতীয়তঃ জীবনের শর্ত বিভিন্ন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একরকম নয় এবং জীবনের এ বৈচিত্রময়তা ও শর্তের পরিবর্তন এবং বিশেষ করে সামাজিক সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান জটিলতা, বিধি-বিধান ও সামাজিক নীতির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। যদি এ বিধিগুলো এমন কোন নবীর মাধ্যমে বর্ণিত হত যিনি সহস্র শতাব্দী পূর্বে নবুয়্যত লাভ করেছিলেন তবে তা অনর্থক কর্ম হত। এ ছাড়া

নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঐগুলোর রক্ষণ ও প্রচার খুবই কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ।

তৃতীয়তঃ পূর্ববর্তী অধিকাংশ সময়ই নবীগণের প্রচার সামগ্রী এ রকম ছিলনা যে, একজন নবী স্বীয় বাণীগুলো সকল বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হতেন।

চতুর্থতঃ কোন জনসমষ্টিতে প্রেরিত এক নবীর বাণীসমূহ সময়ের আবর্তে বিভিন্ন কারণের প্রভাবে, ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও বিকৃতির সম্মুখীন হত এবং কালক্রমে একটি বিকৃত ধর্মে রূপ পরিগ্রহ করত। যেমন ঃ ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) এর তাওহীদি ধর্ম বা একত্ববাদী ধর্ম সময়ের পরিক্রমায় তৃত্ববাদী ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এ বিষয়টির আলোকে নবীগণের (আঃ) এবং মানুষ ও সমাজের কোন কোন বিধি-নিয়মের সংখ্যাধিক্যের রহস্য উন্মোচিত হয়[১] -যদিও ঐ গুলোর সবগুলোই মৌলিক বিশ্বাস, চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সামগ্রিক নীতিমালার ক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। [২] যেমন ঃ সকল ঐশী ধর্মেই নামাজ ছিল -যদিও তা সম্পাদনের প্রক্রিয়া ও কিবলাহ বিভিন্ন ছিল। অনুরূপ পরিমাণ ও ক্ষেত্রের বিভিন্নতা সত্ত্বেও যাকাত সম্প্রদান ব্যবস্থাও সর্বদাই ছিল।

যা হোক সকল নবীগণের (আঃ) উপর বিশ্বাস স্থাপন, নবুয়্যতের স্বীকৃতির দিক থেকে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য না করা তাঁদের সকল বাণী ও সকল জ্ঞাতব্য, যা কিছু তাঁদের নিকট প্রেরিত হয়েছে সেগুলোকে গ্রহণ করা এবং তাঁদের মধ্যে বৈষম্য না করা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য। [৩] অনুরূপ কোন নবী এবং তার কোন শরীয়ত ও আহকামকেই অস্বীকার করা বৈধ নয়। এমনকি তাঁদের যে কোন একজনকে অস্বীকার করা সকলকে অস্বীকার করার সমতুল্য; যেমন ঃ প্রভুর কোন একটি আদেশকে অস্বীকার করা সকল আদেশের অস্বীকৃতির সমান। [৪] তবে প্রত্যেক উম্মতের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংশ্লিষ্ট নবী ও তাঁর সময়ের আদেশ-নিষেধ অনুসারে কার্যকর হয়।

১। সূরা মায়িদাহ – ৪৮; সূরা হাজ্জ – ৬৭।
২। সূরা বাক্বারা – ১৩১, ১৩৭, ২৮৫; সূরা আলে ইমরান – ১৯, ২০।
৩। সূরা শুরা – ১৩; সূরা নিসা – ১৩৬, ১৫২; সূরা আলে ইমরান (৮৪-৮৫)।
৪। সূরা নিসা – ১৫০; সূরা বাক্বারা – ৮৫।

এখানে একটি বিষয় স্মরণযোগ্য যে, উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, নবীগণ ঐশীগ্রন্থ ও শরীয়তের বিভিন্নতার রহস্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেও এ সম্পর্কে কোন যথাযথ সূত্র হস্তগত করতে পারে না। যেমনিকরে সে বিবেচনা করতে পারেনা যে, কোথায় এবং কখন অন্য কোন নবীর আবির্ভাব অথবা নতুন কোন শরীয়তের প্রবর্তন হওয়া উচিৎ। তবে এতটুকুই শুধু অনুধাবন করা যেতে পারে যে, যদি মানুষের জীবন ব্যবস্থা এমনটি হয় যে, কোন নবীর আহ্বান সারা বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছবে ও ভবিষ্যৎ বিশ্ববাসীদের জন্যে তার বাণী আবিষ্কৃত ও সংরক্ষিত থাকবে এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে নতুন কোন শরীয়ত প্রবর্তনের ও এর পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না তবে অন্য কোন নবীরও প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

নবীগণের সংখ্যা ঃ

যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি নবীগণ ও ঐশী গ্রন্থসমূহের সংখ্যা নির্ধারণ করতে অপারগ এবং এ ধরনের বিষয়বস্তুর প্রমাণ, উদ্ধৃতিগত দলিল ব্যতীত অসম্ভব। পবিত্র কোরানে যদিও এ সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করা হয় যে, মহান আল্লাহ সকল উম্মতের জন্যেই নবী প্রেরণ করেছেন।[১] কিন্তু নবীগণের সংখ্যা ও উম্মত সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বিবৃত হয়নি। শুধুমাত্র বিশোর্ধ সংখ্যক নবীর (আঃ) নাম এবং অপর কিছু সংখ্যক নবীর কাহিনী সম্পর্কে (নাম না উল্লেখ করে) ইঙ্গিত করা হয়েছে।[২] কিন্তু পবিত্র আহলে বাইত (আলাইহিমুস্সালাম আজমাইন) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে এসেছে যে, মহান আল্লাহ একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবী প্রেরণ করেছেন [৩] এবং তাঁদের ধারা আবুল বাশার বা মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু হয়ে হযরত মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আ'লিহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে যবনিকা রেখা টেনেছে।

১। সূরা ফাতির – ২৪; সূরা নাহল – ৩৬।

২। সূরা বাক্বারা – ২৪৬, ২৫৬।

৩। রেসালেয়ে এ'তেক্বাদাতে সাদুক্ব এবং বিহারুল আনওয়ার (নতুন সংস্করণ) খন্ড – ১১, পৃঃ ২৮, ৩০, ৩২, ৪১।

আল্লাহর প্রেরিত পুরুষগণ, নবী (نبي) নামকরণ, যা মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ উপাধি, তা ব্যতীতও নাজির (نذير) মুনজির (منذير) বাশির (بشير) ও মুবাশ্যির (مبشّير) [1] ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত হতেন এবং সালিহীন (صالحين) ও মোখলাসিন (مخلصين) রূপেও পরিগণিত হতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার রিসালাতেরও অধিকারী ছিলেন এবং কোন কোন রেওয়ায়েতের ভাষায় এ ধরণের রাসূলগণের সংখ্যা তিনশত তের জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [2]

আর এ জন্যে অমরা এখানে নবুয়্যত ও রিসালাতের তাৎপর্য এবং নবী (نبّي) ও রাসূলের (رسول) মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করব।

নবুয়্যাত ও রিসালাত ঃ

রাসূল (رسول) শব্দটির অর্থ হল সংবাদ বাহক। আর নবী (نبيّ) শব্দটি যদি نبأ উপাদান থেকে গঠিত হয়ে থাকে, তবে তার অর্থ হল 'গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের অধিকারী এবং যদি نبو উপাদান থেকে সংগঠিত হয়ে থাকে, তবে তার অর্থ হল 'সম্মানিত ও সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী'।

অনেকের মতে নবী শব্দটির অর্থ রাসূল শব্দটির অর্থ অপেক্ষা বিস্তৃততর। আর তা হল এরূপ ঃ নবী অর্থ, যিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়েছেন -চাই তা অন্যের নিকট পৌঁছাতে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন বা না হন। কিন্তু রাসূল হলেন তিনিই যিনি প্রাপ্ত ওহী অপরের নিকট পৌঁছাতেও আদিষ্ট হয়েছেন।

কিন্তু এ দাবিটি সঠিক নয়। কারণ কোরানের কোন কোন আয়াতে 'নবী বিশেষণটি রাসূল বিশেষণের অব্যবহিত পরই উল্লেখ হয়েছে। [3] অথচ উপরোক্ত বক্তব্য অনুসারে যে বিশেষণটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর অর্থবহ (নবী) সে বিশেষণটি বিশেষ অর্থ প্রকাশক বিশেষনের (রাসূল) পূর্বেই উল্লেখিত হওয়া উচিৎ। তাছাড়া ওহী প্রচারের ক্ষেত্রে রাসূলগণকেই (নবীদেরকে ব্যতীত) যে

---

[1]। সূরা বাকারা – ২১৩, সূরা নিসা– ১৬৫

[2]। বিহারুল আনোয়ার , খন্ড – ১১ পৃষ্ঠা ঃ ৩২

[3]। সূরা মারিয়াম – ৫১, ৫৪।

বিশেষভাবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে কোন দলিল নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে এসেছে যে, নবূয়্যতের মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি ওহীর ফেরেস্তাকে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নযোগে দেখতে পান এবং জাগ্রত অবস্থায় শুধুমাত্র তার শব্দ শুনতে পান। কিন্তু রিসালাতের অধিকারী ব্যক্তি ওহীর ফেরেস্তাকে জাগ্রত অবস্থায়ও দেখতে পান।[১]

উপরোক্ত পার্থক্যটিও শাব্দিক অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তবে যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে তা হল এই যে, নবী (نبي) শব্দটি দৃষ্টান্তের (مصداق) দিক থেকে (ভাবার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে) রাসূল (رسول) শব্দটি অপেক্ষা বিস্তৃততর অর্থ বহন করে থাকে। অর্থাৎ সকল প্রেরিত পুরুষই নবুয়্যতের মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু রিসালাতের অধিকার তাঁদের মধ্যে বিশেষ একশ্রেণীর জন্যে নির্দিষ্ট এবং পূর্বোল্লিখিত রেওয়ায়েত অনুসারে বাসূলগণের সংখ্যা ছিল তিনশত তের জন। স্বভাবতঃই তাঁদের মর্যাদা, অন্যান্য প্রেরিত পুরুষগণের চেয়ে উর্ধ্বে যেমনিকরে রাসূলগণের সকলেই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে এ কররকম ছিলেন না।[২] তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ইমামতের সম্মানেও ভূষিত হয়েছিলেন।[৩]

উলুল আজম নবীগণ ঃ

পবিত্র কোরানে একদল নবীকে উলুল আজম (اولوالعزم) নামে পরিচয় দেয়া হয়েছে,[৪] কিন্তু তাঁদের বিশেষত্বসমূহ সুনির্দিষ্টরূপে নির্দেশ করা হয়নি। তবে আহলে বাইত আলাইহিমুস্‌সালাতু ওয়স্‌সালামের বর্ণনা থেকে যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় উলুল আজম পাঁচজন ছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে ঃ হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত মুহাম্মদ ইবনে আব্দুলাহ (সঃ)[৫]। আর তাঁদের

---

[১]। উসূলে কাফি, খন্ড – ১, পৃঃ-১৭৬।

[২]। সূরা বাক্বারা – ২৫৩, সূরা ইস্‌রা – ৫৫।

[৩]। সূরা বাক্বারা – ১২৪, সূরা আম্বিয়া – ৭৩, সূরা সাজদাহ্‌ – ২৪।

[৪]। সূরা আহকাফ – ৩৫।

[৫]। বিহারুল আনায়ার, খণ্ড – ১১, পৃঃ- (৩৩-৩৪) ও মুয়ালিমুন্নাবুয়াহ ঃ ১১৩।

বৈশিষ্ট্যসমূহ (চূড়ান্ত ধৈর্য ও স্থৈর্য ছাড়াও) ছিল এই যে, তাঁদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়তের অধিকারী ছিলেন এবং সমসাময়িক কালের নবীগণ অথবা পরবর্তী নবীগণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য কোন উলুল আজম রিসালাতের নিমিত্তে প্রেরিত হতেন বা নতুন কোন কিতাব ও শরীয়ত নিয়ে আসতেন তাঁদের শরীয়তের অনুসরণ করতেন।

একই সাথে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, একই সময়ে দু'নবীর আবির্ভাব সম্ভব। যেমন ঃ হযরত লুত (আঃ), হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) সমসাময়িক ছিলেন এবং হযরত হারুন (আঃ), হযরত মুসার (আঃ) সাথে যুগপৎ নবুয়্যত লাভ করেছিলেন। অনুরূপ হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) ছিলেন হযরত ঈসার (আঃ) সমসাময়িক।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ

এ আলোচনার শেষাংশে আমরা নবুয়্যতের উপর কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত করব ঃ

ক) নবীগণ পরস্পর পরস্পরকে সত্যায়িত করতেন এবং পরবর্তী নবীর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রদান করতেন।[১] অতএব যদি কেউ নবুয়্যতের দাবি করে অথচ পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক নবীদেরকে অস্বীকার করে তবে সে মিথ্যাবাদী বৈ কিছু নয়।

খ) আল্লাহর নবীগণ স্বীয় দায়িত্ব পালনের জন্যে মানুষের নিকট কোন প্রতিদান আশা করতেন না।[২] তবে একমাত্র ইসলামের নবীই (সঃ) রিসালাতের বিনিময়ে স্বীয় আহলে বাইতের (আঃ) জন্যে মানুষের নিকট তাঁদের আনুগত্য ও ভালবাসা (مودّة) কামনা করেছিলেন, যার অর্থ হল তাঁদেরকে অনুসরণের জন্যে গুরুত্বারোপ করা। প্রকৃতপক্ষে এর সুফল উম্মতের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।

১। সূরা আলে ইমরান – ৮১।
২। সূরা আনআম – ৯০; ইয়াসীন – ২১; তুর – ৪০; ক্বালাম –৪৬; ইউনূস – ৭২; হুদ –২৯, ৫১; ফোরক্বান – ৫৭; শূয়ারা – ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০; ইউসূফ – ১০৪; সাদ–৮৬।

قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودّة في القربى

বল, "আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আমার নিকট আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না"। (সূরা শুরা – ২৩)

قل ما سئلتكم من اجر فهو لكم ان اجرى الا على الله

বল, "ধামি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই; আমার পুরস্কার তো আছে আল্লাহর নিকট"। (সূরা সাবা – ৪৭)

গ) কোন কোন নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে বিচার ও শাসনকার্যের মত দায়িত্বও লাভ করেছিলেন। উদাহরণতঃ পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সোলায়মানের (আঃ) নাম স্মরণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া সূরা নিসার ৬৪ তম আয়াত, যাতে সকল রাসূলেরই অনুসরণ নিরঙ্কুশভাবে মানুষের জন্যে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা থেকে আমরা বলতে পারি যে, সকল রাসূলই এ ধরনের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

ঘ) জিন্ন সম্প্রদায় যারা প্রকারান্তরে স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত এবং সাধারণতঃ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে অবস্থান করে, তারা কোন কোন নবীর (আঃ) আহবান সম্পর্কে অবগত হতেন। এ সম্প্রদায়ের ভাল ও পুণ্যবান নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেন। তাদের মধ্যে হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর অনুসারী বিদ্যমান।[১] আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ ইবলিসের অনুসরণ করে আল্লাহর নবীগণকে অস্বীকার করেছে।[২]

১। সূরা আহকাফ (২৯ – ৩২)।
২। সূরা জিন্ন (১–১৪)।

পাঠ – ১০

জনগণ ও নবীগণ

- ভূমিকা
- নবীগণের প্রতি জনগণের প্রতিক্রিয়া
- নবীগণের সাথে বিরোধিতা করার কারণ ও প্রবণতা
- নবীগণের সাথে বিরোধিতা করার পদ্ধতিসমূহ
- সামাজিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আল্লাহর কতিপয় রীতি-পদ্ধতি

ভূমিকা ঃ

পবিত্র কোরান যখন পূর্ববর্তী নবীগণকে স্মরণ করে, তাঁদের দীপ্তিময় ও কল্যাণময় জীবনের প্রান্ত থেকে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করে এবং ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকারের বিচ্যুতির মরিচা থেকে তাঁদের জীবন ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়গুলোকে মুক্তভাবে উপস্থাপন করে তখন নবীগণের (আঃ) প্রতি বিভিন্ন উম্মতের প্রতিক্রিয়া বা ভূমিকা সম্পর্কেও আলোক পাত করার জন্যে উদার হস্ত থাকে। পবিত্র কোরান একদিকে যেমন নবীগণের (আঃ) বিপরীতে মানুষের ভূমিকা এবং তাঁদের বিরোধিতার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করে, অপরদিকে তেমনি হিদায়াত ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে নবীগণ (আঃ) কর্তৃক অবলম্বিত পদ্ধতি এবং কুফর, শিরক ও বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম সম্পর্কেও আলোকপাত করে। তদনুরূপ বিশেষ করে নবীগণের সাথে জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করে যা অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয়কে ধারণ করেছে। এ আলোচ্য বিষয়টি যদিও মূল বিশ্বাসগত ও কালামশাস্ত্রগত বিষয়ের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়, তবু একদিকে যেমন নবুয়্যত সম্পর্কে বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব দানের পাশাপাশি এ সম্পর্কে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায় অপরদিকে তেমনি শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যার জন্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে মানুষ যে শিক্ষা লাভ করে তাতে অভূতপূর্ব গুরুত্ব বহন করে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য পাঠে আমরা এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করব।

নবীগণের (আঃ) প্রতি জনগণের প্রতিক্রিয়া ঃ

যখন আল্লাহর নবীগণ (আঃ) জনগণকে এক আল্লাহর উপাসনা করতে[১] ও তাঁর আদেশের আজ্ঞাবহ হতে, মূর্তি ও মিথ্যা উপাস্যগুলোকে বর্জন করতে, শয়তান ও স্বেচ্ছাচারীদের নিকট থেকে দূরে থাকতে, অন্যায়, অত্যাচার, পাপাচার ও কদর্যপূর্ণ কর্ম থেকে বিরত হতে মানুষকে আহবানে উদ্যোগী হতেন, তখন সাধারণতঃ জনগণের বিরোধীতা ও তিরস্কারের সম্মুখীন হতেন।[২] বিশেষ

১। সূরা নাহল -৩৬, সূরা আম্বিয়া -২৫, সূরা ফুস্‌সিলাত -১৪, সূরা আহক্বাফ-২১।
২। সূরা ইব্রাহীম - ৯, সূরা মু'মিনুন-৪৪।

করে সমাজের ধনিক শ্রেনী ও সমাজপাতি, যারা আরাম-আয়াশে নিমগ্ন থাকত[১] এবং স্বীয় ধন-সম্পদ, মর্যাদা ও বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে অহংকার করত [২], তারা নবীগণের (আঃ) বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হত। তারা অন্যান্য শ্রেণীর অধিকাংশ মানুষকেও নিজেদের দিকে আকর্ষণ করত এবং সত্য পথের অনুসরণ থেকে তাদেরকে বিরত রাখত। [৩] তবে ক্ষুদ্র কিছু জনসমষ্টি যারা সাধারণতঃ সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত, তারাই ক্রমাগত নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেন।[৪] খুব কম ক্ষেত্রেই এ ঘটনা ঘটত যে, সঠিক বিশ্বাস ন্যায়-নীতি ও মহান আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে একটি সমাজ রূপ লাভ করেছে। উদাহরণতঃ যেমনটি হযরত সোলায়মানের (আঃ) সময় ঘটেছিল।

যা হোক নবীগণের (আঃ) শিক্ষার কোন কোন অংশ ক্রমান্বয়ে সমাজের সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করত এবং এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে বিস্তৃতিলাভ করত ও অনুসৃত হত। আবার কখনো কখনো কাফের সমাজপতিদের কৃতিত্বের বিষয় রূপে উপস্থাপিত হত। যেমন ঃ বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয় যে, ঐশী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেন অথচ এর উৎসের নাম উচ্চারণে বিরত থাকেন ও নিজেদের চিন্তা ও চেতনা রূপে সমাজে উপস্থাপন করেন।

নবীগণের (আঃ) বিরোধিতা করার কারণ ও প্রবণতা ঃ

নবীগণের (আঃ) বিরোধিতা করার সামগ্রিক কারণ, কুপ্রবৃত্তি ও উচ্ছৃংখল প্রবণতা ব্যতীত অন্যান্য কারণও ছিল[৫] যেমন ঃ স্বেচ্ছাচারিতা, দাম্ভিকতা ও আত্মম্ভরিতা যা ধনিক, বণিক ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে পরিলক্ষিত হত।[৬] এ ছাড়া পূর্ব পুরুষদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতি-নীতির ও ভ্রান্ত মূল্যবোধের গোড়ামী নবীগণের (আঃ) প্রতিকূল সমাজে প্রচলিত ছিল ।[৭] অনুরূপ অর্থনৈতিক

১। সূরা সাবা-৩৪।
২। গাফির-৮৩, কাসাস-৭৮, যুমার-৪৯।
৩। আহযাব- ৬৭, সাবা (৩১-৩৩)।
৪। সূরা হুদ- ৪০,(২৭-৩১)।
৫। সূরা মায়িদা-৭০।
৬। সূরা গাফির-৫৬, আ'রাফ-৭৬।
৭। সূরা বাক্বারা-১৭০, সূরা মায়িদা-১০৪, সূরা আ'রাফ-২৮, সূরা ইউনুস-৭৮, সূরা আম্বিয়া- ৫৩, সূরা শুয়ারা - ৭৪ সূরা লুকমান -২১সূরা যুখরুফ -(২২-২৩)

স্বার্থ ও সামাজিক অবস্থান অটুট রাখা ছিল ধনিক, শাসক ও বুদ্ধিজীবী কর্তৃক, নবীগণেরে (আঃ) প্রতিকূলে অবস্থান নেয়ার অপর একটি শক্তিশালী কারণ।[১] অপরদিকে সাধারণ জনসমষ্টির অজ্ঞতা ও মূর্খতা ছিল কাফের নেতৃবর্গ কর্তৃক প্রতারিত হওয়ার এবং পূর্বপুরুষ ও সংখ্যাগরিষ্ঠের পথ অনুসরণের এক বৃহৎ কারণ। আর এ জন্যে তারা নিজেদের অনুমান ও কল্পনার উপরই আত্মতুষ্টি লাভ করত এবং সে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন থেকে বিরত থাকত, যে ধর্ম সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু লোক, যারা সামাজিক মর্যাদায় ছিলেন বঞ্চিত ও উচ্চ শ্রেণী ও সংখ্যাগুরু কর্তৃক প্রত্যাখিত, তারা ব্যতীত কেউ গ্রহণ করেননি। তেমনি সমাজের এ সংখ্যালঘু বঞ্চিত শ্রেণীর উপর শাসকশ্রেণী ও স্বেচ্ছাচারিদের নিষ্পেষণের কথাও অগ্রাহ্য করার মত নয়। [২]

নবীগণের (আঃ) সাথে বিরোধিতা করার পদ্ধতিসমূহ ঃ

নবীগণের (আঃ) প্রতিপক্ষরা তাদের প্রচার কার্যের সম্প্রসারণে বাঁধা প্রদানের জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল ঃ

ক) অবজ্ঞা ও বিদ্রুপঃ প্রথমে একদল, আল্লাহর বার্তাবাহকগণকে অবজ্ঞা ও বিদ্রুপ করার মাধ্যমে তাঁদের ব্যক্তিত্বহানী করতে চেয়েছিল,[৩] যাতে সাধারণ জনগণ তাঁদেরকে কোন গুরুত্ব প্রদান না করে।

খ) অপবাদ ও কুৎসা রটনা ঃ অতঃপর তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার, অপবাদ দান ও কুৎসা রটনা করত। যেমন ঃ তাঁদেরকে নির্বোধ মস্তিষ্কবিকৃত বলত[৪] এবং যখন মু'জিযাহ প্রদর্শন করতেন তখন তাঁদেরকে জাদুমন্ত্রের অপবাদ দিত।[৫] তদনুরুপ আল্লাহর বাণীসমূহকে রূপকথা বা পৌরাণিক কাহিনীসমূহ বলে নামকরণ করত।[৬]

১। সূরা হুদ −(৮৪-৮৬), কাসাস-(৭৬−৭৯), তরবাহ-৩৪।
২। সূরা ইব্রাহীম -২১, সূরা ফাতির-৪৭, হুদ -২৭, শুয়ারা-১১১।
৩। সূরা হিজর −১১, সূরা ইয়াসীন-৩০, সূরা যুখরুযা -৭, সূরা মুতাফীফফিন (২৯-৩২)।
৪। সূরা আ'রাফ− ৬৬, সূরা বাক্বারা −১৩, সূরা মু'মিনুন−২৫।
৫। সূরা আযযারিয়াত −৩৯, ৫২, ৫৩, আম্বিয়া −৩, ক্বামার−২।
৬। আনা'ম-২৫, আনফাল-৩৪, নাহল-২৪, মু'মিনুন-৮৩, ফুরক্বান-৫, নামল ৬৮, আহক্বফ −১৭, ক্বালাম −১৫, মুতাফফিফীন−১৩।

গ) ভ্রমাত্মক যুক্তি প্রদর্শন ও অহেতুক তর্ক ঃ যখন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষগণ প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তি সহকারে বক্তব্য রাখতেন অথবা সুন্দর বাগ্মিতা সহকারে বিতর্ক ও কথোপকথন করতেন কিংবা জনগণকে উপদেশ দিতেন এবং অবাধ্যতা, অংশীবাদ ও অত্যাচারের কুফল সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দিতেন, তদনুরূপ আল্লাহর আনুগত্য করার লাভজনক ও শুভপরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতেন এবং বিশ্বাসী ও সৎকর্মকারিদেরকে ইহ ও পরলৌকিক কল্যাণের সুসংবাদ প্রদান করতেন তখন কাফের গোত্রপতিরা জনগণকে তাঁদের বক্তব্য শ্রবণ করতে নিষেধ করত। অতঃপর তারা দুর্বল ও বোকামিপূর্ণ যুক্তির মাধ্যমে তাঁদেরকে জবাব দিত এবং চেষ্টা করত সাজানো বক্তব্যের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে প্রতারণা করতে[১] ও নবীগণের (আঃ) অনুসরণ থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে। আর এ কর্মে তারা সাধারণতঃ পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতি অনুসরণ করত[২] এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধিকে সাধারণ মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করত। অপরদিকে নবীগণের (আঃ) অনুসারীগণের বৈষয়িক অস্বচ্ছলতা ও পশ্চাৎপদতাকে তাদের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের অসারতারূপে প্রতিপাদন করার চেষ্টা করত।[৩] তারা বিভিন্ন অজুহাত, নিজেদের বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ কেন মহান আল্লাহ রাসূল ও প্রেরিত পুরুষগণকে ফেরেস্তাগণের মধ্য থেকে নির্বাচন করেননি ? অথবা কেন কোন ফেরেস্তাকে তাঁদের সাথে প্রেরণ করেনি? কিংবা কেন তাদেরকে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি প্রদান করেননি ? [৪] আবার কদাপি এ বাড়াবাড়ির মাত্রাটা এমন স্থানে পৌঁছত যে, বলত ঃ আমরা একমাত্র তখনই ঈমান আনব যখন স্বয়ং আমাদের নিকট ওহী আসবে অথবা আল্লাহকে দেখতে পাব ও তার কথা প্রত্যক্ষভাবে শুনতে পাব। [৫]

ঘ) ভীতি প্রদর্শন ও প্রলুব্ধকরণ ঃ অপর যে পদ্ধতিটি পবিত্র কোরানে বিভিন্ন উম্মতের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে তা হল, আল্লাহর নবীগণ ও তাঁদের

১। সূরা নূহ-৭; ফুস্সিলাত-২৬; সূরা আনআম-১১২,১২১; গাফির-৫,৩৫; আ'রাফ-৭০,৭১; কাহাফ-৫৬।
২। বাক্বারা-১৭০, মায়িদা-১০৪, আ'রাফ-২৮, আম্বিয়া-৫৩, ইউনুস-৭৮, লোকমান-২১।
৩। ইউনুস-৮৮, সাবা-৩৫, ক্বালাম-১৪, মারিয়াম-৭৭, মোদ্দাস্সির-১২, মোজাম্মিল-১১, আহকাফ-১১।
৪। সূরা আনা'ম-(৭-৯), সূরা ইসরা-(৯০-৯৫), ফুরক্বান-(৪-৮)।
৫। সূরা বাক্বারা -১১৮, সূরা আনআম-১২৪, সূরা নিসা-১৫৩।

অনুসারীগণকে বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার, দেশ ও শহর থেকে বহিষ্কার, পাথর নিক্ষেপ ও হত্যার ভয়-ভীতি প্রদর্শন।[১] অপরদিকে প্রলোভনের সকল মাধ্যমও তারা (পথভ্রষ্টরা) ব্যবহার করত এবং বিশেষ করে অজস্র সম্পদ ব্যয় করে জনগণকে নবীগণের (আঃ) অনুসরণ থেকে বিরত রাখত।[২]

৬) সহিংসতা ও হত্যা ঃ অবশেষে নবী (আঃ) গণের ধৈর্য, স্থৈর্য, দৃঢ়তা ও অবিচলতা [৩] এবং অপপ্রচার ও ভীতি প্রদর্শনের সকল হাতিয়ারের কার্যকর ব্যবহার সত্ত্বেও সত্যবাদী নবীগণের সৎ অনুসারীগণের অদম্য প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার পর্যবেক্ষণে নিরাশ হয়ে (মিথ্যাবাদীরা)সহিংসতার পথ বেছে নিত। যেমন ঃ তারা অনেক নবীকেই হত্যা করেছিল।[৪] আর মানব সমাজকে প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত উৎকৃষ্টতম বৈভব ও অনুগ্রহ এবং সমাজের যোগ্যতম সংস্কারক ও পথপ্রদর্শকগণের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করেছিল ।

সামাজিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আল্লাহর কতিপয় রীতি-পদ্ধতি ঃ

নবীগণের (আঃ) নবুয়্যত লাভের পশ্চাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য হল এই যে, মানবসম্প্রদায় ইহ ও পরলৌকিক কল্যাণের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য সম্পর্কে অবগত হবে এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে ওহীর মাধ্যমে কাঁটিয়ে উঠবে অর্থাৎ তাদের প্রতি দলিল ও যুক্তি প্রদর্শন চূড়ান্ত করা।[৫] তবে মহান আল্লাহ স্বীয় রহমতের প্রতিফলন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে নবীগণের আহবানে সারা দেয়ার জন্যে জনগণকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতেন, যা মানুষের উৎকর্ষ প্রাপ্তির পথে সহায়ক হয়েছিল। যেহেতু সৃষ্টির সকল অপরিহার্য জ্ঞাতব্যের প্রতি উদাসীনতা ও অভাবমুক্ত হওয়ার উপলব্ধি[৬] ছিল খোদাকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার মূল কারণ, সেহেতু প্রজ্ঞাবান প্রভু এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতেন, যাতে নিজের অভাবের প্রতি মনোযোগ দেয়ার ক্ষেত্র, মানব সম্প্রদায়ের

১। সূরা ইব্রাহীম-১৩, সূরা হুদ-৯১, সূরা মারিয়াম-৪৬, সুরা ইয়াসীন-১৮, সুরা গাফির-২৬।
২। আনফাল-৩৬।
৩। সূরা ইব্রাহীম-১২।
৪। সূরা বাক্বারা -৬১,৮৭,৯১, আল ইমরান-২১,১১২,১৮১, সূরা মায়িদাহ -৭০, সূরা নিসা-১৫৫।
৫। সূরা নিসা-৬৫, সূরা ত্বোহা -১৩৪।
৬। সূরা আলাক্ব-৬।

জন্যে প্রস্তুত হয় এবং উদাসীনতা, দাম্ভিকতা ও আত্মম্ভরিতার অবসান ঘটে। আর এ জন্যেই মহান আল্লাহ মানুষের সম্মুখে বিভিন্ন সংকট ও সমস্যার সৃষ্টি করতেন যাতে ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত, যে কোন ভাবেই হোক নিজেদের অক্ষমতা সম্পর্কে তারা সচেতন হয় ও আল্লাহর দিকে মুখ ফিরায়।[১]

কিন্তু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে গৃহীত এ পদক্ষেপও সার্বিক ও সার্বজনীনভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। অধিকাংশ মানুষ বিশেষ করে যারা অজস্র ধন-সম্পদের অধিকারী ছিল সুদীর্ঘ সময়ের অত্যাচার-অবিচার ও অন্যায়ের মাধ্যমে আরাম-আয়াশের সকল উপকরণ নিজেদের আয়ত্তে এনেছিল, কোরানের ভাষায় যাদের অন্তর প্রস্তরসম কঠিন হয়ে গিয়েছিল, তারা তাদের চৈতন্য ফিরে পায়নি।[২] তখনও তারা উদসীনতায় নিদ্রামগ্ন ও স্বীয় ভ্রান্ত পথেই যাত্রা অব্যাহত রেখেছিল। যেমন ঃ নবীগণের (আঃ) আদেশ, নিষেধ ও সতর্কবাণীও তাদের জন্য ফলপ্রসূ হয়নি। আর যখনই মহান আল্লাহ সংকট ও সমস্যাসমূহ দূরীভূত করে মানুষের জন্যে তাঁর নিয়ামতসমূহকে পুনরায় প্রেরণ করতেন, তখন তারা বলতঃ সুখ-দুঃখ, দুর্দশা-স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির পালা পরিবর্তন ও দোদুল্যমানতা মানব জীবনের অপরিহার্য অংশ, যা পূর্বপুরুষদের জন্যেও আপতিত হয়েছিল।[৩] আর এ ভাবে তারা পুনরায় অন্যায় অত্যাচারের হাত প্রসারিত করে ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার পাহাড় গড়ে তুলতে প্রয়াসী হত। অথচ তারা ভুলে যেত যে, ধণ-সম্পদের এ সংগ্রহই তাদের ইহ ও পারলৌকিক দুর্ভাগ্যেও ফাঁদ, যা প্রভুর পক্ষ থেকে পাতা হয়েছে।[৪]

যা হোক নবী (আঃ) গণের অনুসারীগণ যখন সংখ্যা ও সামর্থ্যের দিক থেকে এমন পরিমাণে পৌঁছত যে, একটি স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা ও নিজেদেরকে রক্ষা করতে এবং আল্লাহর শত্রুদের সাথে সংগ্রাম করতে সক্ষম,তখন জিহাদের জন্য আদিষ্ট হতেন।[৫] আর তখন নবীগণের (আঃ) মাধ্যমে কাফির ও

১। সূরা আনআম -৪২, সূরা আ'রাফ-৯৪।
২। সূরা আনআম - ৪৩, সূরা মু'মিনূন - ৭৬।
৩। সূরা আ'রাফ - ৯৫।
৪। সূরা আ'রাফ -১৮২,১৮৩, আলে ইমরান -১৭৮, তওবাহ -৫৫,৮৫, মু'মিনূন (৫৪-৫৬)।
৫। সূরা আলে ইমরান - ১৪৬।

অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর আযাব নেমে আসত।[১] অন্যথায় মু'মিনিন, নবীগণের (আঃ) আদেশে কাফেরদের থেকে পৃথক হয়ে যেতেন। অতঃপর আল্লাহর আযাব অন্য কোনভাবে ঐ সমাজের উপর পতিত হত, যে সমাজের সংশোধন ও প্রত্যাবর্তনের কোন প্রত্যাশা থাকত না।[২] আর এটাই হল মানব সমাজের তত্ত্বাধানের ক্ষেত্রে প্রভুর অপরিবর্তনীয় ও অলংঘনীয় নিয়ম।[৩]

১। সূরা তওবাহ-১৪।

২। সূরা আনকাবুত-৪০ এবং এমন অনেক ক্ষেত্র।

৩। সূরা ফাতির -৪৩, সূরা গাফির - ৮৫, সূরা ইসরা -৭৭।

পাঠ - ১১

ইসলামের নবী (সঃ)

- ভূমিকা
- ইসলামের নবীর (সঃ) রিসালাতের প্রমাণ

ভূমিকা ঃ

শত-সহাস্রাধিক আল্লাহর নবী ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং মানব সম্প্রদায়ের হিদায়াত ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে নিজ নিজ ভূমিকা যথাযথ রূপে পালন করতঃ মানব সমাজে জাজ্বল্যমান কীর্তিসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই কোন না কোন জনসমষ্টিকে সঠিক বিশ্বাস ও সমুন্নত মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং অন্যদের জন্যে পরোক্ষ ভূমিকা রেখে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার তাওহীদি ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে ঐ সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নবীগণের (আঃ) মধ্যে হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে স্থান ও কাল উপযোগী ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিয়ম-নীতি ও চারিত্রিক দায়িত্ব সমন্বিত ঐশী কিতাবসমূহ লাভ করেছিলেন এবং মানুষের নিকট উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এ কিতাবগুলো হয় কালের আবর্তে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল অথবা যথেচ্ছা শব্দগত ও ভাবার্থগত বিচ্যুতিতে পতিত হয়েছিল। ফলে সকল ঐশী ধর্ম ও শরীয়তসমূহ বিকৃতরূপ ধারণ করেছিল । যেমন ঃ মুসা (আঃ) এর তৌরাতে অসংখ্য বিকৃতি পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং ঈসার (আঃ) ইঞ্জিল নামক কোন কিছুই অবশিষ্ট ছিলনা। বরং তাঁর অনুসারী বলে পরিগণিত হত এমন কিছু ব্যক্তিবর্গের হস্তলিপিসমূহকে সংগ্রহ করে পবিত্র বাইবেল রূপে নামকরণ করা হয়েছে।

যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই যদি প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ নামক পুস্তকদ্বয়ের (তৌরাত ও ইঞ্জিল) বিষয়বস্তুকে বিবেচনা করে তবে দেখতে পাবে যে, এ গুলো কোনটিই হযরত ঈসা ও মুসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ কিতাব নয়। যেমন ঃ তৌরাত মহান আল্লাহকে (العياذ بالله) এমনভাবে মানুষের মত করে উপস্থাপন করে যে, তিনি অনেক বিষয়ে জ্ঞান রাখেন না [১] বা অনেকবার স্বীয় কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়েছেন [২] অথবা তাঁর এক বান্দার [হযরত ইয়াকুব (আঃ)]

১। তৌরাত ঃ সৃষ্টির যাত্রা, তৃতীয় অধ্যায় (১২-৮০) সংখ্যা।
২। তৌরাত ঃ সৃষ্টির যাত্রা ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সাথে কুস্তি লড়তে গিয়ে পারাস্তপ্রায় হয়ে, অবশেষে প্রতিপক্ষের নিকট অনুরোধ করেন তাঁকে ছেড়ে দিতে যাতে তাঁর বান্দাগণ তাঁকে এ দুরবস্থায় দেখতে না পায়।[১] এ ছাড়া আল্লাহর নবীগণ (আঃ) সম্পর্কেও একাধিক কুৎসার অবতারণা করেছে। (العياذ بالله) যেমন ঃ অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অপবাদ দেয়া হয়েছে হযরত দাউদের (আঃ) উপর[২] অনুরূপ মদ পান ও মাহারামের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অপবাদ দেয়া হয়েছে হযরত লুতকে (আঃ)[৩]। এ সকল মিথ্যাচার ছাড়াও হযরত মুসার (আঃ) (তৌরাতের বাহক) মৃত্যু কোথায় এবং কিভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছে।[৪]

এ কিতাব হযরত মূসার (আঃ) নিকট অবতীর্ণ হওয়া কিতাব নয়, তা প্রমাণের জন্যে শেষোক্ত বিষয়াটিই কি যথেষ্ট নয় ?

অপরদিকে ইঞ্জিলের অবস্থা আর ও লজ্জাস্কর। কারণ প্রথমতঃ হযরত ঈসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ এমন কোন কিতাব খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি স্বয়ং খ্রীষ্ট ধর্মের অনুসারীরাও এরূপ দাবি করেন না যে, বর্তমানে প্রচলিত ইঞ্জিল, সে কিতাবই যা মহান আল্লাহ হযরত ঈসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ করেছেন। বরং এর বিষয়বস্তুকে ঈসার (আঃ) কয়েকজন সহচর কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন বলে গণনা করা হয়ে থাকে। তদুপরি উক্ত কিতাবে মদ পাণের বৈধতা প্রদানসহ এর আবিষ্কারকে ঈসার (আঃ) মু'জিযাহরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫] এককথায় বলা যায়, এ দু'জন মহান নবীর (আঃ) নিকট প্রেরিত ওহীসমূহ বিকৃত হয়ে গিয়েছে। ফলে সেগুলো মানব সম্প্রদায়কে হিদায়াত করতে স্বকীয় ভূমিকা রাখতে অপারগ। তবে কেন এবং কিরূপে এ সকল বিচ্যুতি ও বিকৃতি সংঘটিত হয়েছিল, সে ঘটনা অনেক বিস্তৃত, যার বর্ণনা দেয়ার সুযোগ এখানে নেই ।[৬]

খ্রীষ্টোত্তর ষষ্ট শতাব্দীতে যখন সমগ্র বিশ অত্যাচার ও অজ্ঞতার

১। তৌরাত ঃ সৃষ্টির যাত্রা ৩২তম অধ্যায় (২৪–৩২) সংখ্যা।
২। পুরাতন সংস্করণ, দ্বিতীয় পুস্তক স্যামুয়েল, ১১শ অধ্যায়।
৩। তৌরাত ঃ সৃষ্টির যাত্রা ১৯-তম অধ্যায়, (৩০–৩৮) সংখ্যা।
৪। তৌরাত ঃ দ্বিতীয় যাত্রা, ৩৪-তম অধ্যায়।
৫। ইঞ্জিল ইউহান্না, দ্বিতীয় অধ্যায়।
৬। আজহারুল হাক্ব, লিখক রহমাতুল্লাহ হিন্দী; আল হুদা ইলা দ্বীনিল মুস্তাফা, লেখক -আল্লামা বালাগি, রাহে সা'দাত, লেখক -আল্লামা শা'রানী।

অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, হিদায়াত ও মুক্তির সকল আলোক বর্তিকাগুলো যখন নিভন্তপ্রায়, ঠিক এমনই সময় মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে (সঃ) তদানিন্তন সময়ের অন্ধকারতম ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে প্রেরণ করেছেন যাতে ওহীর জ্যোতির্ময় শিখা সর্বকালের জন্যে এবং সকল মানুষের জন্যে প্রজ্জলিত হয়। আর সেই সাথে চিরন্তন ও অবিক্রিত অপরিবর্তিত ঐশী কিতাবকে মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া যায় এবং প্রকৃত জ্ঞাতব্য, ঐশী প্রজ্ঞাসমূহ ও বিধি-বিধান সম্পর্কে মানব সম্প্রদায়কে অবহিত করা যায়। আর সেই সাথে সকল মানুষ ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের পথে পরিচালিত হয়। [১]

আমিরুল মু'মিনিন হযরত আলী (আঃ) তাঁর বক্তব্যের একাংশে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নবীরূপে আত্মপ্রকাশের সমসাময়িক বিশ্বপরিস্থির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

মহান আল্লাহ মহানবীকে (সঃ) এমন এক সময় রিসালাতের অধিকারী করেছিলেন যখন পূর্ববর্তী নবীগণ (আঃ) থেকে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহীত হয়ে গিয়েছিল, মানবকুল সুদীর্ঘ ও গভীর নিদ্রায় আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল, বিশৃংখলার সলিতাগুলো সারা বিশ্বে জ্বলে উঠেছিল, কীর্তির বাঁধনগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, যুদ্ধবিগ্রহের লেলিহান শিখা দাউদাউ করে জ্বলছিল , পাপ ও অজ্ঞতার তিমিরে নিমগ্ন ছিল সারা বিশ্ব, কপটতা ও প্রতারণা ছিল বিবস্ত্র, মানবজীবন বৃক্ষের শ্যামল পত্ররাজি শুষ্কপ্রায়, ফলধারণের কোন আশাই তাতে ছিল না, জলরাশি অতলে গিয়েছিল হারিয়ে, হিদায়াতের দীপগুলো হিমশীতল ও নিস্প্রভ হয়ে গিয়েছিল, অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার ধ্বজাগুলো স্ব-শব্দে ছিল উড্ডীয়মান, কদর্য ও হতভাগ্য মানব সম্প্রদায়ের উপর স্বীয় কুৎসিত রূপ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল। এ অন্যায় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অহন, যখন অনিয়ম ও বিশৃংখলা ব্যতীত কিছু বয়ে আনত না এবং জনগণের উপর যখন ভয়-ভীতি ও নিরপত্তাহীনতা আধিপত্য বিস্তার করেছিল তখন রক্তললুপ অসি ব্যতীত মানুষের কোন আশ্রয়স্থল ছিলনা।[২]

ইসলামের নবীর (সঃ) আবির্ভাবের সময় থেকে প্রত্যেক সত্যান্বেষী মানুষের জন্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি (খোদা পরিচিতির পর) হল, হযরত

১। সুরা জুময়াহ – ২,৩।
২। নাহাজুল বালাগাহ খোৎবা নং –১৮৭।

(সঃ) এর নবুয়্যত ও রিসালাত সম্পর্কে এবং পবিত্র ধর্ম ইসলামের উপর গবেষণা করা। এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য সঠিক বিশ্বাসসমূহকে প্রতিপাদনের এবং মূল্যবোধসমূহ ও এ বিশ্বের শেষাবধি সকল মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কে বর্ণনা প্রদানের নিশ্চিত পথের সন্ধান পাওয়া যায় এবং বিশ্বদৃষ্টি ও মতাদর্শের অন্যান্য বিষয়সমূহের সমাধানের চাবিকাঠি হস্তগত হয়। আর সেই সাথে যুগপৎ পবিত্র কোরানের সত্যতা এবং মানবসম্প্রদায়ের নিকট বিদ্যমান বিচ্যুতি ও বিকৃতি থেকে সংরক্ষিত একমাত্র ঐশী পুস্তক হিসেবে এর বিশ্বস্ততাও প্রতিপন্ন হয়ে থাকে ।

ইসলামের নবীর (সঃ) রিসালাতের প্রমাণ ঃ

সাতাশতম পাঠে বলা হয়েছে যে, নবীগণের নবুয়্যত তিনটি উপায়ে প্রতিপাদনযোগ্য ঃ একটি হল তাঁদের মন-মানসিকতা সম্পর্কে জানা ও নিশ্চিত সূত্রের ব্যবহার । দ্বিতীয়টি হল পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী। আর তৃতীয় উপায়টি হল মু'জিযাহ প্রদর্শন।

ইসলামের নবী (সঃ) এর ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতিই প্রযোজ্য ছিল। মক্কার মানুষ হযরত (সঃ) এর সুখ্যাতিপূর্ণ চল্লিশ বছরের জীবন-যাপন পদ্ধতি খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর এ দীর্ঘ চল্লিশ বছরে এমন কোন ক্ষুদ্রতম বিষয় খুঁজে পাওয়া যায়নি যা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। উপরন্তু তার সত্যবাদিতা ও সদাচারের এমন পরিচয় তারা পেয়েছিলেন যে, তাঁকে "আল -আমিন " (الامين) বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। স্বভাবতঃই এ ধরনের ব্যক্তির পক্ষে মিথ্যা বলা ও মিথ্যা দাবি করার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

অপরদিকে ঃ পূর্ববতী নবীগণ (আঃ) ও হযরতের (সঃ) নবুয়্যতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।[১] এ জন্যে একদল আহলে কিতাব তাঁর আবির্ভবের আশায় অপেক্ষমাণ ছিলেন এবং তাঁর সুস্পষ্ট ও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সম্পর্কেও তাঁরা অবগত ছিলেন।[২] এমনকি আরব মোশরেকরা বলত যে, হযরত ইসমাঈলের (আঃ) সন্তানদের মধ্যে (যারা আরব সম্প্রদায় ও গোত্রসমূহের

১। সূরা সাফ -৬,
২। সূরা আ'রাফ -১৫৭, বাক্বারা -১৪৬,আনা'ম -২০

প্রতিষ্ঠাতা) এমন কেউ নবুয়্যত প্রাপ্ত হবেন যে, পূর্ববর্তী সকল নবী ও সকল তাওহীদি ধর্মকে সত্যায়িত করবেন।[১] ইহুদী ও নাসারাদের মধ্য থেকে একদল পণ্ডিত এ ভবিষ্যৎ বাণীর ভিত্তিতেই রাসুল (সঃ) এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন [২] –যদিও অন্য একদল আবার কুমন্ত্রণা ও শয়তানী প্রবণতার কারণে দ্বীন ইসলামকে গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছিল।

পবিত্র কোরান এ পদ্ধতি সম্পর্কে ইংগিত করতে গিয়ে বলে ঃ

اولم يكن لهم ءاية ان يعلمه علماؤا بنى اسرائيل

এই নিদর্শনই কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যা সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের আলেমগণ বিশেষভাবে অবগত আছে!? (সূরা শুয়ারা–১৯৭)

বনী ইসরাঈলের আলেমদের মাধ্যমে এবং পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী ও পরিচয় করিয়ে দেয়ার ভিত্তিতে ইসলামের নবীর (সঃ) পরিচয় লাভ একদিকে যেমনি সকল আহলে কিতাবের জন্যে হযরতের (সঃ) রিসালাতের সত্যতার সুস্পষ্ট দলিল ছিল। অপরদিকে তেমনি সুসংবাদ প্রদানকারী নবীগণের সত্যবাদিতার এবং তদনুরূপ অন্যান্যদের জন্যে হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর সত্যতার, চূড়ান্ত ও তুষ্ট প্রমাণ রূপে পরিগণিত হত। কারণ এ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের সত্যতা এবং এর সাক্ষী ও হযরত (সঃ) সম্পর্কে বর্ণিত নিদর্শনসমূহকে তারা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ ও নিজেদের জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করতেন।

বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে, এ বিকৃত তৌরাত ও ইঞ্জিলেই এ ধরনের সুসংবাদগুলোকে নির্মূল করার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এমন সকল বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় যা সত্যান্বেষীদের জন্যে সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। যেমন ঃ ইহুদী ও নাসারা আলেমগণের মধ্যে অনেকেই যারা সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলেন, তারা এ সকল বিষয় ও সুসংবাদের মাধ্যমেই হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পবিত্র দ্বীন ইসালামে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।[৩]

---

[১]। বাক্বারা –৮৯।

[২]। সূরা মায়িদা – ৮৩, আহক্বাফ–১০।

[৩]। উদাহরণতঃ মির্জা মুহাম্মদ রেজা (ইহুদী পণ্ডিত, তেহরান) যিনি ইক্বামাতুশ্‌শহুদ ফী রাদ্দিল ইয়াহুদ বইয়ের লেখক, হাজী বাবা ক্বাযভিনি ইয়াযদী (ইহুদী আলেম) যিনি 'মাহজারু শশহুদ ফী রাদ্দিল ইয়াহুদ' বইয়ের লেখক অধ্যাপক অব্দুল আহাদ দাউদ (প্রাক্তন খ্রীষ্টান বিশপ) যিনি 'মুহম্মদ দার তৌরাত ও ইঞ্জিল' বইয়ের লেখক, প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনুরূপ মহানবী (সঃ) কর্তৃক অসংখ্য মু'জিযাহ প্রদর্শিত হয়েছিল, যা ইতিহাস ও হাদীসগ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং এ গুলোর অধিকাংশই বহুল আলোচিত হাদীসের অন্তর্গত হয়েছে।[১] তবে সর্বশেষ নবী ও তাঁর চিরন্তন দ্বীনের পরিচয় দানের ক্ষেত্রে প্রভুর অনুগ্রহের দাবি হল ঃ সমসাময়িক মানুষের জন্যে চূড়ান্ত রূপে দলিল –মু'জিযাহসমূহ প্রদর্শন ও অন্যরা সংগতভাবে উদ্ধৃতিগত পথে ঐ গুলো সম্পর্কে অবগত হবে; তদুপরি এমন এক অমর ও চিরন্তন মু'জিযাহ তাকে সম্প্রদান করবেন, যা সর্বদা সর্বযুগের বিশ্ববাসীর জন্যে চূড়ান্ত দলিল হিসেবে থাকবে। আর তা হল পবিত্র কোরান।

অতএব পরবর্তী পাঠে আমরা এ সম্মানিত গ্রন্থের অলৌকিকত্ব সম্মর্কে আলোচনা করব।

১। বিহারুল আনোয়ার ১৭-তম খন্ড, পৃঃ-২২৫ থেকে ১৮-তম খন্ডের শেষ পর্যন্ত এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহ ও বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ।

পাঠ – ১২

পবিত্র কোরানের অলৌকিকত্ব

- পবিত্র কোরান হল একটি মু'জিযাহ
- পবিত্র কোরানের অলৌকিক বিষয়সমূহ
    - (ক) ভাষার প্রঞ্জলতা ও বাক্যালংকার
    - (খ) নবীর (সঃ) উম্মী হওয়া
    - (গ) সুসঙ্গতি ও বিরোধহীনতা

পবিত্র কোরান হল একটি মু'জিযাহ্ ঃ

পবিত্র কোরানই একমাত্রা গ্রন্থ যা দৃঢ় কণ্ঠে ও সুস্পষ্ট রূপে ঘোষণা করেছে যে, কেউই এর সমকক্ষ কোন গ্রন্থ আনতে সক্ষম হবে না। এমনকি যদি সমস্ত মানুষ ও জিন্ন সম্প্রদায় পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেও চেষ্টা করে তথাপি এ ধরনের কর্ম সম্পাদনে সমর্থ্য হবে না।[১] তদুপরি সামগ্রিক কোরানের মত কোন গ্রন্থ যে আনতে পারবে না, কেবলমাত্র তা-ই নয়; বরং দশটি সূরা[২] এমনকি এক লাইন বিশিষ্ট একটি সূরাও আনতে অক্ষম।[৩]

অতঃপর অধিক গুরুত্বসহকারে সকলের সম্মুখে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানিয়েছে এবং এ ধরনের কর্ম সম্পাদনে তাদের অক্ষমতাকে এ গ্রন্থ ও ইসলামের প্রিয় রাসূল (সঃ) এর রিসালাতের ঐশ্বরিক হওয়ার দলিল বলে উল্লেখ করেছে।[৪]

অতএব এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, এ পবিত্র গ্রন্থ নিজের মু'জিযাহ হওয়ার দাবি করে এবং এর বাহক একে চিরন্তন মু'জিযাহ ও স্বীয় নবুয়্যতের স্বপক্ষে সকল বিশ্ববাসীর জন্যে সর্বকালীন চূড়ান্ত দলিল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অদ্যাবধি চতুর্দশ শতাব্দী অতিক্রম হওয়ার পরও প্রভুর এ আহ্বান অহর্নিশ শত্রু ও মিত্রের প্রচার মাধ্যম থেকে বিশ্ববাসীর কর্ণগোচর হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত নিজের স্বপক্ষে চূড়ান্ত দলিল উপস্থাপন করে চলছে ।

অপরদিকে আমরা জানি যে, ইসলামের নবী (সঃ), তাঁর প্রকাশ্য আহ্বানের প্রারম্ভেই অবাধ্য ও প্রতিহিংসাপরায়ণ শত্রুদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, যারা এ ঐশী ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন প্রকারের প্রচেষ্টা ও পন্থা অবলম্বনেই পিছপা হয়নি। অবশেষে সর্বপ্রকারের ভয়-ভীতি ও প্রলোভনের কোন কার্যকারিতা না দেখে নিরাশ হয়ে হযরতকে (সঃ) হত্যার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করল। কিন্তু মহান আল্লাহর তত্ত্বাবধানে রাতের অন্ধকারে গোপনে মদীনায় হিজরতের মাধ্যমে এ চক্রান্তটিও ব্যর্থতায় পর্যববসিত হয়। হিজরতের পরেও

১। সূরা ইসরা- ৮৮।
২। সূরা হুদ- ১৩।
৩। সূরা ইউনুস- ৩৮।
৪। সূরা বাক্বারা- ২৩, ২৪।

মোশরেক ও তাদের দোসর ইহুদীদের সাথে একাধিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে জীবনের পবিত্রতম অবশিষ্ট বছরগুলো অতিবাহিত করেন। রাসূলের (সঃ) তিরোধানের পর থেকে অদ্যাবধি আভ্যন্তরীণ মোনাফিক ও বহিঃশত্রুরা এ ঐশী জ্যোতিশিখাকে নির্বাপিত করার জন্যে সদা সচেষ্ট ছিল এবং আছে। আর এ কর্মে তারা এমন কোন প্রকার পন্থা অবলম্বনেই কুণ্ঠাবোধ করেনি বা করে না। আর পবিত্র কোরানের সমকক্ষ এমন কোন গ্রন্থ প্রণয়ন যদি তাদের পক্ষে সম্ভব হত, তবে কখনোই এ কর্ম থেকে তারা পিছপা হত না।

বর্তমান সময়েও বিশ্বের সকল বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলো ইসলামকেই তাদের স্বৈরাচারী জালিম সরকারের বিরুদ্ধে প্রধান শত্রুরূপে চিহ্নিত করেছে এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। আর এ জন্যে বৈষয়িক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সম্প্রচারগত ইত্যাদি সকল প্রকারের উপকরণই হাতে তুলে নিয়েছে। যদি সম্ভব হত তবে পবিত্র কোরানের কোন ক্ষুদ্রতম সূরা সদৃশ একটি লাইন প্রণয়নে প্রয়াসী হত এবং সকল সমষ্টিগত প্রচার মাধ্যম ও বিশ্বপ্রচার মাধ্যমে তা তুলে ধরত। কারণ এ কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ, স্বল্পতম ব্যয়সাপেক্ষ এবং ইসলাম ও এর সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলপ্রসূ।

অতএব সকল সত্যান্বেষী বিবেকবান মানুষই উপরোক্ত বিষয়টির আলোকে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে যে, পবিত্র কোরান হল একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও অনানুকরণযোগ্য গ্রন্থ এবং কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষেই, কোন প্রকার শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই এর সদৃশ কোন গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এটি এমন একটি গ্রন্থ যা, মু'জিযার সকল বৈশিষ্ট্যের (অলৌকিক হওয়া, ঐশ্বরিক ও অনানুকরণযোগ্য হওয়া, নবুয়্যতের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত হওয়া) অধিকারী। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি মহানবী (সঃ) এর আহ্বানের বৈধতার এবং ইসলামের সত্যতার স্বপক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট ও চূড়ান্ত দলিল হিসেবে পরিগণিত হয়। মানব সম্প্রদায়ের উপর প্রভুর পক্ষ থেকে সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত হল এটাই যে, এ সম্মানিতগ্রন্থকে এরূপে অবতীর্ণ করেছেন, যাতে চিরন্তন মু'জিযাহরূপে সর্বদা বিদ্যমান থাকতে পারে এবং স্বীয় সঠিকতা ও সত্যতার স্বপক্ষে এমনভাবে দলিল উপস্থাপন করতে পারে, যাকে অনুধাবনের জন্যে কোন প্রকার শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন নেই; আর সকল মানুষের জন্যেই তা

বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য হবে।

পবিত্র কোরানের অলৌকিক বিষয়সমূহ ঃ

আমরা সংক্ষেপে ও নিশ্চিতরূপে জানতে পেরেছি যে, মর্যাদাবান কোরান হল আল্লাহর বাণী, যা অলৌকিকতাপূর্ণ। এখন আমরা এর অলৌকিক কিছু দিক তুলে ধরব ঃ

ক) ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বাক্যালংকারের গভীরতা ঃ

কোরানের প্রধান অলৌকিকত্ব হল তার ভাষার প্রাঞ্জলতা (فصاحت) ও বাক্যালংকারের গভীরতায় (بلاغت)। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাঁর অভিব্যাক্তিসমূহ প্রকাশের জন্য সর্বাবস্থায় পরম বাগ্মীতা, ভাষা শৈলীতা, সুন্দরতম গাঁথুনী, সুনিপুণতম সুরলহরী ব্যবহার করেছেন, যা উত্তমরূপে ও সুস্পষ্টরূপে, বাঞ্ছিত অর্থ শ্রোতা সাধারণের নিকট পৌঁছায়। আর সমুন্নত ও যথাযথ অর্থের সাথে সাযুজ্য রক্ষা করে এ ধরনের শব্দ ও বাক্যের সমাবেশ কেবলমাত্র তার জন্যেই সম্ভব, যিনি ভাষা শৈলীতা, সূক্ষ্ম অর্থসমূহ ও এতদুভয়ের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্কের উপর যথেষ্ট দক্ষতা ও পারদর্শিতার অধিকারী এবং যিনি পারিপার্শিকতা ও কাংখিত অর্থের গুণাগুণ বিবেচনা করে, অবস্থা ও মানের দাবি বজায় রেখে সর্বোত্তম শব্দ ও বাক্যসমূহকে নির্বাচন করতে সক্ষম। আর প্রভুর পক্ষ থেকে ওহী ও ইলহাম ব্যতীত এ ধরনের জ্ঞানগত দক্ষতা অর্জন কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

কোরানের আকর্ষণীয় সুরের সৌন্দর্য সমাহার ও আধ্যাত্মিকতা সকলের জন্যে এবং এর ভাষা শৈলিতা ও বগ্মিতা, আরবী ভাষা, তার প্রাঞ্জলতা ও বাক্যালংকারের কৌশল সম্পর্কে পারদর্শী ব্যক্তির জন্যে বোধগম্য। কিন্তু কোরানের ভাষা শৈলিতা ও বাগ্মিতার অলৌকিকত্ব, তার পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব, যিনি বাগ্মিতা ও বাকপটুতার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে পরম দক্ষতা ও পারদর্শিতায় অধিকারী। আর এ রকম কোন ভাষা বিশেষজ্ঞ, অন্যান্য বাগ্মিতাপূর্ণ ও প্রাঞ্জলতাপূর্ণ বক্তব্যের সাথে তুলনা করে স্বীয় যোগ্যতা পরীক্ষা করে থাকেন। আরব কবি, সাহিত্যিক ও গায়করা এ কর্মটি দক্ষতার সাথে সমাপ্ত করতেন। কারণ আরবদের বৃহত্তম শিল্প ছিল বাকপটুতা, যা কোরান অবতীর্ণ হওয়ার সময়

চরম বিকাশ লাভ করেছিল এবং সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাসমূহকে সমালোচনা ও বিচার–বিশ্লেষণ করে সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হিসেবে নির্বাচন ও উপস্থাপন করতেন।

মূলতঃ প্রভুর প্রজ্ঞা ও অনুগ্রহের দাবি এটাই যে, প্রত্যেক নবীকে (আঃ) সমসাময়িক কালের প্রচলিত জ্ঞান ও শিল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মু'জিযাহ প্রদান করবেন, যাতে মানবকীর্তির উপর তার অলৌকিক শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। যেমন ঃ ইমাম হাদী (আঃ) এর নিকট ইবনে সিক্কিয়াত জানতে চেয়েছিল ঃ "মহান আল্লাহ কেন মু'জিযাহ হিসেবে হযরত মুসাকে (আঃ) দিয়েছিলেন শুভ্রোজ্জ্বল হাত ও ড্রাগণ বা বিশালাকার সর্পে রূপান্তরিত হতে সক্ষম যষ্টি এবং হযরত ঈসাকে (আঃ) দিয়েছিলেন অসুস্থতা থেকে আরোগ্যদানের ক্ষমতা; আর ইসলামের নবীকে (সঃ) দিয়েছিলেন পবিত্র কোরান ?" জবাবে ইমাম হাদী (আঃ) বললেন ঃ হযরত মুসার (আঃ) সময় প্রচলিত নৈপুণ্য ছিল যাদুবিদ্যার। আর এ জন্যে মহান আল্লাহ তাঁকে জনগণের ক্রিয়াকলাপের সদৃশ মু'জিযাহ প্রদান করেছেন, যাতে ঐ রকম (মু'জিযাহ) কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে পারে। আবার হযরত ঈসার (আঃ) সময় প্রচলিত ছিল নিপূণ চিকিৎসাবিদ্যা। তাই মহান আল্লাহ তাঁকে নিরাময়ের অযোগ্য রোগ থেকে মুক্তিদানের জন্যে মু'জিযাহ দিয়েছেন, যাতে এর অলৌকিকত্ব সম্পর্কে উত্তমরূপে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সময় প্রচলিত ছিল বাগ্মিতা, শোকগাঁথা ও কাব্যিক নৈপূণ্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরানকে সুন্দরতম রূপে অবতীর্ণ করেছেন, যাতে এর আলৌকিকতাপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হতে পারে।[১]

তদানিন্তন সময়ের ওয়ালীদ ইবনে মু'গাইরায়ে মাখযুমি, ওৎবাহ ইবনে রাবিয়া, তোফাইল ইবনে আমরের মত উচ্চতর পর্যায়ের ভাষাবিশারদগণও, কোরানের পরম বাগ্মিতা ও বাকপটুতার এবং মানুষের উৎকৃষ্টতম বাক্যালংকার সমন্বিত বক্তব্যের উপর এর শ্রেষ্ঠত্বের কথা নির্দিধায় স্বীকার করেছেন।[২] প্রায় এক শতাব্দী পর আবিল আওজা, ইবনে মুক্বফ্ফা, আবু শাকির দীসানী এবং আব্দুল মালিক বাসরির মত ব্যক্তিবর্গ সিদ্ধান্ত নিলেন কোরানের সাথে স্বীয়

১। উসুলে কাফি, খণ্ড –১, পৃঃ–২৪।
২। আ'লামুল ওয়ারি ঃ পৃঃ ২৭,২৮ পৃঃ ৪৯, সীরাতে ইবনে হিশাম ঃ খঃ-১, পৃষ্ঠা- ২৯৩, ৪১।

যোগ্যতার তুলনা করবেন। অতঃপর পূর্ণ এক বছর এ কর্মে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু নূন্যতম কর্মও প্রদর্শন করতে পারেন নি। অবশেষে এ ঐশীগ্রন্থের বিরাটত্বের সম্মুখে অক্ষম ও হতবিহ্বল হয়ে পরজয় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যখন মসজিদুল হারামে তাদের এক বছরের কর্মের বিচার-বিশ্লেষণ চলছিল, তখন ইমাম সাদিক (আঃ) তাদেরকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন এবং কেরোনের এ আয়তটি আবৃত্তি করছিলেন ঃ

قل لئن اجتمعت الانس والجنّ على ان يأتوا بمثل هذا القرءان لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا

> বল, যদি এই কোরানের অনুরূপ কোরান আনয়নের জন্যে মানুষ ও জিন্ন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না। (সূরা ইসরা – ৮৮)

খ) নবীর (সঃ) উম্মী হওয়া ঃ

পবিত্র কোরান এমন এক গ্রন্থ যা তার ক্ষুদ্র কলেবরে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতিকে সমন্বিত করেছে। আর এ গুলোর প্রত্যেকটির পরিপূর্ণ পর্যালোচনার জন্যে একাধিক বিশেষজ্ঞ পরিষদের প্রয়োজন যারা বর্ষ পরম্পরায় এ গুলোর উপর গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় রত হবেন এবং পর্যায়ক্রমে এতে সন্নিবেশিত রহস্যসমূহ উদঘাটন করবেন। আর অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। কিন্তু সকল বাস্তবতা ও রহস্য উদঘাটন, ঐশীজ্ঞানের অধিকারী এবং মহান আল্লাহর অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত সম্ভব নয়।

এ বৈচিত্রের সমাহার যা সুগভীর ও সমুন্নত পরিচিতি, উচ্চতর ও অমূল্য চারিত্রিক নির্দেশনা, ন্যায় ও দৃঢ়তম আইন-কানুন, বান্দাদের জন্যে প্রজ্ঞাময় আচার নীতি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিয়ম, সর্বাধিক লাভজনক উপদেশ, শিক্ষণীয় ঐতিহাসিক বিষয়, গঠনমূলক প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার সর্বোত্তম নীতিসমূহ, এককথায় মানুষের ইহ ও পরলৌকিক কল্যাণের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল নীতিকে অভূতপূর্ব ও অভিনব পন্থায় এরূপে সমন্বিত করেছে যে, সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ স্বীয় যোগ্যতানুযায়ী তা থেকে উপকৃত হতে পারে।

জ্ঞান–বিজ্ঞান ও বাস্তবতার এ অপূর্ব সমন্বয় সাধন নিঃসন্দেহে

সাধারণ মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত কর্ম। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে, এ অপূর্ব সমন্বয়ের অধিকারী গ্রন্থটি, এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করেছে যিনি জীবনে কখনোই পাঠশালায় যাননি, কারও কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেননি, পত্রপৃষ্ঠে কলম চালাননি এবং যিনি সভ্যতা ও সংস্কৃতির দূরপ্রান্তে অবস্থিত এক পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। আরও অধিক আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, তাঁর চল্লিশ বছরের জীবনে নবুয়্যত ঘোষিত হওয়ার পূর্বে এ ধরনের বক্তব্যের কিছুই শ্রুত হয়নি। এমন কি নবুয়্যতের সময়েও, যা কিছু ওহীরূপ বিবৃত হত, তা সর্বদা এমন এক বিশেষ পদ্ধতি ও সূত্র এবং সাজুয্য বজায় রাখত যা সুস্পষ্টরূপে তাঁর অন্যসকল বক্তব্য থেকে স্বতন্ত্র ছিল। আর এ গ্রন্থ ও তাঁর অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য ছিল।

পবিত্র কোরান এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলে ঃ

وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون

তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি এবং সহস্তে কোন কিতাব লেখনি যে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে। (সূরা আনকাবুত-৪৮)

অপর এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

قل لوشاء الله ماتلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون

বল, আল্লাহর সেরূপ অভিপ্রায় হলে আমিও তোমাদের নিকট তা পাঠ করতাম না এবং তিনিও তোমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করতেন না। আমি তো এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করেছি, তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না ? (সূরা ইউনূস -১৬)

খুব সম্ভবত ঃ সূরা বাক্বারার নিম্নবর্ণিত আয়তটিও এ অলৌকিক বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করছে।

و ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله

আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর। (সূরা বাক্বারা-২৩)

উপরোক্ত আয়তটিতে " مثله "এর সাথে যুক্ত সর্বনামটি (ه)," عبدنا"

(অর্থাৎ আমাদের মনোনিত বান্দা) শব্দটির দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

সিদ্ধান্ত ঃ (অসম্ভব সত্ত্বেও যদি) আমরা ধরে নিই যে, শত শত গবেষক ও বিশষজ্ঞ দলের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমম্বয়ে এ ধরনের একটি পুস্তক প্রণয়ন সম্ভব, তবে কখনোই একজন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে, এ কর্ম সাধন সম্ভব বলে ধারণা করা যায় না।

অতএব এ বিচিত্র বৈশিষ্ট্য সমন্বিত গ্রন্থের প্রকাশ, বিশেষ করে এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে যিনি কারও নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেননি নিঃসন্দেহে এর অলৌকিত্বের অপর একটি দিক।

(গ) সুঙ্গতি ও বিরোধহীনতা ঃ

পবিত্র কোরান এমন এক গ্রন্থ, যা মহানবীর (সঃ) তেইশ বছরের রিসালাতের জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রিয় নবীর (সঃ) জীবনের এ অধ্যায়টি ছিল সংকটময় উত্থান-পতন, তিক্ত-মধুর ঘটনা বহুল। অথচ এ বিস্ময়কর অস্থিতিশীল অবস্থা, পবিত্র কোরানের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য ও অলৌকিক রীতি–পদ্ধতির উপর কোন প্রভাব ফেলেনি। আর বিষয়বস্তু ও গাঠনিক দিক থেকে এ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য এর অলৌকিকত্বের অপর দু'টি দিকের মতই একটি দিক বলে পরিগণিত। স্বয়ং পবিত্র কোরান এ সম্পর্কে বলে ঃ

افلا يتدبّرون القرءان ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

তবে কি তারা কোরান সম্পর্কে অনুধাবন করে না ? এটা যদি অল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও পক্ষ থেকে হত তবে তারা তাতে অনেক অসঙ্গতি পেত। (সূরা নিসা–৮২)

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক মানুষেরই কমপক্ষে দু'ধরনের পরিবর্তন ঘটে থাকে। একটি হল, পর্যয়ক্রমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে তার বক্তব্যে এর প্রতিফলন ঘটে। স্বভাবতঃই বিশ বছরের ব্যবধানে তার বক্তব্যসমূহের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। অপরটি হল, জীবনের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ বিভিন্ন মানসিকতা, আবেগ ও অনুভূতি যেমন ঃ আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও স্থৈর্যের সৃষ্টি করে। আর এ ঘটনাপ্রবাহের পরিবর্তন ব্যক্তির চিন্তা, কর্ম ও ব্যবহারে যথাযথ প্রভাব ফেলে এবং স্বভাবতঃই এ পরিবর্তনের তীব্রতা তার বক্তব্যের মানেও তীব্র প্রভাব ফেলে। প্রকৃত পক্ষে বক্তব্যের পরিবর্তন, বিভিন্ন

মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের অনুগামী, যা স্বয়ং প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের অনুগামী।

এখন যদি ধারণা করি যে, পবিত্র কোরান মহানীব (সঃ) এরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত কীর্তি, যিনি উল্লিখিত পরিবর্তনশীল অবস্থার সীমানায় অবস্থান করেছেন, তবে তাঁর জীবনের এ অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে সংগত কারণেই বিন্যাস ও বিষয়বস্তুতে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়ার কথা। অথচ এ ধরনের কোন দ্বৈততার লেশমাত্র পবিত্র কোরানে নেই।

অতএব আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, কোরানের বিষয়বস্তু ও অলৌকিক সাহিত্যমানের মধ্যে সুসংগতি ও বিরোধহীনতা এ পবিত্র গ্রন্থ যে, এক অটুট ও অসীম জ্ঞানের আধার থেকে রূপ লাভ করেছে, তারই অপর একটি নিদর্শন, যা প্রকৃতির উর্ধ্বে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির অনুগত নয়।

পাঠ -১৩

কোরান বিকৃতি থেকে মুক্ত

- ভূমিকা
- পবিত্র কোরানে অতিরিক্ত কোন কিছু সংযুক্ত হয়নি
- পবিত্র কোরান থেকে কোন কিছু হ্রাস পায়নি

ভূমিকা ঃ

যেমনটি ইতিপূর্বে ইংগিত করা হয়েছে যে, নবুয়্যতের অপরিহার্যতার দলিলের আবেদন হল আল্লাহর বাণীকে সম্পূর্ণ অবিকৃত ও সংরক্ষিত অবস্থায় মানুষের নিকট পৌঁছানো যাতে এর মাধ্যমে তারা ইহ ও পরকালীন সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে।

অতএব মানুষের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত, অন্যান্য ঐশীগ্রন্থের মতই অবিকৃত ও সংরক্ষিত ছিল এ ব্যাপারে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। তবে আমরা জানি যে, অন্যান্য ঐশীগ্রন্থসমূহ মানুষের হস্তগত হওয়ার পর কমবেশী বিচ্যুতি ও বিকৃতির সম্মুখীন হয়েছিল অথবা কালের আবর্তে হারিয়ে গিয়েছিল। যেমন ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত নূহ (আঃ) এর কিতাবের কোন চিহ্নমাত্র আজ আর আমাদের হাতে নেই এবং হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) কিতাব প্রকৃতরূপে পাওয়া যায় না।

অতএব প্রশ্নের অবকাশ থাকে, আমাদের নিকট এখন ঐশীগ্রন্থ হিসেবে যা বিদ্যমান, কোথা থেকে আমরা জানব যে, এটা ঠিক সেই গ্রন্থই যা স্বয়ং হযরত নবী (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং এতে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেনি অথবা কোন কিছুই এতে সংযোজন হয়নি কিংবা কোন কিছুই এ থেকে হ্রাস পায়নি ?

তবে যদি কেউ ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান রাখেন অথবা কোরানের সংকলন ও সংরক্ষণের ব্যাপারে মহানবী (সঃ) ও তার পবিত্র উত্তরাধিকারীগণের (আঃ) প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবগত থাকেন তদনুরূপ যদি কোরানের আয়াত মুখস্থ করণের ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানতে পারেন, (যেমন ঃ শুধুমাত্র এক যুদ্ধেই সত্তর হাজার কোরানের হাফেজ শহীদ হয়েছিলেন)। অনুরূপ দীর্ঘ চৌদ্দশত বছরে যদি কোরানের বহুল প্রচারিত হওয়ার কথা এবং আয়াত সংখ্যা, শব্দ ও অক্ষর সংখ্যা ইত্যাদির গণনায় মুসলমানদের অক্লান্ত শ্রম সম্পর্কে ধারণা রেখে থাকেন তবে তিনি কখনোই এ পবিত্র গ্রন্থের ন্যূনতম বিকৃতি ঘটেছে বলে মনে করতে পারেন না। তবে ইতিহাসের এ বিশ্বস্ত সূত্রের সাহায্য ছাড়াও কোরানের পবিত্রতাকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও উদ্ধৃতিগত দলিলের সমষ্টিগত আলোচনার মাধ্যমেও ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ

সর্বপ্রথমে কোরানে কোন কিছু সংযোজিত হওয়ার বিষয়টিকে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করা যেতে পারে। অতঃপর আমাদের হাতে বিদ্যমান এ কোরান যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে তা প্রমাণিত হওয়ার পর পবিত্র কোরানের আয়াতের মাধ্যমে এ থেকে কোন কিছু হ্রাস বা ঘাটতি না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করা যেতে পারে।

অতএব কোন প্রকার বিকৃতি থেকে সম্মানিত গ্রন্থ কোরানের সংরক্ষিত থাকা সম্পর্কে আমরা দু'টি স্বতন্ত্র শিরোনামে আলোচনা করব।

পবিত্র কোরানে অতিরিক্ত কোন কিছু সংযুক্ত হয়নি ঃ

পবিত্র কোরানে অতিরিক্ত কোন কিছু সংযুক্ত হয়নি, এ ব্যাপারে সকল মুসলমানই একমত। এমনকি বিশ্বের সকল বিজ্ঞজনই এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষন করেন। এমন কোন ঘটনাই ঘটেনি, যা কোরানে কোন কিছু সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাব্য উৎস হবে এবং এ ধরনের সম্ভাবনার কোন প্রমাণ নেই। উপরন্তু পবিত্র কোরানে কোন কিছু সংযোজিত হওয়ার বিষয়টিকে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে নিম্নরূপে অগ্রাহ্য করা যায় ঃ

যদি মনে করা হয় যে, কোন একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় পবিত্র কোরানে সংযোজিত হয়েছে তবে তার অর্থ হল, কোরানের সদৃশ কিছু আনা সম্ভব হয়েছে। আর এ ধরনের ধারণা, কোরানের অলৌকিকতা ও এর সমকক্ষ কিছু করতে মানুষের অপরাগতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারেনা। যদি মনে করা হয় যে, শুধুমাত্র এক শব্দ অথবা একটি ক্ষুদ্র আয়াত (যেমন ঃ مدهامّتان)[১] সংযোজিত হয়েছে –যার অপরিহার্য অর্থ হল বক্তব্যের শৃংখলা বিনষ্ট হওয়া ও আলৌকিকতাপূর্ণ প্রকৃতরূপ থেকে বিচ্যুত হওয়া। আর এ রকমটি হলে, তা হবে অনুকরণযোগ্য ও সাদৃশ্য আনয়নযোগ্য। কারণ কোরানের সুবিন্যস্ত বিষয়বস্তুর অলৌকিকত্ব, শব্দ ও অক্ষরের নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এর ব্যতিক্রম ঘটলে কোরানের অলৌকিকত্ব হারায়।

১। সূরা আর্ রাহমান – ৬৪।

অতএব যে দলিলের উপর ভিত্তি করে পবিত্র কোরানের অলৌকিকত্ব প্রমাণিত হয়, ঠিক সে দলিলের মাধ্যমেই কোন প্রকারের অতিরিক্ত সংযোজন থেকে সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমনকরে একই দলিলেই শব্দ ও বাক্যের অনুপস্থিতি ঘটার ফলে কোরানের অলৌকিকত্ব বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারটিও নিষিদ্ধ হয়ে থাকে। তবে একটি পূর্ণ সূরা বা একটি পূর্ণ বিষয়ের ঘাটতি না ঘটার ব্যাপারটি প্রমাণের জন্যে অন্য এক প্রকার দলিলের প্রয়োজন। কারণ এরূপ ঘাটতি, অন্য কোন আয়াতের অলৌকিকত্বের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না।

পবিত্র কোরান থেকে কোন কিছু হ্রাস পায়নি ঃ

প্রখ্যাত শিয়া ও সুন্নী আলেমগণ সুস্পষ্ট ভাষায় গুরুত্বারোপ করেন যে, যেমনিকরে পবিত্র কোরানে অতিরিক্ত কোন কিছু সংযোজিত হয়নি, ঠিক তেমনি এ থেকে কিছুই হ্রাস পায়নি। আর এ বিষয়কে প্রমাণের জন্যে তারা অসংখ্য যুক্তির অবতারণা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর হাদীসগ্রন্থসমূহে কিছু কিছু প্রতারণাপূর্ণ রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতির ফলে এবং কোন কোন বিশ্বস্ত রেওয়ায়েতের ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যার কারণে[১] কেউ কেউ ধারণা করেছেন, এমনকি অনুমোদন দিয়েছেন যে, কোরানের কোন আয়াত বাদ পড়েছে।

তবে যে কোন প্রকারের বিচ্যুতি (হ্রাস বা বৃদ্ধি) থেকে কোরানের মুক্ত থাকার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক সূত্র ব্যতীত এবং শব্দ বা আয়াতের ঘাটতি কোরানের অলৌককতাপূর্ণ বিন্যাস ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে, মু'জিযাহর দলিলের মাধ্যমে তা অগ্রাহ্য হওয়া ছাড়াও কোন আয়াত বা পূর্ণাঙ্গ সূরার ঘটতি থেকে কোরান সংরক্ষিত থাকার বিষয়টি স্বয়ং পবিত্র কোরানের মাধ্যমেই প্রমাণ করা যেতে পারে।

অর্থাৎ বিদ্যমান সমস্ত কোরান আল্লাহর কালাম এবং কোন কিছুই

১। যেমন ঃ যে সকল রেওয়ায়েত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাগুলোর কিছু কিছু দৃষ্টান্ত বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে অথবা ভ্রান্ত ব্যাখ্যাসমূহে ও তাৎপর্যগত বিচ্যুতির পরিবর্জনে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো থেকে এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, কোন শব্দ বা বিষয়ের বাদ পড়ার স্বপক্ষে দলিল বিদ্যমান।

এতে সংযোজিত হয়নি এ বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার পর, এর আয়াতসমূহকে দৃঢ়তম উদ্ধৃতিগত বিশ্বাসগত ও চূড়ান্ত দলিল রূপে উপস্থাপন করা যায়। কোরানের এরূপ একটি আয়াত থেকে আমার জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ যেকোন প্রকার বিচ্যুতি থেকে এ কোরানকে সংরক্ষণ করার নিশ্চয়তা দিয়েছেন, যা অন্যান্য ঐশীগ্রন্থসমূহের ব্যতিক্রম। কারণ ঐ গুলোর সংরক্ষণের দায়িত্ব মানব সম্প্রদায়ের উপর অর্পণ করেছিলেন। যেমন ঃ ইহুদী ও নাসারাদের আলেমদের ব্যাপারে পবিত্র কোরানে এসেছে --

بما استحفظوا من كتاب الله و كانوا عليه شهداء

কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল তার সাক্ষী। (সূরা মায়িদাহ -৪৪)

উল্লেখিত বিষয়টি কোরানের নিম্নলিখিত আয়াত থেকে অনুধাবন করা যায় ঃ

انا نحن نزّلنا الذكرو انا له لحافظون

আমরাই কোরান অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমরাই উহার রক্ষক। (সূরা হিজর-৯)

এ আয়াতটি দু'টি বাক্যের সমম্বয়ে গঠিত হয়েছে। প্রথম বাক্যটিতে "انا نحن نزّ لنا الذكر" অর্থাৎ নিশ্চয় আমরাই এ কোরান নাযিল করেছি -এর মাধ্যমে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, পবিত্র কোরান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযিল হয়েছে এবং অবতীর্ণ হওয়ার সময় এতে কোন প্রকার বিকৃতি ঘটেনি। অপর বাক্যে যথা ঃ وانا له لحافظون "এবং নিশ্চয় আমরাই একে সংরক্ষণ করব" -এর মাধ্যমে এবং গুরুত্ব প্রদানকারী প্রত্যয়সমূহ ও বাক্যের গঠনে এর অবিরত অবস্থার উপর গুরুত্বারোপের মাধ্যমে, যে কোন প্রকার বিকৃতির হাত থেকে কোরানের সার্বক্ষণিক সংরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

বর্ণিত আয়াতটি কোরানে অতিরিক্ত কোন কিছু সংযোজিত না হওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করলেও এ ধরনের বিকৃতিকে নিষিদ্ধকরণের জন্যে এ যুক্তির অবতারণা এক ধরনের আবর্তন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কারণ কোরানে কোন কিছু সংযোজিত হওয়ার ধারণা এ আয়াতটিকেও সমন্বিত করে। ফলে এ ধরনের ধারণাকে স্বয়ং ঐ আয়াতের মাধ্যমে অগ্রাহ্য করা সঠিক হতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ঐ ধারণাকে কোরানের অলৌকিকত্বের দলিলের মাধ্যমে বর্জন করেছিলাম । অতঃপর এ আয়াতটির মাধ্যমে আয়াত বা পূর্ণ সূরার

ঘাটতি লাভ (এমনরূপে যে, এর অলৌকিকত্বপূর্ণ বিন্যাস ব্যবস্থার কোন ক্ষতি হয়না) থেকে সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারটিও প্রতিপাদন করেছিলাম। আর এভাবেই হ্রাস বা বৃদ্ধির মত যে কোন প্রকার বিকৃতি থেকে পবিত্র কোরানের সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও উদ্ধৃতিগত দলিলের সমন্বয়ে প্রমাণিত হয়।

পরিশেষে এ বিষয়টি স্মরণ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি যে, সকল প্রকারের বিকৃতি থেকে কোরান সংরক্ষিত থাকার অর্থ এ নয় যে, যেখানেই কোরান নামে কোন গ্রন্থ পাওয়া যাবে, তা-ই পূর্ণ কোরান হবে এবং মুদ্রণজনিত ও সূত্রগত সকল প্রকার ত্রুটির উর্ধ্বে থাকবে অথবা এর কোন প্রকারের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যগত ত্রুটি অসম্ভব কিংবা এর আয়াত ও সূরাসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার ক্রমানুসারে সজ্জিত হয়েছে। বরং এর অর্থ হল এই যে, কোরান মানুষের নিকট এরূপে বিদ্যমান থাকবে যে, সত্যানুসন্ধিৎসুগণ সকল আয়াতসমূহকেই এমনরূপে পাবে, ঠিক যে রূপে অবতীর্ণ হয়েছে।

অতএব এ কোরানের কোন কোন খণ্ডের অসম্পূর্ণতা ও অশুদ্ধি অথবা পঠন প্রক্রিয়ার বিভিন্নতা কিংবা অবতীর্ণ হওয়ার ক্রমিকতার ব্যতিক্রমে আয়াত ও সূরাসমূহের পুনর্বিন্যাস অথবা তাৎপর্যগত বিকৃতি ও বিচিত্র প্রকারের তাফসির বা ব্যাখ্যার উপস্থিতি, পূর্ববর্ণিত বিকৃতি থেকে কোরানের সংরক্ষিত থাকার সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না।

পাঠ – ১৪

ইসলামের সার্বজনীনতা ও চিরন্তনতা

- ভূমিকা
- ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম
- ইসলামের সার্বজনীনতার স্বপক্ষে কোরানের দলিল
- ইসলামের চিরন্তনতা
- কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

ভূমিকা ঃ

আমরা জেনেছি যে, সকল নবীর (আঃ) উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁদের বক্তব্যসমূহকে গ্রহণ করা অপরিহার্য (দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ–৯)। অনুরূপ কোন এক নবীকে অস্বীকার করা অথবা তার কোন একটি হুকুমকে অস্বীকার করা প্রকারান্তরে আল্লাহর বিধিগত প্রতিপালনকে অস্বীকার করা ও ইবলিসের মতই অবাধ্য হওয়ার শামিল।

অতএব ইসলামের নবী (সঃ) এর রিসালাতকে প্রতিপাদন করার পর তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সকল আয়াতের প্রতি ও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আনিত সকল বিধি–নিষেধের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য ।

কিন্তু সকল নবী (আঃ) ও ঐশী গ্রন্থসমূহের উপর বিশ্বাস করার ফলে সকল শরীয়তানুসারে কর্ম সম্পাদন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে না। যেমন ঃ মুসলমানরা সকল উলুল আজম (আঃ) ও সকল ঐশীকিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। কিন্তু পূর্ববর্তী শরীয়তানুসারে কার্য সম্পাদন করতে পারে না বা করা নিষিদ্ধ। ইতিপূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি যে, সকলকেই তাদের সংশ্লিষ্ট নবীর আদেশানুসারে কর্ম সম্পাদন করতে হবে (দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ–৯) ।

অতএব সকল মানুষের জন্যে ইসলামের শরীয়তের অনুসরণ তখনই অপরিহার্য হবে, যখন ইসলামের নবীর (সঃ) রিসালাত কোন নির্দিষ্ট গোত্রের বা জাতির (যেমন ঃ আরব) জন্যে নির্ধারিত না হবে এবং তদনুরূপ যখন তাঁর পরে অন্য কোন নবীর আবির্ভাব না ঘটে, যার ফলে তাঁর শরীয়ত রহিত হবে কিংবা অন্য কথায় ঃ যখন ইসলাম সার্বজনীন ও চিরন্তন ধর্ম হবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টিকে আলোচনার বিষয়রূপে বিবেচনা করা অপরিহার্য যে, ইসলামের নবী (সঃ) এর রিসালাত কি সার্বজনীন ও চিরন্তন, নাকি কোন নির্দিষ্ট গোত্র ও কালের জন্যে সীমাবদ্ধ ?

এটা সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের কোন বিষয়কে নির্ভেজলা বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা যায় না। বরং উদ্ধৃতিগত ও ঐতিহাসিক বিষয়ের উপর গবেষণা পদ্ধতির সাহায্য নেয়া উচিৎ । অর্থাৎ বিশ্বস্ত কোন সূত্র ও

সনদের শরণাপন্ন হতে হবে। যদি কেউ পবিত্র কোরানের সত্যতা কিংবা ইসলামের নবীর (সঃ) নবুয়্যত ও ইসমাত সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে, তবে তার জন্যে কিতাব ও সুন্নতের চেয়ে বিশ্বস্ত কোন সনদ থাকতে পারেনা।

ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম ঃ

ইসলাম সার্বজনীন ধর্ম এবং কোন নির্দিষ্ট গোত্র ও স্থানের জন্যে নির্ধারিত না থাকা, এ ঐশী ধর্মের অপরিহার্য শর্ত। এমনকি যারা এ ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেনি তারাও জানে যে, ইসলামের আহ্বান হল সার্বজনীন এবং কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নয়।

এছাড়া এটা ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত যে, মহানবী (সঃ) বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান যেমন ঃ রোমের কাইসার, ইরানের বাদশাহ, মিশর, ইথিওপিয়া, সিরিয়ার অধিপতিগণ এবং তদনুরূপ আরবের বিভিন্ন গোত্রপতি ও অন্যান্যদের নিকট পত্র লিখেছিলেন। তাদের নিকট বিশেষ দূত প্রেরণ করেছেন এবং সর্বসাধারণকে এ পবিত্র দ্বীনের ছায়ায় আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সাথে এ দ্বীনকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।[১] আর যদি ইসলাম বিশ্বজনীন না হত তবে এ ধরনের উদাত্ত আহবান জানাতেন না এবং তখন অন্যান্য জাতি ও গোত্রের জন্যে এ দ্বীনকে গ্রহণ না করার যথেষ্ট অজুহাতের অবকাশ থাকত।

অতএব ইসলামের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও এ শরীয়তানুসারে কার্য সম্পাদনের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করা যায় না। ফলে কাউকেই এ দ্বীনের অনুসরণের দায়িত্ব থেকে ব্যতিক্রম মনে করা সম্ভব নয়।

ইসলামের সার্বজনীনতার স্বপক্ষে কোরানের দলিল ঃ

যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ ধরনের বিষয়সমূহকে প্রমাণের জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও বিশ্বস্ত সনদ হল কোরান, যার বিশ্বস্ততা ও সত্যতা

১। মহানবী (সঃ) এর পত্রসমূহ ইতিহাসের একাধিক বিশ্বস্ত গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে 'মাকাতিবুর রাসূল' নামক গ্রন্থে এ গুলোকে একত্র করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী পাঠসমূহে সুস্পষ্টরূপে আলোচনা করা হয়েছে। যদি কেউ এ ঐশী গ্রন্থটি মোটামুটি একবার পাঠ করে থাকেন তবে দেখতে পাবেন যে, এর আহ্বান সর্বসাধারণ ও সার্বজনীন এবং বিশেষ কোন গোত্র, জাতি ও ভাষার জন্যে নির্ধারিত নয়।

বিশেষ করে অধিকাংশ আয়াতেই সকল মানুষকে يا ايها الناس অর্থাৎ হে মানুষ[১] ও يا بني ادم হে আদম সন্তান;[২] রূপে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সকল মানুষকে (الناس[৩] এবং العالمين[৪]) এ হিদায়াতের পথে আহ্বান জানিয়েছে। অনুরূপ অনেক আয়াতে মহানবী (সঃ) এর রিসালাতকে সকল মানুষের জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে (الناس[৫] এবং العالمين)[৬] এবং এ রকমই একটি আয়াতে তাঁর আহ্বান, যে কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে তার জন্যে প্রযোজ্য হবে বলে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[৭] অপরদিকে অন্যান্য দ্বীনের অনুসারীদেরকে আহলুলকিতাব (اهل الكتاب) বলে সম্বোধন ও ভর্ৎসনা করেছেন[৮] এবং মহানবীর (সঃ) রিসালাতকে তাদের উপর সুস্থিত করেছেন। আর সেই সাথে অন্যান্য দ্বীনের উপর ইসলামের বিজয়কে পবিত্র কোরান অবতীর্ণ করার মূল উদ্দেশ্যরূপে বিবেচনা করেছেন।[৯]

অতএব এ আয়াতসমষ্টির আলোকে, কোরানের আহ্বানের সার্বজনীনতা ও পবিত্র দ্বীন ইসলামের বিশ্বজনীনতা সম্পর্কে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকতে পারে না।

১। বাক্বারা -২১, নিসা -১, ১৭৪, ফাতির-১৫।
২। আ'রাফ -২৬, ২৭, ২৮, ৩১, ৩৫, ইয়াসীন -৬০।
৩। বাক্বারা -১৮৫, ১৮৭, আল ইমরান -১৩৮, ইব্রাহীম-১, ৫২, জাছিয়া -২০, যুমার-৪১, নহল-৪৪, কাহাফ-৫৪, হাশর-২১।
৪। আনআম -৯০, ইউসুফ -১০৪, সাদ-৭৮, তাক্বভির -২৭, কালাম-৫২।
৫। নিসা-৭৯, হাজ্জ-৪৯, সাবা-২৮।
৬। আম্বিয়া -১০৭, ফোরক্বান-১।
৭। আনআম-১৯।
৮। আল ইমরান-৬৫, ৭০, ৭১, ৯৮, ৯৯, ১১০, মায়িদাহ -১৫, ১৯।
৯। তওবাহ -৩৩, ফাতহ -২৮, সাফ-৯।

ইসলামের চিরন্তনতা ঃ

উল্লেখিত আয়াতসমূহ সাধারণ শব্দসমষ্টি (যেমন ঃ বনি আদম, নাস ও আলামিন) এবং অনারব ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকে (যেমন ঃ ইয়া আহলাল কিতাব) আহ্বানের মাধ্যমে, ইসলামের সার্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতার প্রমাণ বহন করে। তদনুরূপ কালের সীমাবদ্ধতাকে দূরীকরণের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট সময়ের শর্তের আওতাবহির্ভূত করা হয়েছে। বিশেষ করে 'لیظهره علی الدین کله' অর্থাৎ সমস্ত দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্যে[১] –এ বক্তব্যটির পর আর কোন প্রকার দ্বিধার অবকাশ থাকে না। এ ছাড়া নিম্নলিখিত আয়াতটির মাধ্যমে যুক্তি প্রদান করা যেতে পারে ঃ

وانة لکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید

নিশ্চয় এটা এক সম্মানিত গ্রন্থ, অগ্র ও পশ্চাৎ কোন মিথ্যাই এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। এটা প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (ফুস্‌সিলাত-৪২)

এ আয়াতটি এ যুক্তির অবতারণা করে যে, পবিত্র কোরান কখনোই তার নির্ভুলতা ও বিশ্বস্ততা হারাবে না। অপরদিকে মহানবী (সঃ) এর মাধ্যমে নবুয়্যতের ধারার সমাপ্তির (যা অন্য একটি পাঠে আলোচনা করা হবে) দলিলের উপস্থিতিতে অন্য কোন নবী ও শরীয়তের মাধ্যমে এ ঐশী দ্বীনের রহিতকরণের সকল সম্ভাবনা পরিত্যাক্ত হয়। অনুরূপ এ বিষয়ের উপর অসংখ্য রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ

حلال محمد حلال الی یوم القیامة وحرامه حرام الی یوم القیامة

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক যার বৈধতা প্রদত্ত হয়েছে তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত বৈধ, আর যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকবে।[২]

তদুপরি বিশ্বজনীনতার মতই ইসলামের চিরন্তনতাও এ ঐশী দ্বীনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, যা ইসলামের সত্যতার প্রমাণের অধিক কোন দলিলের

১। তাওবাহ-৩৩, ফাতহ-৩৮, সাফ –৯।
২। কাফি খণ্ড –১, পৃঃ-৫৭, খণ্ড–২, পৃঃ-১৭, বিহার খণ্ড–২, পৃঃ-২৬০ খণ্ড–২৪, পৃঃ-২৮৮ ওয়াসায়েলুশিয়া খণ্ড–১৮, পৃঃ-১২৪।

আবেদন করে না।

কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ঃ

ইসলামের শত্রুরা, যারা এ ঐশী দ্বীনের বিস্তার রোধ করতে বদ্ধপরিকর, তারা কোন প্রকার নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনেই পিছ পা হয়নি বা হবে না। যা হোক এখন তারা এ ভ্রান্ত ধারণা প্রচারে প্রয়াসী হয়েছে যে, ইসলাম শুধুমাত্র আরবদের জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্যান্য জনসমষ্টির জন্যে কোন প্রকার রিসালাত নিয়ে আসেনি !

বিশেষ করে এ আয়াতসমূহকে তারা ব্যবহার করেছেন যে, মহানবীকে (সঃ) নিজ আত্মীয়-স্বজন অথবা মক্কাবাসী ও মক্কার আশেপাশের লোকজনকে হিদায়াত করণের জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছিল। [১] অনুরূপ সূরা মায়িদাহর ৬৯ নং আয়াতটিতে ইহুদী, সাবেঈন ও খ্রীষ্টানদের প্রতি ইঙ্গিত করণের পর সৌভাগ্যের প্রতিশ্রুতিস্বরূপ ঈমান ও সৎকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সৌভাগ্যের শর্তরূপে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মত কোন নামই স্মরণ করা হয়নি। এ ছাড়া ইসলামের ফিকাশাস্ত্রে আহলে কিতাব ও মুশরিকরা একই স্তরে নয়। বরং জিযিয়াহ কর (খুমস ও যাকাত, যা মুলসলমানরা প্রদান করে তা ব্যতীত) প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী সরকারের শাসন ব্যবস্থায় তারা (আহলে কিতাব) নিরাপত্তা লাভ করতঃ স্বীয় শরীয়তানুসারে কার্য সম্পাদন করতে পারে, যা এ সকল ধর্মের স্বীকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ।

জবাব ঃ ঐ সকল আয়াত, যেগুলোতে মহানবী (সঃ) এর আত্মীয়-স্বজনকে ও মক্কাবাসীদেরকে আহ্বানের কথা স্মরণ করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাতে দাওয়াতের পর্যায়সমূহকে বর্ণনা করা হয়েছে, যা তাঁর স্বজন ও পরিজন থেকে শুরু করে মক্কা ও এর আশে-পাশের অন্যান্য জনগণ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এবং সর্বশেষে সমস্ত বিশ্ববাসীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছবে। আর এ ধরনের আয়াতকে ঐ সকল আয়াতের সীমাবদ্ধকারী হিসেবে মনে করা যায় না, যেগুলোতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর রিসালাতের বিশ্বজনীনতা ফুটে উঠেছে। কারণ এ সকল

১। শুয়ারা -২১৪, আনআম -৯২, শুরা-৭, সিজদাহ-৩, ক্বাসাস -৪৬, ইয়াসীন -৫, ৬।

আয়াতের বাচনভঙ্গি সীমাবদ্ধ করণের পরিপন্থী হওয়া ছাড়াও উল্লেখিত শর্তের অপরিহার্য ফলশ্রুতি হল অধিকাংশের সীমাবদ্ধকরণ (تخصيص الاكثر) যা বিজ্ঞসমাজে অশিষ্ট ও অগ্রহণযোগ্য হতে বাধ্য।

অপরদিকে সূরা মায়িদাহর উল্লেখিত আয়তটি এ বিষয়ের বর্ণনা করে যে, প্রকৃত কল্যাণ লাভের জন্যে কেবলমাত্র এ ধর্ম বা ঐ ধর্মের অনুসারী হওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং কল্যাণের চাবিকাঠি হল প্রকৃত বিশ্বাস এবং ঐ সকল কর্ম সম্পাদন, যেগুলো মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের জন্যে নির্ধারণ করেছেন। তদুপরি ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও চিরন্তনতার প্রমাণবহ দলিলানুসারে ইসলামের নবীর (সঃ) আবির্ভাবোত্তরে প্রত্যেক মানুষের নৈতিক দায়িত্ব হল এ দ্বীনের হুকুম-আহকামের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

যা হোক ইসলামে অন্যান্য কাফেরদের উপর আহলে কিতাবদের যে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, তার অর্থ ইসলামের আনুগত্য প্রকাশ ও এর আহকাম অনুসারে কার্য সম্পানের বাধ্যবাধকতা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া নয়। বরং ভব্যতাহেতু তাদের অধিকার রক্ষা করা হয়েছে বৈ কি। তবে শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস মতে এ সুযোগটুকুও সাময়িক এবং ইমাম মাহদীর (আঃ) (মহান আল্লাহ তাঁর আবির্ভাবকে তরান্বিত করুন) আবির্ভাবের পর তিনি তাদের জন্যে চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদান করবেন। আর তখন আহলে কিতাবদের সাথে ও অন্যান্য কাফেরদের মতই আচরণ করা হবে, যা আমরা নিম্নলিখিত আয়াতটি থেকে অনুধাবন করতে পারি ।

ليظهره على الدين كله

(ইসলামকে) সমস্ত দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্যে। (তওবাহ–৩৩)

পাঠ - ১৫

নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি

- ভূমিকা
- নবুয়্যতের ধারার পরিসমাপ্তির স্বপক্ষে কোরানের দলিল
- নবুয়্যতের ধারার পরিসমাপ্তির স্বপক্ষে হাদীসের দলিলাদি
- নবুয়্যতের ধারার পরিসমাপ্তির প্রকৃত রহস্য
- একটি ভ্রান্ত ধারণার জবাব

ভূমিকা ঃ

ইসলামের সার্বজনীনতার ভিত্তিতে এর রহিতকারী কোন নবীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। কিন্তু এ ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ থাকে যে, অন্য এক নবী ইসলামের প্রচারক রূপে আবির্ভূত হবেন। যেমন ঃ পূববর্তী অনেক নবীই এ ধরনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাদেঁর মধ্যে এক শ্রেণীর নবী শরীয়তের অধিকারী পয়গাম্বরগণের সমসায়িক ছিলেন। যেমন ঃ হযরত লুত (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সমসাময়িক এবং তাঁর শরীয়তের অনুসারী ছিলেন। আবার অন্য এক শ্রেণীর নবী ছিলেন, যারা শরীয়তের অধিকারী নবীগণের পরে আবির্ভূত হয়ে পূর্ববর্তী নবীর শয়ীয়তের অনুসরণ করেছিলেন। যেমন ঃ বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী-ই এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের নবী (সঃ)-এর মাধ্যমে নবুয়্যতের পরিসমাপ্তির বিষয়টিকে স্বতন্ত্ররূপে আলোচনা করব, যাতে এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণার কোন অবকাশ না থাকে ।

নবুয়্যতের ধারার পরিসমাপ্তির স্বপক্ষে কোরানের দলিল ঃ

ইসলামের পরম বিশ্বাসসমূহের মধ্যে একটি হল এই যে, নবুয়্যতের ধারা ইসলামের নবী (সঃ)-এর সাথে যবনিকারেখা টেনেছে এবং তাঁর পরে আর কোন নবী অসেননি বা আসবেও না। এমন কি বিধর্মীরাও জানে যে, এ বিষয়টি ইসলামের বিশ্বাসসমূহের অন্তর্গত এবং সংগত কারণেই প্রত্যেক মুসলমানকে এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে। দ্বীনের অন্যান্য অপরিহার্য বিশ্বাসসমূহের মতই এর কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। তদুপরি এ বিষয়টিকে একদিকে যেমন পবিত্র কোরানের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়, অপরদিকে তেমনি বহুল প্রচারিত বা মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমেও প্রমাণ করা যায়। পবিত্র কোরানে সুস্পষ্ট ভাষায় হযরত (সঃ) কে সর্বশেষ নবীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

ماكان محمّد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النّبيّن

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। (আহযাব –৪০)

ইসলামের শত্রুদের মধ্যে কেউ কেউ মহানবী (সঃ) এর মাধ্যমে নবুয়্যতের পরিসমাপ্তির ক্ষেত্রে এ আয়াতের দলিলত্ব সম্পর্কে দু'টি সমস্যার উল্লেখ করে থাকে ঃ

একটি হল ' خاتم ' (খাতাম) শব্দটি আংটি অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং সম্ভবতঃ এ আয়াতটিতেও এ অর্থেই (আংটি) স্থান পেয়েছে। অপরটি হল خاتم (খাতাম) সে সর্বজনস্বীকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে মনে করলে আয়াতের ভাবার্থ এই যে, (কেবলমাত্র) নবীগণের ধারাই হযরত (সঃ) এর মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হয়েছে - রাসূলগণের ধারা নয়।

যা হোক প্রথম সমস্যাটির জবাব এই যে, خاتم (খাতাম) অর্থ সমাপ্ত করার মাধ্যম مايختم به الشيء অর্থাৎ যার মাধ্যমে কোন কিছু সমাপ্ত করা হয় এবং আংটিও এ অর্থেই আংটি নামকরণ হয়েছে। কারণ (পূর্বে) পত্র এবং পত্রজাতীয় বিষয়সমূহের যবনিকা টানা হত আংটির মাধ্যমে মোহরাংকিত করে।

দ্বিতীয় সমস্যাটির জবাব এরূপ ঃ সকল রিসালাতের অধিকারী পয়গাম্বরই নবুয়্যতের মর্যাদায়ও অভিষিক্ত এবং নবীগণের ধারার পরিসমাপ্তির মাধ্যমে রাসূলগণের ধারারও পরিসমাপ্তি ঘটে। যেমনটি ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে[১] যে, নবী (نبي) অভিধাটি রাসূল (رسول) অভিধাটির চেয়ে ব্যাপক না হলে ও বিষয় বিশেষে নবী (نبي) পরিভাষার বিস্তৃতি রাসূল (رسول) পরিভাষাটির চেয়ে বিস্তৃততর।

নবুয়্যাতের ধারার পরিসমাপ্তির স্বপক্ষে হাদীসের দলিলাদি ঃ

ইসলামের নবী (সঃ) এর মাধ্যমে নবুয়্যতের পরিসমাপ্তির স্বপক্ষে শতশত হাদীস সুস্পষ্ট ও গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল 'হাদীসে মানযিলাত' এ হাদীসটি শিয়া এবং সুন্নী উভয় উৎস থেকেই বহুলভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসটির বিষয়বস্তুতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। নিম্নে 'হাদীসে মানযিলাতটি' বর্ণিত হল ঃ

১। বিহারুল আনোয়ার খণ্ড ঃ ৩৭, পৃষ্ঠাঃ- ২৫৪-২৮৯, সহীহ বোখারী খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ- ৫৮, সহী মুসলিম খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠা ঃ-৩২৩, সুনানে ইবনে মাজাহ্ খণ্ড ঃ ১, পৃঃ-২৮, মুস্তাদরাকুল হাকিম খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠা ঃ- ১০৯, মুসনাদি ইবনে হাম্বল খঃ ১, পৃঃ- ৩৩১,খঃ ২, পৃঃ- ৩৬৯, ৪৩৭।

যখন ইসলামের নবী (সঃ) মদীনা থেকে তাবুকের যুদ্ধে যাত্রা করলেন তখন আমীরুল মু'মিনিন আলীকে (আঃ) মুসলমানদের দায়িত্ব প্রদান করে স্বীয় স্থানে নিয়োগ দিয়েছিলেন। হযরত আলী (আঃ) এ জিহাদে অংশ গ্রহণের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবেন বলে কিছুটা দুঃখিত হলেন এবং তাঁর আঁখিযুগল থেকে পবিত্র অশ্রুরাশি গড়িয়ে পড়ল । ফলে মহানবী (সঃ) তাঁকে বললেন ঃ

اما ترضى اَن تكونَ مِني بِمَنزِلة هارُونَ مِن مُوسى الا انّهُ لانبىّ بعَدى

তুমি কি এতে তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে আমার সে সম্পর্ক হোক, যে সম্পর্ক ছিল হারুনের সাথে মুসার ? কোন প্রকার বিরতি না দিয়েই বললেন ঃ তবে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, আমার পরে আর কোন নবী আসবে না।

ফলে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ থাকে না। অপর একটি হাদীসটিতে মহানবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে –

ايّها الناس اِنّهُ لا نبى بعدِى و لا امّة بعدكم

হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমার পরে কোন নবী আসবে না এবং তোমাদের পরে কোন উম্মতও আসবে না।[১]

অনুরূপ অপর একটি হাদীসে হযরত (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ايّها الناس اِنّهُ لا نَبِىَّ بَعدى و لا سنّة بعد سُنّتى

হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমার পর আর কোন নবীর আবির্ভাব ঘটবে না এবং আমার সুন্নতের পর আর কোন সুন্নত নেই [২] ।

এছাড়া, 'নাহজুল বালাগাহর ' বেশ কয়েকটি খুতবায় [৩] এবং পবিত্র ইমামগণ (আঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত, দোয়াসমূহ ও যিয়ারতেও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যেগুলোর উদ্ধৃতি দিলে আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি পাবে।

---

[১]। ওয়াসায়েলুশিয়া ঃ খণ্ড-১, পৃঃ- ১৫, খিসাল খণ্ড-১পৃঃ- ৩২২, খন্ড-২পৃঃ- ৪৮৭।

[২]। ওয়াসায়েলুশিয়া ঃ খণ্ড-১৮, পৃঃ- ৫৫৫, মান লা ইয়াহযুরুহুল ফকিহ ঃ খণ্ড-৪, পৃঃ-১৬৩, বিহারুল আনোয়ার ঃ খণ্ড-২২, পৃষ্ঠ-৫৩১, কশফুলগাম্মাহ ঃ খণ্ড-১, পৃঃ-২১।

[৩]। 'নাহজুল বালাগাহ' খুতবা-১, ৬৯, ৮৩, ৮৭, ১২৯, ১৬৮, ১৯৩, ২৩০।

নবুয়্যতের ধারার পরিসমাপ্তির প্রকৃত রহস্য ঃ

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছিলাম[১] যে, নবীগণের একাধিক্য ও পূর্ববর্তী সময়ে পরম্পরায় আবির্ভাবের যথাযথ কারণ হল ঃ একদিকে পৃথিবীর সর্বত্র ও সকল জনসমষ্টির নিকট ঐশী রিসালাতের প্রচার, এক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। অপরদিকে নবীন সমাজের উদ্ভব, সম্পর্কের জটিলতা ও বিস্তৃতি, নতুন নিয়মের উদ্ভব অথবা পূর্ববর্তী নিয়মের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। অপরপক্ষে কালের আবর্তে অথবা অজ্ঞতা ও ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির স্বার্থ রক্ষার্থে যে বিকৃতি ও বিচ্যুতি সাধিত হয়েছে, তাতে অন্য এক নবী প্রেরণের মাধ্যমে ঐশী শিক্ষার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করণের প্রয়োজনীয়তা।

অতএব যদি পৃথিবীর সর্বত্র ঐশী রিসালাতের প্রচার একজন নবী এবং তাঁর সহচর ও উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে সম্ভব হয় অথবা এক শরীয়তের আহকাম ও কানুন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানব সমাজের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয় কিংবা উক্ত শরীয়তে নতুন কোন সমস্যা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান থাকে, তদনুরূপ কোন প্রকার বিকৃতি থেকে উক্ত শরীয়তের সংরক্ষিত থাকা ও অবিস্মৃত থাকার নিশ্চয়তা পাওয়া যায় তবে অন্য কোন নবীর আবির্ভাবের কোন কারণ থাকবে না।

তবে মানুষের সাধারণ জ্ঞান এ ধরনের শর্তসমূহকে চিহ্নিত করতে অপারগ এবং একমাত্র মহান আল্লাহই স্বীয় অসীম জ্ঞানের মাধ্যমে এ শর্তসমূহের বাস্তবায়ন কাল সম্পর্কে অবহিত আছেন। তিনিই পারেন নবুয়্যতের পরিসমাপ্তির ঘোষণা দিতে। আর এ কর্মটিই তিনি সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থে সম্পাদন করেছেন। কিন্তু নবুয়্যতের ধারার পরিসমাপ্তি মানে আল্লাহর সাথে তার বান্দাগণের হিদায়াতের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া নয়। বরং যখনই মহান আল্লাহ প্রয়োজন মনে করবেন তাঁর যোগ্য বান্দাগণকে অদৃশ্যের জ্ঞান প্রদান করতে পারবেন –যদিও তা নবুয়্যতের ওহী না হয় । যেমন ঃ শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, এ ধরনের জ্ঞান মহান আল্লাহ পবিত্র ইমামগণকে (আঃ) দান করেছেন। মহান আল্লাহর কৃপায় পরবর্তী পাঠসমূহে ইমামত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির আলোচনায় মনোনিবেশ করব।

---

[১]। এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে ৯ নং পাঠ দ্রষ্টব্য।

একটি ভ্রান্ত ধারণার জবাব ঃ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমারা অবগত হয়েছি যে, নবুয়্যতের পরিসমাপ্তির গুঢ় রহস্য হল ঃ প্রথমতঃ ইসলামের মহানবী (সঃ) তাঁর সহচর ও উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে স্বীয় রিসালাতের আহ্বান সমগ্র বিশ্ববাসীর কর্ণে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ সকল প্রকার বিকৃতি থেকে তাঁকে প্রদত্ত ঐশী গ্রন্থের সংরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে এবং তৃতীয়তঃ ইসলামের শরীয়ত এ জগতের শেষাবধি মানুষের সকল প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম।

কিন্তু কেউ হয়ত শেষোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে এরূপে সমস্যা উত্থাপন করতে পারেন যে, যেমনিকরে পূর্ববর্তী সময়গুলোতে সামাজিক সম্পর্কের জটিলতার কারণে নতুন আহকাম প্রণয়নের ও পূর্ববর্তী আহকামের পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে অন্য এক নবীর আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি ইসলামের নবী (সঃ) এর পরও সামাজিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে ও সামাজিক সম্পর্ক আরও জটিলতর হয়েছে। সুতরাং আমরা কোথা থেকে নিশ্চিত হব যে, এ ধরনের পরিবর্তন নতুন কোন শরীয়তের দাবি করেনি ?

জবাব ঃ যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিরূপ পরিবর্তন মূল নিয়মের পরিবর্তনের আবেদন করে, তা চিহ্নিত করা সাধারণ মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত কর্ম। কারণ আহকাম ও নিয়মের দর্শনের উপর আমাদের পূর্ণ জ্ঞান নেই। বরং ইসলামের চিরন্তনতা ও মহানবী (সঃ) এর খাতামিয়্যাতের দলিল থেকে উদঘাটন করতে পারি যে, ইসলামের মূল নিয়মের পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই।

তবে আমরা সামাজিক কোন কোন নতুন বিষয়ের প্রেক্ষাপটে নতুন কোন শর্তের আবেদন থাকাতে পারে তা অস্বীকার করি না। কিন্তু ইসলামের শরীয়তে এ ধরনের আংশিক নিয়ম প্রণয়নের জন্যে মূলনীতি ও পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে যাতে উপযুক্ত ব্যক্তিগণ ঐ মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নিয়ম প্রণয়ন করতঃ তা সমাজে প্রচলন করতে পারেন। এ বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্যে ইসলামী ফিকাহশাস্ত্রে বর্ণিত 'ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধিকার' (পবিত্র ইমাম ও ওয়ালীয়ে ফকীহ্) নামক আলোচ্য বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হবে।

পাঠ – ১৬

ইমামত

- ভূমিকা
- ইমামতের তাৎপর্য

ভূমিকা ঃ

মহানবী (সঃ) এর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর এ শহরের জনগণের স্বতস্ফূর্ত সমর্থন (যার ফলে সম্মানার্থে আনসার নামে ভূষিত হয়েছিলন) এবং মক্কা থেকে হিজরতকারী মুসলমানদের (মুহাজির) নিয়ে একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে এর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আর মাসজিদুন্নাবী একদিকে যেমন উপসনালয় ও ঐশী রিসালাতের প্রচার, প্রশিক্ষণ ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যার কেন্দ্র ছিল। অপরদিকে তেমনি মুহাজির ও সমাজের বঞ্চিত, নিগৃহীত মানুষের আশ্রয়স্থলও ছিল। এ মসজিদেই তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও জীবিকা নির্বাহের কর্মসূচী নেয়া হত। এখানেই বিচার-বিবাদের মীমাংসা এবং সামরিক সিদ্ধান্ত, যুদ্ধের জন্যে সৈন্য প্রেরণ, যুদ্ধের পৃষ্ঠপোষকতা ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। মোটকথা মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব সকল বিষয় মহানবী (সঃ)-এর মাধ্যমেই পরিচালিত হত। মুসলমনরাও হযরত (সঃ)-এর আদেশের আজ্ঞাবহ হওয়াটা নিজেদের নৈতিকদায়িত্ব মনে করতেন। কারণ মহান আল্লাহ রাজনৈতিক বিচার ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হযরত (সঃ)-এর নিঃশর্ত আনুগত্য করার আদেশ প্রদান[১] ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহেও তাঁর আজ্ঞাবহ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[২]

অন্য কথায় ঃ মহানবী (সঃ) নবুয়্যত, রিসালাত এবং ইসলামের আহকাম প্রচার ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ছাড়াও ইসলামী সমাজের নেতৃত্বের দয়িত্বে ও নিয়োজিত ছিলেন। বিচারকার্য ও সামরিক নেতৃত্ব ইত্যাদি এ থেকেই উৎকলিত হত। যেমনিকরে ইসলামে ইবাদত ও আচরণগত দায়িত্ব ছাড়াও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অধিকারগত ইত্যাদি কর্তব্যও বিদ্যমান, তেমনিকরে ইসলামের নবী (সঃ) প্রচার, প্রশিক্ষণ ও (আধ্যত্মিক) পরিচর্যার দায়িত্ব ছাড়াও মহান আল্লাহর নিকট থেকে ঐশী বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রেও দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়োছিলেন এবং সকল প্রকার প্রশাসনিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

১। আল ইমরান -৩২, ১৩২, নিসা -১২, ১৪, ৬৯, ৮০, মায়িদাহ -৯২, আনফাল -১, ২০, ৪৬, তওবাহ -৭১, নূর-৫১, ৫৪, ৫৬, আহযাব-৬৬, ৭১, হুজরাত-১৪, ফাতহ-১৬, ১৭, মুহাম্মাদ-৩২, মুজাদিলাহ -১২, মুমতাহিনাহ -১২, তাগাবুন -১২, জিন-২৩।

২। আলইমরান-১৫২, নিসা-৪২, ৫৯, ৬৫, ১০৫, মায়িদাহ-৪৮, হাজ্জ-৬৭, আহযাব-৬, ৩৬, মুজাদিলাহ-(৮-৯), হাশর-৭।

এটা অনস্বীকার্য যে, যদি কোন দ্বীন বিশ্বের শেষাবধি সকল প্রকার সামাজিক কর্তব্য পালনের দাবি করে তবে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। অনুরূপ যে সমাজ এ দ্বীনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সমাজ এ ধরনের কোন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তব্য থেকে নিরুদ্দিষ্ট থাকবে, যা ইমামত নামে অভিষিক্ত, তাও হতে পারে না।

কিন্তু কথা হল মহানবী (সঃ) এর তিরোধানের পর, কে এ দায়িত্ব লাভ করবেন ? এবং তা কার কাছ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন ? মহান আল্লাহ এ মর্যাদা যেরূপে মহানবীকে (সঃ) দিয়েছিলেন সেরূপে অন্য কাউকেও কি দিয়েছেন? এ দায়িত্বভার অন্য কারও গ্রহণের কোন বৈধতা রয়েছে কি ? নাকি মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এ মর্যাদা মহানবী (সঃ)-এর জন্যেই নির্ধারিত ছিল এবং অতঃপর মুসলিম জনতাই তাদের ইমাম নির্বাচন করবে ও তাকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে স্থান দিবে, তা-ও বিধিসম্মত ? মানুষের কি এ ধরনের কোন অধিকার আছে ? না নেই ?

আর এটিই হল শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে মূল বিরোধের বিষয়। অর্থাৎ একদিকে শিয়াদের বিশ্বাস যে ইমামত হল একটি ঐশী মর্যাদা, যা মহান আল্লাহ কর্তৃকই যথোপযুক্ত ও যোগ্যতম ব্যক্তিদেরকে প্রদান করা আবশ্যক। আর মহান আল্লাহ, মহানবী (সঃ) এর মাধ্যমে এ কর্মটি সম্পাদন করেছেন এবং আমীরুল মু'মিনিন আলীকে (আঃ) তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষনা করেছেন। অতঃপর তাঁরই সন্তানদের মধ্য থেকে পরম্পরায় বারজনকে ইমামতের মর্যাদায় অভিসিক্ত করছেন। অপরদিকে সুন্নি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, ইমামত নবী (সঃ)-এর তিরোধানের সাথে সাথে নবুয়্যত ও রিসালাতের মতই যবনিকায় পৌঁছেছে এবং এর পর থেকে ইমাম নির্বাচনের দায়িত্ব মানুষের উপর অর্পণ করা হয়েছে। এমনকি আহলে সুন্নাতের কোন কোন বিজ্ঞজন সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, যদি কেউ অস্ত্রের ভয় দেখিয়েও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তবে তার আনুগত্য করাও অন্যান্যদের জন্যে অপরিহার্য![১] স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি স্বৈরাচারী, অত্যাচারী ও প্রতারকদের অপরাধের জন্যে কতটা পথ উন্মুক্ত করে

১। আল আহকামুল সালতানিয়াহ, লিখেছেন আবু ইয়ালা এবং 'আস সাওয়াদুল আ'যাম' লিখেছেন আবুল কাশিম সামারকান্দি, পৃঃ ৪০-৪২।

দিয়েছে এবং মুসলমানদের অবক্ষয় ও বিভেদের পথে কতটা সহায়ক হয়েছে!

প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নাত ঐশী সম্পর্কহীন ইমামতের বৈধতা দিয়ে রাজনীতি থেকে ধর্মের পৃথকীকরণের প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছেন। আর শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, এটিই হচ্ছে ইসলামের সঠিক ও সত্য সুন্দর পথ থেকে এবং সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের পথ থেকে বিচ্যুতির মূল কারণ। অনুরূপ শতসহস্র ধরনের বিচ্যুতি ও বিপথগামিতার সূতিকাগারও এখানেই, যেগুলো মহানবী (সঃ) এর পরলোক গমনের পর থেকে মুসলমানদের মাঝে রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং করবে।

অতএব প্রতিটি মুসলমানের জন্যেই কোন প্রকার অন্ধ অনুকরণ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব ব্যতিরেকে এ বিষয়টির উপর পরিপূর্ণ গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানো অপরিহার্য।[১] আর সেই সাথে সত্য ও সঠিক মাযহাবের শনাক্তকরণের মাধ্যমে এর প্রচার ও প্রসারে সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিৎ।

উল্লেখ্য এ ব্যাপোরে ইসলামী বিশ্বের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করে ইসলামের শত্রুদের জন্যে সুযোগ করে দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এমন কোন কাজ করা যাবে না যা ইসলামী সমাজে ফাটল সৃষ্টি করবে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে নিজেদের পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বিনষ্ট হবে। আর এ ক্ষতির অংশীদার মুসলমানরাই হবে, যার ফলশ্রুতি মুসলিম সমাজব্যবস্থার দুর্বলতা বৃদ্ধি ব্যতীত কিছই নয়। কিন্তু মুসলমানদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্য সংরক্ষণ যেন, সঠিক ও সত্য মাযহাবের অনুসন্ধান ও শনাক্তকরণের জন্যে, অনুসন্ধান ও গবেষনার সুষ্ঠ পথকে রুদ্ধ না করে ফেলে। আর ইমামতের বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুষ্ঠ পরিবেশ যেন ব্যাহত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। মনে

১। সৌভাগ্যবশতঃ বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ের উপর একাধিক ভাষায় ও একাধিক পদ্ধতিতে শতসহস্র গ্রন্থ রচনা করে সত্যানুসন্ধিৎসুগণের জন্যে গবেষণার পথকে বিস্তৃত করেছেন। উদাহরণতঃ আবাকাতুল আনওয়ার, আল গাদির, দালায়িলুস সিদক, গায়াতুল মারাম এবং ইসবাতুল হুদাহ ইত্যাদি গ্রন্থের নাম উল্লেখ যোগ্য।

যারা পড়াশুনার যথেষ্ট সুযোগ পান না তারা 'আল মুরাজিয়াত' নামক একটি বই, যা শিয়া ও সুন্নী দু'জন মনীষীর মধ্যে বিনিময়কৃত পত্রসমূহের সমাহার, তা পড়তে পারেন। সৌভাগ্যবশতঃ বইটি বাংলায় অনুদিত করা হয়েছে।

রাখতে হবে, এ বিষয়গুলোর সঠিক সমাধানের উপর মুসলমানদের ভাগ্য এবং ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ নির্ভর করে।

ইমামতের তাৎপর্য ঃ

ইমামতের আভিধানিক অর্থ হল নেতা, পথপ্রদর্শক এবং যে কেউ কোন জনসমষ্টির নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহন করবে তাকেই ইমাম (امام) বলা হয়ে থাকে –হোক সে সত্য পথের অনুসারী কিংবা মিথ্যা পথের অনুসারী। যেমন ঃ পবিত্র কোরানে কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকদের সম্পর্কে (ائمة الكفر) অর্থাৎ কাফেরদের নেতারা (সূরা তওবাহ–১২) কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। তদনুরূপ মুসুল্লীরা নামাজের জন্যে যার পিছনে সমবেত হয়ে থাকেন, তাকে 'ইমামুল জামা'ত' নামকরণ করা হয়।

কিন্তু কালামশাস্ত্রের পরিভাষায় ইমামত হল ইহ ও পরলৌকিক সকল বিষয়ে ইসলামী সমাজের সর্বময় ও বিস্তৃত নেতৃত্ব প্রদান। ইহলৌকিক শব্দটি ইমামতের পরিসীমার ব্যাপকতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। নতুবা ইসলামী সমাজে ইহলৌকিক বিষয়াদিও দ্বীন ইসলামেরই অন্তর্ভুক্ত।

শিয়া সম্প্রদায়ের মতে এ ধরনের নেতৃত্ব কেবলমাত্র তখনই বৈধ হবে, যখন তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদিত হবে। আর প্রকৃতপক্ষে (সহকারী হিসেবে নয়) যিনি এ মর্যাদার অধিকারী হবেন, তিনি আহকাম ও ইসলাম পরিচিতির বর্ণনার ক্ষেত্রে সকল প্রকার ভুল–ভ্রান্তি থেকে সংরক্ষিত থাকবেন। অনুরূপ তিনি সকল প্রকার গুনাহতে লিপ্ত হওয়া থেকে পবিত্র থাকবেন। বস্তুতঃ পবিত্র ইমাম, একমাত্র নবুয়্যত ও রিসালাত ব্যতীত মহানবীকে (সঃ), মহান আল্লাহ প্রদত্ত সকল মর্যাদার অধিকারী হবেন। ইসলামের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য যেমন নিঃশর্তভাবে গ্রহণযোগ্য, তেমনি প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয়েও তাঁর আদেশ পালন করাও অপরিহার্য।

এভাবে শিয়া ও সুন্নী মাযহাবের মধ্যে ইমামতের ক্ষেত্রে তিনটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ঃ

প্রথমতঃ ইমামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত হতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ ইমামকে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে এবং সকল প্রকার ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ ইমামকে গুনাহ থেকে পবিত্র থাকতে হবে ।

তবে মা'সুম হওয়াটা ইমামতের সমকক্ষ নয়। কারণ শিয়া মাযহাবের মতে হযরত ফাতিমা যাহরাও (সালামুল্লাহ আলাইহা) মা'সুম ছিলেন, যদিও তিনি ইমামতের আধিকারিণী ছিলেন না। অনুরূপ হযরত মারিয়াম (আঃ) ও ইসমাতের অধিকারিণী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ আল্লাহর ওলীগণের মধ্যেও অন্য কেউ এ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, যদিও আমরা তাঁদের সম্পর্কে অবগত নই। বস্তুতঃ মা'সুম ব্যক্তিগণের পরিচয় মহান আল্লাহ কর্তৃক উপস্থাপিত না হলে তাঁদেরকে চিনা সম্ভব নয়।

পাঠ - ১৭

ইমাম থাকার প্রয়োজনীয়তা

- ভূমিকা
- ইমাম থাকার প্রয়োজনীয়তা

ভূমিকা ঃ

বিশ্বাসগত বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখেন না এমন অধিকাংশ মানুষই মনে করেন যে, শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে ইমামত প্রসঙ্গে বিরোধ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে শিয়াদের বিশ্বাস ঃ মহানবী (সঃ) 'আলী ইবনে আবি তালিবকে' (আঃ) ইসলামী সমাজের পরিচালনার জন্যে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু আহলে সুন্নাতের বিশ্বাস যে, এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি এবং জনগণ নিজেদের পছন্দ মত নেতা নির্বাচন করেছিল। তিনি (জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নেতা) তাঁর উত্তরাধিকারীকে ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচন করেছিলেন। তৃতীয় পর্যায়ে নেতা নির্বাচনের দ্বায়িত্ব ছয় সদস্য বিশিষ্ট গোষ্ঠীর নিকট অর্পণ করা হয়েছিল। অপরদিকে চতুর্থ খলিফাও আবার প্রথমবারের মত সাধারণ মানুষ কর্তৃক নির্বাচিত হয়োছিলেন। অতএব মুসলমানদের মধ্যে নেতা নির্বাচনের জন্যে সুনির্দিষ্ট কোন পন্থা ছিল না। ফলে চতুর্থ খলিফার পর যার সামরিক শক্তি অধিক ছিল, সে-ই এ স্থান দখল করেছিল, যেমন ঃ অনৈসলামিক দেশসমূহেও মোটামুটি এ প্রক্রিয়া বিদ্যমান।

অন্যকথায় ঃ তারা এ রকম মনে করেন যে, প্রথম ইমাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে শীয়াদের বিশ্বাস সেরূপ ,যেরূপ আহলে সুন্নাত প্রথম খলিফা কর্তৃক দ্বিতীয় খলিফার নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশ্বাস করেন, পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, মহানবী (সঃ) এর বক্তব্য মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি, কিন্তু প্রথম খলিফার বক্তব্য মানুষ গ্রহণ করেছিল !

কিন্তু প্রশ্ন হল, প্রথম খলিফা এ অধিকার কোথা থেকে পেয়েছিলেন ? আল্লাহর রাসূল (সঃ) (আহলে সুন্নাতের বিশ্বাস মতে) ইসলামের জন্যে কেন তার (প্রথম খলিফা) মত আন্তরিকতা প্রদর্শন করেননি এবং নব গঠিত ইসলামী সমাজকে অভিভাবকহীন অবস্থায় রেখে গেলেন অথচ যুদ্ধের জন্যে মদীনা থেকে অন্যত্র যাওয়ার সময়ও একজনকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন এবং যেখানে স্বয়ং তিনিই (এ বিষয়ের উপর) তাঁর উম্মতদের মধ্যে মতবিরোধ ও বিভ্রান্তির সংবাদ দিয়েছিলেন ? এছাড়া ও লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলতঃ মতবিরোধ সর্বাগ্রে এখানেই যে, ইমামত কি এক ধর্মীয় মর্যাদা, যা ঐশী বিধানের অনুগামী ও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়? নাকি পার্থিব রাজকীয় মর্যাদা, যা সামাজিক নির্বাহকের অনুগামী ? শিয়াদের বিশ্বাস যে, স্বয়ং মহানবীও

(সঃ) নিজ থেকে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেননি। বরং মহান আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েই এ কর্ম সম্পাদন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নবুয়্যতের পরিসমাপ্তির দর্শন পবিত্র ইমামগণের নিয়োগদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর এ ধরনের ইমামের উপস্থিতিতেই রাসূল (সঃ)-এর ইন্তিকালের পর ইসলামী সমাজের অপরিহার্য বিষয়াদির নিশ্চয়তা প্রদান করা যেতে পারে।

এখানেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেন শিয়া সম্প্রদায়ের মতে ইমামত 'মূল বিশ্বাসগত' বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয় –শুধুমাত্র একটি ফিকাহগত গৌণ বিষয় নয়। আর সেই সাথে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কেন তারা তিনটি শর্ত (ঐশী জ্ঞান, ইসমাত ও আল্লাহ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত) বিবেচ্য বলে মনে করেন এবং কেন শিয়া সাধারণের মধ্যে এ ভাবার্থগুলো ঐশী আহকাম, প্রশাসন ও ইসলামী সমাজের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতৃত্বের ধারনার সাথে এমনভাবে মিশে আছে, যেন ইমামত শব্দটি এ ভাবার্থগুলোর সবগুলোকেই সমন্বিত করে।

এখন শিয়াদের সামগ্রিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, ইমামতের তাৎপর্য ও মর্যাদার আলোকে এর বৈধতা সম্পর্কে আলোচনা করব।

ইমাম থাকার প্রয়োজণীয়তা ঃ

দ্বিতীয় খণ্ডের ২ তম পাঠে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সফলতা, ওহীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ কর্তৃক পথপ্রদর্শনের সাথে সম্পকির্ত। আর প্রভুর প্রজ্ঞার দাবি হল এই যে, কোন নবী প্রেরণ করবেন যাতে ইহ ও পরলৌকিক কল্যাণের পথ সম্পর্কে মানুষকে জ্ঞান দান করতে পারেন এবং মানুষের প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন, আর সেই সাথে যোগ্যতম ব্যক্তিদেরকে (আধ্যাত্মিক) পরিচর্যা করতে পারেন এবং তাদের যোগ্যতা অনুসারে পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে তাদেরকে পৌঁছাতে সচেষ্ট হতে পারেন। অনুরূপ তারা উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশে ইসলামের সামাজিক বিধানের প্রয়োগের দায়িত্বও নিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪ মত ও ১৫ তম পাঠে আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলাম হল পবিত্র, চিরন্তন, সার্বজনীন ও অবিস্মৃত ধর্ম এবং ইসলামের নবী (সঃ)-এর পর আর কোন নবীর আবির্ভাব ঘটবে না। নবুয়্যতের পরিসমাপ্তির

দর্শন, তখনই কেবলমাত্র নবীগণের আবির্ভারের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করবে, যখন সর্বশেষ ঐশী শরীয়ত মানব সম্প্রদায়ের সকল প্রশ্নের জবাব প্রদানে সক্ষম হবে এবং বিশ্বের অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত এ শরীয়তের অটুট থাকার নিশ্চয়তা থাকবে।

উল্লেখিত নিশ্চয়তা পবিত্র কোরানের রয়েছে এবং মহান আল্লাহ স্বয়ং সকল প্রকার বিকৃতি ও বিচ্যুতি থেকে প্রিয় গ্রন্থের সংরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা বিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু ইসলামের সকল বিধি-বিধান কোরানের আয়াতের বাহ্যিক যুক্তি থেকে প্রকাশ পায় না। যেমন ঃ নামাযের রাকাত সংখ্যা ও পদ্ধতি এবং আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় এমন অসংখ্য বিধান রয়েছে, যেগুলোকে পবিত্র কোরান থেকে উদঘাটন করা অসম্ভব। সাধারণত ঃ পবিত্র কোরানে আহকাম ও কানুন বিশদভাবে বর্ণিত হয়নি। ফলে এগুলোর প্রশিক্ষণ ও সুস্পষ্ট বর্ণনার দায়িত্ব মহানবী (সঃ)-এর উপর অর্পণ করা হয়েছে, যাতে তিনি মহান আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের (কোরানের ওহী ব্যতীত) মাধ্যমে ঐগুলোকে মানুষের জন্যে বর্ণনা করেন।[১] আর এভাবে ইসলাম পরিচিতির প্রকৃত উৎস হিসেবে তাঁর সুন্নাহ বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু হযরত (সঃ)-এর শিবেহ আবি তালিবের কয়েক বছরের বন্দীদশা, শত্রুদের সাথে একদশকাব্দী যুদ্ধ ইত্যাদির মত জীবনের সংকটময় মুহূর্তগুলো সাধারান মানুষের জন্যে ইসলামের বিভিন্ন আহকাম, বর্ণনার পথে ছিল প্রধান অন্তরায়। অপর দিকে সাহাবাগণ যা শিখতেন তা সংরিক্ষত থাকারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এমন কি অজু করার প্রক্রিয়া যা বর্ষপরম্পরায় মানুষের দৃষ্টি সীমায় সম্পাদিত হত তাও বিরোধপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অতএব যেখানে এ সুস্পষ্ট বিষয়টি (যা মুসলমানদের নিত্যদিনের কর্মকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল বা আছে এবং এর পরিবর্তন ও বিকৃতির মধ্যে কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য জড়িত ছিল না) বিরোধপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে, সেখানে মানুষের ব্যক্তিগত ও গোত্রীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জটিল ও সূক্ষ্ম নিয়মসমূহের বর্ণনার ক্ষেত্রে বিকৃতি ও ভ্রান্তির সম্ভাবনা অবশ্যই অধিকতর ।[২]

১। বাক্বারা ঃ ১৫১, আল-ইমরান–১৬৪, জুমুআ'-২, নাহল –৬৪, ৬৪, আহযাব– ২১, হাশর –৭।
২। আল্লামা আমিনি (রঃ) সাতশতজন মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীর নাম তার "আল গাদীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এক লক্ষেরও অধিক হাদীসের বর্ণনাকারী রয়েছে (আল গাদীর, খণ্ড-৫ পৃঃ-২০৮)।

এ বিষয়টির আলোকে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম কেবলমাত্র তখনই এক পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ ধর্ম হিসেবে পৃথিবীর অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত মানুষের সকল প্রয়োজন ও প্রশ্নের জবাবদানে সক্ষম হবে যখন দ্বীনের মূলভাষ্যে,সমাজের এ সকল কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধিত হবে, যেগুলো মহানবী (সঃ)-এর পরলোক গমণের পর সংকট ও হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল। আর এ নিশ্চয়তা বিধানের পথ মহানবী (সঃ)-এর যোগ্য উত্তরসুরি নির্বাচন ব্যতীত কিছুই নয়। এ উত্তরসুরিকে একদিকে যেমন ঐশী জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, যাতে দ্বীনকে এর সকল দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তমরূপে বর্ণনা করতে পারেন। অপরদিকে তেমনি দৃঢ়রূপে পবিত্রতার অধিকারী হতে হবে, যাতে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানী প্ররোচনায় প্রভাবিত না হন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে দ্বীনের বিকৃতিতে লিপ্ত না হন। অনুরূপ মানব সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে মহানবী (সঃ)-এর দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে তুলে নিয়ে, উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে যোগ্যতম ব্যক্তিদেরকে পৌঁছে দিতেও তাঁরা বদ্ধপরিকর। আর অনুকূল পরিস্থিতিতে সমাজের শাসন, পরিচালনা এবং ইসলামী বিধানকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা, বিশ্বে ন্যায়বিচার ও সত্য প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির দায়িত্বও তাঁরা গ্রহণ করে থাকেন ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি কেবলমাত্র তখনই প্রভুর প্রজ্ঞার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হতে পারে, যখন এমন পবিত্র ইমামগণকে নিয়োগ করা হবে, যাঁরা একমাত্র নবুয়্যত ব্যতীত মহানবী (সঃ)-এর সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন।

আর এভাবেই একদিকে যেমন সমাজে ইমাম থাকার প্রয়োজনীয়তা প্রতিভাত হয়, অপরদিকে তেমনি তাঁদের ঐশী জ্ঞান ও পবিত্র মর্যাদাও। অনুরূপ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারটিও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। কারণ একমাত্র তিনিই জানেন এ ধরনের জ্ঞান ও মর্যাদা কাকে দিয়েছেন এবং তিনিই বস্তুতঃ তাঁর বান্দাগণের উপর বিলায়াত ও কর্তৃত্বের অধিকার রাখেন। আর তিনিই এর অধিকার অপেক্ষাকৃত হ্রাসকৃত মাত্রায় উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে প্রদান করতে সক্ষম।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, আহলে সুন্নাত কোন খলিফার ক্ষেত্রেই উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনটিকেই স্বীকার করেন না। মহান আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) পক্ষ থেকে নির্বাচিত হওয়ার দাবি যেমন তারা তুলেন না, তেমনি

খলিফাগণের ঐশী জ্ঞান ও পবিত্রতার প্রসঙ্গও তুলেন না। বরং মানুষের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রশ্নের জবাব দানের ক্ষেত্রে তাদের অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তি ও অযোগ্যতার দৃষ্টান্ত তারা তাদের বিশ্বস্ত গ্রন্থসমূহে তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ প্রথম খলিফা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি বলেছিলেন ঃ

انّ لی شیطانا یعترینی

আমার পশ্চাতে এমন এক শয়তান বিদ্যমান যে আমাকে বিভ্রান্ত করে[১]।

অনুরূপ দ্বিতীয় খলিফা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি প্রথম খলিফার আনুগত্য স্বীকারকে 'فلتة' (অর্থাৎ অবিলম্বকর্ম ও অবিবেচনাপূর্ণ কর্ম) নামকরণ করেছেন।[২] অনুরূপ দ্বিতীয় খলিফা অসংখ্যবার এ বাক্যটি স্বীয় কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন ঃ

لو لاعليّ لهلك عمر

যদি আলী না থাকতেন, তবে আমি ওমর ধ্বংস হয়ে যেতাম।

অর্থাৎ যদি আলী (আঃ) না থাকতেন তবে ওমর ধ্বংস হয়ে যেতন।[৩] এছাড়া তৃতীয় খলিফা[৪] এবং বনি উমাইয়্যা ও বনি আব্বাসের ভুল-ভ্রান্তির কথাতো বলারই অপেক্ষা রাখেনা। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে কেউ ন্যূনতম ধারণা নিলেই এ সম্পর্কে উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হতে পারবেন।

একমাত্র শিয়া সম্প্রদায়ই দ্বাদশ ইমামের ক্ষেত্রে এ শর্তত্রয়ে বিশ্বাসী। উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ইমামত প্রসঙ্গে তাদের বিশ্বাসের বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে বিস্তারিত কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তথাপিও পরবর্তী পাঠে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে কিছু কিছু দলিলের উদ্ধৃতি দেয়ার আশা রাখি।

১। শারহে নাহজুল বালাগাহ ঃ ইবনে আবিল হাদিদ, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা-৮৫ খণ্ড-৪, পৃঃ-২৩১-২৬২, এবং আল গাদীর ঃ খণ্ড -৭, পৃঃ-১০২-১৮০।

২। শারহে নাহজুল বালাগাহ ঃ খণ্ড -১, পৃঃ-১৪২-১৫৮ , খণ্ড-৩, পৃঃ-৫৭।

৩। আল গাদীর ঃ খণ্ড - ৬, পৃঃ -৯৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো।

৪। আল গাদীর ঃ খণ্ড -৮, পৃষ্ঠা- ৯৭ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো।

পাঠ – ১৮

ইমামের নিয়োগ

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা আলোচনা করেছি যে, পবিত্র ইমামের নির্বাচন ব্যতীত, নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি প্রভুর প্রজ্ঞার পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজনীন ও চিরন্তন ধর্ম ইসলামের পরিপূর্ণতা এর সাথে সম্পর্কিত যে, মহানবী (সঃ)-এর পর তাঁর এমন সকল যোগ্য উত্তরসুরিগণ নির্বাচিত হবেন, যারা নবুয়্যত ও রিসালাত ব্যতীত মহানবী (সঃ)-এর সকল ঐশী মর্যদার অধিকারী হবেন।

এ বিষয়টিকে পবিত্র কোরানের আয়াতসমূহ এবং শিয়া সুন্নী উৎসর তাফসিরে বর্ণিত অসংখ্য রেওয়ায়েতের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় ।

উদাহরণস্বরূপ সূরা মায়িদাহর তৃতীয় আয়াতটির কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে বলা হয়েছে ঃ

اليومَ اكمَلت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتِي ورَضيت لكم الاسلام دينا

"আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"

এ আয়তটি মহানবী (সঃ)-এর পরলোক গমনের কয়েক মাস পূর্বে বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ হয়েছে বলে মোফাসসিরগণের মধ্যে মতৈক্য বিদ্যমান। ইসলামের কোন ক্ষতি করতে গিয়ে কাফেররা হতাশ হয়ে পড়েছে এ কথাটির ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে উল্লেখিত আয়াতটির পূর্বেই। যথা ঃ

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ....

আজ কাফিররা তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে ... ...

অতঃপর গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে যে, আজ তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ এবং আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার স্থান, কাল ও পাত্রের উপর বর্ণিত অসংখ্য রেওয়ায়েতের আলোকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, এ পরিপূর্ণতা (اكمال) ও সম্পূর্ণতা (اتمام), যা ইসলামের ক্ষতি করতে কাফেরদের হতাশার সাথে সংশ্লিষ্ট তা মহানবী (সঃ)-এর উত্তরসুরি নির্বাচনের মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। কারণ ইসলামের শত্রুদের প্রত্যাশা ছিল মহানবী (সঃ)-এর পরলোকগমণের পর (যেহেতু তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না) ইসলামের কোন পৃষ্ঠপোষক থাকবে না এবং ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে বিলুপ্তিতে পতিত হবে। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হওয়ায় ইসলাম ধর্ম

এর পরিপূর্ণতা ও ঐশী অনুগ্রহের সম্পূর্ণতায় পৌঁছেছে। ফলে কাফেরদের সকল আশা ভস্মীভূত হয়েছে।[১]

আর এর ঘটনাপ্রবাহ ছিল এরূপ ঃ মহানবী (সঃ) বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পথে 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে সকল হাজীদেরকে একত্রিত করলেন এবং বিস্তারিত বক্তব্য দেয়ার পর উপস্থিত লোকদেরকে বিজ্ঞাসা করলেন ঃ

ألست اولى بكم من انفسكم ؟

ওহে আমি কি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর বিলায়াত প্রাপ্ত নই?[২]

সকলেই একবাক্যে ইতিবাচক জবাব প্রদান করল। অতঃপর আলী (আঃ)-এর বাহু ধরে তাঁকে সকল মানুষের সম্মুখে উঁচু করে প্রদর্শন করলেন এবং বললেন ঃ

من كنت مولاه فعلي مولاه

আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।

এভাবে ঐশী বিলায়তকে হযরত আলী (আঃ)-এর জন্যে মহানবী (সঃ) ঘোষণা করলেন। অতঃপর উপস্থিত সকলেই তাঁর [আলী (আঃ)] আনুগত্য স্বীকার করলেন। তাদের মধ্যে দ্বিতীয় খলিফাও আমীরুল মু'মিনিন আলী (আঃ)-এর আনুগত্য স্বীকারোত্তর অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ

بخّ بخّ لك يا عليّ اصبحت مولاى ومولى كلّ مومن ومومنة

হে আলী, তোমাকে অভিনন্দন ! অভিনন্দন ! (আজ থেকে) তুমি আমার মাওলা হয়ে গেলে এবং মাওলা হলে সকল মু'মিন নর-নারীরও।[৩]

আর এ দিনেই এ আয়তটি অবতীর্ণ হয়েছিল ঃ

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا

"আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম আর তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"

১। এ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্যে ' তাফসীর আল মিজান' দ্রষ্টব্য।

২। ইঙ্গিত করা হয়েছে সূরা আহযাবের ৬নং আয়াতের প্রতি النبي اولي بالمومنين من انفسهم

৩। এ হাদীসের সনদের বৈধতার চূড়ান্ত দলিলের জন্যে "আবাক্বাতুল আনওয়ার এবং আল গাদীর" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

মহানবী (সঃ) তাকবীর দিলেন এবং বললেন ঃ

تمام نبوتی و تمام دین الله و لایة علي بعدی

আমার পরে আলীর বেলায়াতই হচ্ছে আল্লাহ্‌র দ্বীনের পূর্ণতা এবং আমার নবুয়্যতীর পূর্ণতা স্বরূপ।

এছাড়া আহলে সুন্নাতের কোন কোন মনীষীও (حمويني) বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর ও ওমর 'জাবিরের' নিকট চেয়েছিল রাসূলকে (সঃ) জিজ্ঞাসা করতে যে, এ বিলায়াত কি একমাত্র আলীর জন্যেই নির্ধারিত? হযরত (সঃ) বললেন ঃ বিশেষকরে আলী এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমার ওয়াসিগণের জন্যেই নির্ধারিত। অতঃপর ওয়াসি কারা এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন ঃ

عليّ اخی و وزیری و وارثی و وصيّی وخليفتي في امّتي و ولیّ کلّ مومن من بعدی ثمّ ابنی الحسن ثمّ ابنی الحسین ثمّ تسعة من ولد ابنی الحسین واحدا بعد واحد القران معهم وهم مع القران لا يفارقونه ولا يفارقهم حتّی يردوا عليّ الحوض

আলী (আঃ) আমার ভাই, উজির, উত্তরাধিকারী, ওয়াসি এবং আমার উম্মতের জন্যে খলিফা ও আমার পর মু'মিনগণের অভিভাবক। অতঃপর হাসান (আঃ) অতঃপর হুসাইন (আঃ) অতঃপর হুসাইনের (আঃ) সন্তানগণের মধ্য থেকে নয়জন, উত্তর উত্তর ওয়ালী হবেন। কোরান তাঁদের সাথে এবং তাঁরাও কোরানের সাথে। আর এ কোরান তাঁদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না এবং তাঁরাও এ কোরান থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না হাউজে কাওছারে আমাদের সাথে মিলিত হবে।[১]

বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে যতটুকু জানা যায়, তাতে দেখা যায় মহানবী (সঃ) পূর্বেই আলী (আঃ)-এর ইমামতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এতে সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, হয়ত মানুষ এ বিষয়টিকে হযরত (সঃ)-এর ব্যক্তিগত মতামত বলে মনে করবে এবং একে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি যথাযথ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, যাতে এ ঘোষণার জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ফলে নিম্নলিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

১। গায়াতুল মারাম, অধ্যায় –৫৮, হাদীস নং-৪ (ফারায়িদ হামভীনি)।

ياايها الرسّول بلغ ما انزل اليك من ربّك وان لم تفعل فما بلّغت رسالته و الله يعصمك من الناس

> হে রাসূল ! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর; যদি না কর তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। (সুরা মায়িদাহ -৬৭) [১]

এ বিষয়টির প্রচারের আবশ্যকতার উপর গুরুত্বারোপ করতঃ (যে এ বিষয়টি অন্যান্য সকল বাণীর মতই এবং এর প্রচার না করা সমস্ত রিসালাতের প্রচার থেকে বিরত থাকার শামিল) হযরতকে (সঃ) এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল যে, মহান আল্লাহ তাঁকে সকল অনাকাংখিত প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করবেন। আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে মহানবী (সঃ) অনুধাবন করলেন যে, সে শুভলগ্ন উপস্থিত হয়েছে এবং এর অধিক বিলম্ব করা সঠিক নয়। অতএব 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে এ দায়িত্ব সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হলেন। [২]

তবে এ দিনটির বিশেষত্ব হল এই যে, এ দিনে আলীর (আঃ) জন্যে ইমামতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও বাইআত বা আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছিল। নতুবা রাসূল (সঃ) তাঁর রিসালাতের সময়কালে এশাধিকবার ও একাধিকরূপে আলী (আঃ)-এর উত্তরাধিকারিত্বের কথা বর্ণনা করেছিলেন। নবুয়্যতের প্রারম্ভিক বছর গুলোতে যখন وانذر عشيرتك الاقربين অর্থাৎ এবং তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন কর। (সূরা শুয়ারা-২১৪) -এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল এবং মহানবী (সঃ) তাঁর সকল নিকটাত্মীয়দেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ সর্বপ্রথমে যে আমার আহবানে সাড়া দিবে, সেই আমার উত্তরাধিকারী হবে। দলমত নির্বিশেষে সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, সর্বপ্রথমেই যিনি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিলেন তিনি আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) ব্যতীত আর কেউ নন। [৩] অনুরূপ,

---

১। বিস্তারিত জানার জন্যে ' তাফসির আল মিজানের' -এ আয়তটি দ্রষ্টব্য।

২। এ বিষয়টি আহলে সুন্নাতের মনীষীগণ মহানবী (সঃ) এর সাতজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা হলেন ঃ যাইদ ইবনে আরক্বাম, আবু সাঈদ খুদরী ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী, বারা' ইবনে আযিব, আবু (হারায়রা ও ইবনে মাসউদ (আলগাদীর ঃ খণ্ড-১)।

৩। আবাক্বাতুল আনওয়ার' আল গাদীর, আলমোরাজিয়াত।

يايها الذين ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا الرّسول واولي الأمر منكم

হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য কর আল্লহ্‌র রাসুল তাঁর উলুল আম্‌রদেরকে (উত্তরসুরিগণ)। (নিসা–৫৯)

উল্লেখিত আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছিল এবং "উলূল আমর হিসাবে যার পরম আনুগত্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আর তাঁর আনুগত্য করাকে নবী (সঃ)-এর আনুগত্য করার সমকক্ষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে" তখন 'জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী' হযরত (সঃ)-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন এই উলূল আমর কারা, যাদের আনুগত্য করা আপনার আনুগত্যের সমকক্ষ বলা হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ

هم خلفائي يا جابر و ائمّة المسلمين من بعدى اوّلهم عليّ بن ابي طالب ثم الحسن ثمّ الحسين ثمّ علي بن الحسين ثمّ محمّد بن علي المعروف في التوراة بالباقر— ستدركه يا جابر فاذا لقيته فاقرأه منّي السلام — ثمّ الصادق جعفر بن محمّد ثمّ موسى بن جعفر ثمّ علي بن موسى ثمّ محمّد بن علي ثمّ علي بن محمّد ثمّ الحسن بن علي ثمّ سميّى و كنيّى حجّة الله في ارضه و بقيّته في عباده ابن الحسن بن عليّ ... ...

হে জাবির! তাঁরা হলেন আমার পর, আমার খলিফা ও মুসলমানদের ইমাম। তাঁদের প্রথম ব্যক্তি হলেন আলী ইবনে আবি তালিব, অতঃপর হাসান, অতঃপর হুসাইন, অতঃপর আলী ইবনে হুসাইন, অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনে আলী, যিনি তৌরাতে বাক্বির বলে পরিচিত, হে জাবির! যখন তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে, আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম জানাবে অতঃপর সাদিক জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, অতঃপর মূসা ইবনে জাফর, অতঃপর আলী ইবনে মূসা, অতঃপর মুহাম্মদ ইবনে আলী, অতঃপর আলী ইবনে মুহাম্মাদ, অতঃপর হাসান ইবনে আলী, অতঃপর আমার নাম ও কুনীয়াতধারী পৃথিবীতে আল্লাহর হুজ্জাত তাঁর (মনোনিত) বান্দাগণের মধ্যে সর্বশেষ হাসান ইবনে আলী ------। [১]

এবং রাসূল (সঃ) এর ভবিষদ্বাণী অনুসারে জাবির (রাঃ) হযরত ইমাম বাক্বির (আঃ) পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং হযরতের (সঃ) সালাম তাঁর নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন।

১। গায়াতুল মারাম, খঃ-১০, পৃঃ-২৬৭ , ইসবাতুল হুদা, খঃ-৩, পৃঃ-১২৩, ইউনাবিউল মুয়াদ্দাহ, পৃঃ- ৪৯৪।

অপর একটি হাদীসে আবু বাসির থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উলূল আমর প্রাসংগিক আয়াতটি সম্পর্কে ইমাম সাদিক (আঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ (আয়াতটি) আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) হাসান (আঃ) ও হোসাইন (আঃ)-এর সম্মানে অবতীর্ণ হয়েছে। সবিনয়ে নিবেদন করলাম, মানুষ জানতে চায় পবিত্র কোরানে আলী (আঃ) ও আহলে বাইতগণকে (আঃ) তাঁদের নাম উল্লেখ পূর্বক পরিচয় দেয়নি কেন ? তিনি বললেন ঃ তাদেরকে বল, নামাযের যে আয়াত নাযিল হয়েছে তাতে তিন রাকাত বা চার রাকাতের কোন উল্লেখ করা হয়নি এবং মহানবীই (সঃ) ঐগুলো মানুষের নিকট ব্যাখ্যা করেছিলেন। অনুরূপ যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ ও মহানবীকে (সঃ) ব্যাখ্যা করতে হয়েছে এবং তিনিই এরূপ বলেছিলেন,

من كنت مولاه فعليّ مولاه

আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা।

এছাড়াও তিনি বলেছিলেন,

اوصيكم بكتاب الله واهل بيتى فانى سألت الله عزّوجلّ ان لايفرق بينهما حتّى يورد هما عليّ الحوض فأعطانى ذالك

অর্থাৎ তোমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব এবং আমার আহলে বাইতের (সান্নিধ্যে) থাকার জন্যে সুপারিশ করছি বাস্তবিকই মহীয়ান, গরীয়ান আল্লাহর কাছে এ আবেদন জানিয়েছিলাম যে, তিনি যেন কোরানকে আহলে বাইত থেকে পৃথক না করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের সাথে হাউজে কাওছারে মিলিত হয়, এবং মহান আল্লাহ আমার আবেদন গ্রহণ করেছেন। অনুরূপ বললেন ঃ

لا تعلموهم فانّهم اعلم منكم انهم لن يخرجوكم من باب هدى و لن يدخلوكم في باب ضلالة

অর্থাৎ তাঁদের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হতে তোমরা সক্ষম নও, তাঁরা প্রকৃতই তোমাদের থেকে অধিকতর জ্ঞাত। বস্তুতঃ তাঁরা তোমাদেরকে কখনোই হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং পথভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত করবেন না।

এছাড়া মহনবী (সঃ) একাধিকবার (বিশেষকরে তাঁর জীবনের অন্তিম দিন গুলোতে) বলেছিলেন ঃ

انّی تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي فانّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض

বস্তুতঃ আমি তোমাদের মাঝে দু'টি গুরুভার রেখে গেলাম ঃ আল্লাহর কিতাব এবং আমার আহলে বাইত। প্রকৃতপক্ষে এতদ্বয় পরস্পর থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না হাউজে কাওছারে আমাদের সাথে মিলিত হয়। *

আরও বলেছিলেন ঃ

الا انّ مثل اهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلّف عنها غرق

অর্থাৎ জেনে রাখ, বস্তুতঃ আমার আহলে বাইতের উদাহরণ হল নূহের তরীর মত - যে কেউ এতে আরোহণ করবে নিস্তার পাবে, আর যে কেউ একে ত্যাগ করবে নিমজ্জিত হবে। [১]

অনুরূপ আলী ইবনে আবি তালিবকে (আঃ) উদ্দেশ্য করে মহানবী (সঃ) একাধিকবার বলেছিলেন ঃ

انت وليّ كلّ مؤمن بعدي

'তুমি হলে আমার পর সকল মু'মিনের ওয়ালী' । [২]

এছাড়াও এমন অনেক হাদীস বিদ্যমান যেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা ক্ষুদ্রপরিসরে সম্ভব নয়। [৩]

---

* এ হাদীসটিও বহুল প্রচারিত হাদীসসমূহের একটি যা তিরমিযি, নাসাঈ ও মোস্তাদরাকের লেখক কর্তৃক মহানবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

১। মোস্তাদরাকে হাকিম, খণ্ড- ঃ ৩, পৃঃ- ১৫১।

২। মোস্তাদরাকে হাকিম, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ১৩৪, পৃঃ-১১১, সাওয়ায়িকে ইবনে হাজার, পৃঃ-১০৩, মুসনাদে ইবনে হাম্বল, খণ্ড- ১, পৃঃ- ৩৩১, খঃ- ৪, পৃঃ- ৪৩৮।

৩। মরহুম সাদুকের কামালুদ্দিন ও তামামুন্নিয়ামাহ, বিহারুল আনওয়ার ঃ মাজলিসি।

পাঠ – ১৯

ইমামের ইসমাত ও জ্ঞান

- ভূমিকা
- ইমামের ইসমাত
- ইমামের জ্ঞান

ভূমিকা ঃ

দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬ নং পাঠে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু হল তিনটি। যথা ঃ ইমামকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত হতে হবে, সুদৃঢ় ইসমাত বা পবিত্রতার অধিকারী হতে হবে এবং ঐশী জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭ নং পাঠে উল্লেখিত বিষয়গুলোকে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলাম। ৩৮নং পাঠে পবিত্র ইমামগণের (আঃ) মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার স্বপক্ষে কিছু কিছু উদ্ধৃতিগত দলিলের উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য পাঠে এখন আমরা তাঁদের ইসমাত ও আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান সম্পর্কে আলোকপাত করব।

ইমামের ইসমাত ঃ

'ইমামত হল আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা যা মহান আল্লাহ আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) ও তাঁর সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন', তা প্রমাণের পর, তাঁদের ইসমাতকে নিম্নলিখিত আয়াত থেকে উদ্ভাবন করা যায় ঃ

لا ينال عهدى الظّالمين

আমার প্রতিশ্রুতি সীমালংঘনকারীদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। (সূরা বাক্বারা-১২৪)

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আল্লাহ প্রদত্ত এ মর্যাদা তাঁদের জন্যেই যারা গুনাহ দ্বারা কলুষিত নন।

অনুরূপ সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে উল্লেখিত 'উলূল আমর' প্রাসঙ্গিক আয়াতটি যাতে তাঁদের নিঃশর্ত আনুগত্য অপরিহার্য বলা হয়েছে এবং এ আনুগত্যকে রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের শামিল করা হয়েছে সে আয়াতটি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁদের আনুগত্য মহান আল্লাহর আনুগত্যের সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না। অতএব তাঁদের নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশ তাঁদের ইসমাতের নিশ্চয়তারই অর্থ বহন করে।

একইভাবে আহলে বাইত (আঃ)-এর ইসমাতকে আয়াতে তাতহিরের মাধ্যমেও প্রমাণ করা যায় । পবিত্র কোরানে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

انما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت و يطهّركم تطهيرا

হে নবীর আহলে বাইত! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের হতে সকল অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। (সূরা আহযাব-৩৩)

বান্দাগণের পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহর বিধিগত ইরাদা কারো জন্যে নির্ধারিত নয়। সুতরাং আল্লাহর যে ইরাদা আহলে বাইতগণের (আঃ) জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা হল প্রভুর সুনির্ধারিত ইরাদা, যা অপরিবর্তনীয়; যেমনটি বলা হয় ঃ

انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون

তাঁর ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে বলেন হও, ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন-৮২)

আর চূড়ান্তরূপে পবিত্রকরণ ও সকল প্রকার কদর্য কলুষতা থেকে মুক্ত করণের অর্থই হল পবিত্রতা। অপরদিকে আমরা জানি যে, শিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত মুসলমানদের কোন সম্প্রদায়ই রাসূল (সঃ)-এর কোন নিকটাত্মীয়ের পবিত্রতার দাবি তুলে না। শিয়া সম্প্রদায় নবী কন্যা হযরত ফাতিমা যাহরা (সাঃ) এবং দ্বাদশ ইমামের পবিত্রতায় বা ইসমাতে বিশ্বাস করে।[1]

উল্লেখ্য যে, সত্তরাধিক রেওয়ায়েত (যে গুলোর অধিকাংশই আহলে সুন্নাতের আলেমগণ বর্ণনা করেছেন) প্রমাণ করে যে, এ আয়াতটি 'পাক পাঞ্জাতনের' মর্যাদায় নাযিল হয়েছে।[2] শেখ সাদুক, আমীরুল মু'মিনিন (আঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ হে আলী! এ আয়াতটি তোমার, হাসান, হুসাইন এবং তাঁর বংশের ইমামদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনার পর কয়জন ইমাম রয়েছেন ? জবাবে তিনি বললেন ঃ হে আলী! তুমি অতঃপর হাসান, অতঃপর হুসাইন, অতঃপর তাঁর সন্তান আলী, অতঃপর তাঁর সন্তান মুহাম্মদ, অতঃপর তাঁর সন্তান জা'ফর, অতঃপর তাঁর সন্তান মুসা, অতঃপর তাঁর সন্তান আলী, অতঃপর তাঁর সন্তান

১। এ আয়াতটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে 'তাফসীর আলা মিজানে' এবং 'আল ইমামাতু ওয়াল বিলায়াতু ফিল কুরানিল কারিমে' দ্রষ্টব্য।

২। গায়াতুল মারাম, পৃঃ- (২৮৭-২৯৩)।

মুহাম্মদ, অতঃপর তাঁর সন্তান আলী, অতপর তাঁর সন্তান হাসান এবং তৎপর তাঁর সন্তান আল্লাহর হুজ্জাত (আলাইহিমুস সালাম আজমাইন)।

অতঃপর মহানবী (সঃ) বললেন ঃ এ রূপেই তাঁদের নাম আল্লাহর আরশের পাতায় লিখা আছে এবং আমি মহান আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এগুলো কাদের নাম ? তিনি বললেন ঃ হে মুহাম্মদ তোমার পর তাঁরা হলেন ইমাম, তাঁরা মাসুম ও পবিত্র হয়েছেন এবং তাঁদের শত্রুরা আমা কর্তৃক অভিশম্পাত প্রাপ্ত হবে। *

অনুরূপ 'হাদীসে সাকালাইন' যাতে মহানবী (সঃ) তাঁর আহলে বাইত ও ইতরাতকে কোরানের সমকক্ষরূপে স্থান দিয়েছেন এবং এ নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, কখনোই তাঁরা (অর্থাৎ কোরান ও ইতরাত) পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, সেটিও তাঁদের ইসমাতের স্বপক্ষে একটি সুস্পষ্ট দলিল। কারণ ক্ষুদ্রতম কোন পাপে লিপ্ত হওয়ার মানে (এমনকি ভুলক্রমেও যদি হয়ে থাকে) কার্যক্ষেত্রে কোরান থেকে তাঁদের পৃথক হওয়া।

ইমামের জ্ঞান ঃ

নিঃসন্দেহে নবী (সঃ)-এর আহলে বাইত (আঃ) তাঁর জ্ঞান থেকে অন্য সকলের চেয়ে অধিকতর লাভবান হয়েছিলেন। তাই তাঁদের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন,

لا تعلموهم فانّهم اعلم منكم

> তাদেরকে অনুধাবন করা যায় না সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁরা তোমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী।[১]

বিশেষকরে স্বয়ং আলী (আঃ) যিনি শৈশব থেকেই রাসূল (সঃ)-এর আশ্রয়ে পরিচর্যিত হয়েছেন এবং হযরত (সঃ) এর জীবনের অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত তাঁর

---

* গায়াতুল মারাম, পৃঃ- ২৯৩, খঃ- ৬।
১। গায়াতুল মারাম, পৃঃ- ২৬৫, উসূলে কাফি, খঃ-১, পৃঃ- ২৯৪।

সংস্পর্শে থেকে সর্বদা জ্ঞান অর্জনে নিয়োজিত ছিলেন। মহানী (সঃ) হযরত আলী (আঃ) সম্পর্কে বলেন ঃ

انا مدينة العلم وعليّ بابها

আমি জ্ঞানের শহর আর আলী হল তার দ্বার[১]।

অপরদিকে স্বয়ং আমীরুল মু'মিনিন (আঃ) থেকেই বর্ণিত হয়েছে ঃ

ان رسول الله صلي الله عليه و ا له–علمنى الف باب و كلّ باب يفتح الف باب فذالك الف الف باب حتى علمت ما كان و ما يكون الى يوم القيامة و علمت علم المنايا و البلايا و فصل الخطاب

অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল (সঃ) জ্ঞানের সহস্রটি দ্বার আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যাদের প্রতিটি আবার সহস্র দ্বারে উন্মুক্ত হয়, ঐগুলোর প্রতিটি এভাবে সহস্র সহস্র দ্বারে উন্মুক্ত হয়, এমনকি আমি জানি, যা ছিল এবং ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত যা হবে তাও এবং আমি শিখেছি মৃত্যুসমূহ (منايا) এবং বিপদ–আপদসমূহ (بلايا) এবং প্রকৃত বিচারের (فصل الخطاب) জ্ঞান।[২]

কিন্তু ইমামগণের (আঃ) জ্ঞান, নবী (সঃ)-এর নিকট থেকে (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে) শ্রুত জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। বরং তাঁরা এক প্রকার অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যা, ইলহাম ও তাহ্দীসরূপে তাঁদেরকে প্রদান করা হয়েছিল।[৩] এ ধরনের ইলহামা হযরত খিজ্‌র ও যুলক্বারনাইন[৪] এবং হযরত মারিয়াম ও মূসা (আঃ) এর মায়ের প্রতি [৫] করা হয়েছিল। এগুলোর কিছু কিছু পবিত্র কোরানে ওহী নামে উল্লেখিত হয়েছে। তবে এর অর্থ নবুয়্যতের ওহী নয়। আর এ ধরনের জ্ঞানের ফলেই পবিত্র ইমামগণের কেউ কেউ শৈশবেই

---

[১]। মুস্তাদরাকে হাকিম, খঃ- ৩, পৃঃ-২২৬, বিস্ময়ের ব্যাপার হল আহলে সুন্নাতের একজন আলেম 'ফাতহুল মুলকুল আলী বিসিহহাতি হাদীসে' মাদীনাতিন এলমিল আলী' যা ১৩৫৪ হিঃ কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

[২]। ইউনাবিউল মুয়াদ্দাহ, পৃঃ-৮৮, উসূলে কাফি, খঃ- ১, পৃঃ- ২৯৬।

[৩]। উসূলে কাফি ঃ কিতাবুল হুজ্জাহ্‌, পৃঃ- ২৬৪, পৃঃ-২৭০।

[৪]। উসূলে কাফি, খঃ-১, পৃঃ- ২৬৮।

[৫]। কাহাফ (৬৫-৯৮), আল ইমারান ৪২, মারিয়াম (১৭-২১), তাহা-৩৮, ক্বাসাস-৭।

ইমামতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ও সকল কিছু জ্ঞাত ছিলেন এবং অন্য কারও নিকট জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তাঁদের ছিল না।

এ বিষয়টি স্বয়ং পবিত্র ইমামগণ (আঃ) থেকে বর্ণিত অসংখ্য রেওয়ায়েত থেকে (এবং তাঁদের প্রমাণিত ইসমাত ও হুজ্জিয়াতের কথা বিবেচনা করে) প্রমাণিত হয়। এগুলোর কোন কোনটির উপর আলোকপাত করার পূর্বে পবিত্র কোরানের এমন একটি আয়াতের উল্লেখ করব যাতে মহানবী (সঃ) এর সত্যবাদিতার সাক্ষ্যস্বরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে من عنده علم الكتاب (যার নিকট রয়েছে কিতাবের জ্ঞান) বলে পরিচয় দেয়া হয়েছে । আয়াতটি হল ঃ

قل كفى بالله شهيدا بينى و بينكم و من عنده علم الكتاب

বলুন, আল্লাহ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে, তারা আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষি হিসাবে যথেষ্ট। (সূরা রা'দ-৪৩)

নিঃসন্দেহে এমন কেউ যার সাক্ষী মহান আল্লাহর সাক্ষীর নিকটবর্তী বলে পরিগণিত হয়েছে এবং কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, যাকে এরূপ সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা দিয়েছে তিনি মহা মর্যাদাপূর্ণ স্থানের অধিকারী।

অপর একটি আয়াতেও এ সাক্ষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে রাসূল (সঃ) এর পদাংকানুসারীরূপে গণনা করা হয়েছে ঃ

افمن كان على بيّنة من ربّه و يتلوه شاهد منه........

তারা কি তাদের সমতুল্য যারা প্রতিষ্ঠিত তাদের প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর, যার অনুসরণ করে তাঁর প্রেরিত সাক্ষি ......। (সূরা হুদ-১৭)

আর منه (মিনহু) শব্দটি প্রমাণ করে যে, এ সাক্ষী হলেন নবী (সঃ) এর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরই আহলে বাইত। শিয়া ও সুন্নী উৎসের একাধিক রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ সাক্ষী হলেন আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য, ইবনে মু'যিল শাফিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে আতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ একদা ইমাম বাক্বির (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের (আহলে কিতাবের আলেমদের মধ্যে এক ব্যক্তি, যিনি রাসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) পুত্র

অতিক্রম করছিল। হযরত বাক্বির (আঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ من عنده علم الكتاب (অর্থাৎ যার নিকট কিতাবের জ্ঞান রয়েছে) কি ঐ ব্যক্তির পিতাকে বুঝানো হয়েছে ? জবাবে তিনি বললেনঃ না, বরং আলী ইবনে আবি তালিবকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। তেমনি ويتلوه شاهد منه (অর্থাৎ যার অনুসরণ করে তাঁর প্রেরিত সাক্ষী ....) এবং ... انّما وليّكم (অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের ওয়ালী ..) (সূরা মায়িদাহ -৫৫) আয়াতদ্বয়ও তাঁর সম্মানে নাযিল হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎস থেকে বর্ণিত একাধিক রেওয়ায়েত থেকে পাওয়া যায় যে, সূরা হুদে উল্লেখিত شاهد (শাহিদ) হলেন আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)।[১] তদুপরি منه (মিনহু) এর উল্লেখিত বিশেষত্বের আলোকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, এর দৃষ্টান্ত আলী (আঃ) ব্যতীত আর কেউ নন।

কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার গুরুত্ব তখনই সুস্পষ্ট হয়, যখন হযরত সোলাইমান (আঃ)-এর সময় বিলক্বিসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা পবিত্র কোরানে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার প্রতি মনোযোগ দেয়া হয় ঃ

قال الذى عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتدّ اليك طرفك...

কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, 'আপনি চক্ষুর পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দিব। (সূরা নামল-৪০)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিতাবের কিছু অংশের জ্ঞান থাকার ফলেই এ ধরনের বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এথেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, সমগ্র কিতাবের জ্ঞান কি ধরনের গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে ! আর এটি হল তা-ই যা ইমাম সাদিকে (আঃ) থেকে সুদাইর বর্ণনা করেছিলেন।

সুদাইর বলেন ঃ আমি আবু বাসির, ইয়াহ্ইয়া বায্যায এবং দাউদ ইবনে কাছির, ইমাম সাদিক (আঃ)-এর সভায় উপস্থিত ছিলাম; হযরত ক্রোধপূর্ণ অবস্থায় সভাস্থলে প্রবেশ করলেন এবং আসন গ্রহণান্তে বললেন ঃ আশ্চর্য হই ঐ সকল লোকদের জন্যে, যারা মনে করে যে, আমরা অদৃশ্য-জ্ঞানের অধিকারী অথচ মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নন। আমি

১। গায়াতুল মারাম, পৃঃ- (৩৫৯-৩৬১)।

চেয়েছিলাম আমরা দাসীকে ভর্ৎসনা করব কিন্তু সে পলায়ন করেছে এবং আমি জানিনা কোন কক্ষে গিয়েছে।[১]

সুদাইর বলেন ঃ যখন হযরত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশে উদ্যত হলেন, আমি আবু বাসীর এবং মাইসার, তাঁর সাথে গেলাম এবং সবিনয়ে নিবেদন করলাম ঃ আমরা আপনার জন্যে উৎসর্গ হব, দাসী সম্পর্কে আপনার অভিব্যক্তি আমরা অনুধাবন করেছি; আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী । কিন্তু কখনোই আপনার অদৃশ্য জ্ঞানের ব্যাপারে দাবি করি না।

হযরত বললেন ঃ ওহে সুদাইর তুমি কি কোরান পড়নি ? বললাম ঃ পড়েছি। তিনি বললেন ঃ এ আয়তটি পড়নি ?

قال الذی عنده علم من الکتاب انا اتیك به قبل ان یرتدّ الیك طرفك

কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, 'আপনি চক্ষুর পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দিব।

জবাবে বললাম ঃ অপনার জন্যে আমার জীবন উৎসর্গ হোক, পড়েছি। তিনি বললেন ঃ তুমি জান, ঐ ব্যক্তি কিতাবের জ্ঞানের কতটুকু অবহিত ছিল ? জবাবে নিবেদন করলামঃ অনুগ্রহপূর্বক আপনিই বলুন। তিনি বললেন ঃ প্রশস্ত সমুদ্রের এক বিন্দু পরিমাণ! অতঃপর বললেন ঃ এ আয়াতটি কি পড়েছ ?

قل کفی بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب

বলুন, আল্লাহ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে, তারা আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষি হিসাবে যথেষ্ট।

১। এ হাদীসটির বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট হয় যে, এ বক্তব্যগুলো অবিশ্বস্ত লোকের উপস্থিতির ফলে ব্যক্ত হয়েছে। স্মরণ রাখা উচিৎ যে, অদৃশ্যের জ্ঞান যা একমাত্র মহান আল্লাহরই অওতাধীন তার মানে হল সে জ্ঞান যে জ্ঞান প্রশিক্ষণের উপর নির্ভর করে না। যেমন ঃ আমীরুল মু'মিনিন (আঃ) এক ব্যক্তির এ প্রশ্নের জবাবে যে, 'আপনি কি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ?' বলেছিলেন ঃ انّما هو تعلّم مـن ذي علـم অর্থাৎ বস্তুত ঃ তা জ্ঞানের মালিকের নিকট থেকে লাভ করা হয়। নতুবা সকল নবী এবং আল্লাহর অধিকাংশ ওলী, ওহী অথবা ইলহামের মাধ্যমে যে অদৃশ্য জ্ঞান তাঁদেরকে প্রদান করা হত তা অবগত ছিলেন। এগুলোর সুনিশ্চত উদাহরণ হল সে অদৃশ্য সংবাদ যা হযরত মূসার (আঃ) মায়ের প্রতি ইলহাম করা হয়েছিল ঃ (কাসাস-৭) انّا رادّوه اليك و جاعلوه من المرسـلين "নিশ্চয়ই আমরা তাহাকে তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবো এবং প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে তাকে অন্তর্ভুক্ত করবো।"

বললাম ঃ জী হ্যাঁ। পুনরায় তিনি বললেন ঃ যিনি সমস্ত কিতাবের জ্ঞান রাখেন তিনি অধিক জ্ঞানী, না যিনি কিতাবের স্বল্প কিছু জ্ঞানের অধিকারী। বললাম, যিনি সমস্ত কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী!

অতঃপর স্বীয় বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে ইমাম (আঃ) বললেন ঃ আল্লাহর শপথ সমস্ত কিতাবের জ্ঞান আমাদের কাছে বিদ্যমান আল্লাহর শপথ সমস্ত কিতাবের জ্ঞান আমাদের নিকট বিদ্যমান।[১]

এখন আহলে বাইতের (আঃ) জ্ঞান প্রসঙ্গে বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব।

হযরত ইমাম রেজা (আঃ) ইমামতের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় বলেছিলেন ঃ যখন মহান আল্লাহ কাউকে (ইমামরূপে) মানুষের জন্যে নির্বাচন করেন, তখন তাঁকে হৃদয়ের প্রশস্ততা (سعه صدر) প্রদান করেন প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারা তার হৃদয়ে স্থাপন করেন এবং তার প্রতি জ্ঞান ইলহাম করেন যাতে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদানেই অক্ষমতা প্রকাশ না করেন এবং সত্যকে শনাক্তকরণে বিব্রত না হন। অতএব তিনি পবিত্র এবং আল্লাহর অনুগ্রহ, অনুমোদন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল প্রকার ভুল-ক্রটি থেকে নিরাপদে থাকবেন। মহান আল্লাহ তাঁকে এ বৈশিষ্ট্যগুলো দান করেন, যাতে তাঁর বান্দাদের জন্যে চূড়ান্ত প্রমাণ ও সাক্ষি হতে পারেন। আর এটি হল মহান আল্লাহরই অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ মানুষ কি এমন কাউকে শনাক্ত ও নির্বাচন করতে সক্ষম ? তাদের মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তি কি এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ?[২]

এছাড়া হাসান ইবনে ইয়াহ্ইয়া মাদায়েনী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম সাদিক (আঃ)-এর নিকট সবিনয়ে নিবেদন করেছিলাম ঃ যখন ইমামের (আঃ) নিকট কোন প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি কিরূপে (কোন জ্ঞানের মাধ্যমে) এর জবাব প্রদান করেন ? জবাবে বললেন ঃ কখনো কখনো তাঁর প্রতি ইলহাম

---

[১]। উসূলে কাফি, খঃ- ১, পৃঃ-২৫৭ (দারুল কুতুবুল ইসলামীয়া অনুসারে)।

[২]। উসূলে কাফি, খঃ-১, পৃঃ- (১৯৮-২০৩)।

হয়, কখনো কখনো তিনি ফেরেস্তা হতে শুনে থাকেন আবার কখনোবা উভয় প্রক্রিয়ায়।[১]

অপর এক রেওয়ায়েতে ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ যদি কোন ইমাম না জানেন যে, তাঁর উপর কী সংকট আপতিত হবে, তার কর্ম কোথায় সম্পন্ন হবে, তবে সে ইমাম মানুষের জন্যে আল্লাহর হুজ্জাত হতে পারে না।[২]

অনুরূপ ইমাম সাদিক (আঃ) কর্তৃক আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ যখন ইমাম কোন কিছুকে অনুধাবন করতে চান ,তখন মহান আল্লাহ তাঁকে তা অবহিত করেন।[৩]

এছাড়া একাধিক রেওয়ায়েতে ইমাম সাদিক (আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন ঃ রূহ এমন এক সৃষ্টি, যা জিব্রাঈল ও মিকাঈল (আঃ) অপেক্ষা সমুন্নত। আর তা মহানবী (সঃ)-এর নিকট ছিল এবং তাঁর পরে ইমামগণের (আঃ) নিকট বিদ্যমান থেকে তাঁদেরকে সংরক্ষণ করে।[৪]

---

[১]। বিহারুল আনওয়ার, খঃ-২৬, পৃঃ- ৫৮।

[২]। উসূলে কাফি, খঃ-১, পৃঃ-২৫৮।

[৩]। উসূলে কাফি, খঃ-১, পৃঃ-২৫৮।

[৪]। উসূলে কাফি, খঃ-১, পৃঃ-২৭৩।

পাঠ - ২০

হযরত মাহদী (আঃ)

- ভূমিকা
- বিশ্বব্যাপী ঐশী শাসনব্যবস্থা
- আল্লাহর প্রতিশ্রুতি
- হাদীস হতে একটি দৃষ্টান্ত
- লোকান্তর ও এর গূঢ় রহস্য

ভূমিকা ঃ

পূর্ববর্তী পাঠসমূহে প্রসঙ্গক্রমে আমরা দ্বাদশ ইমামের (আঃ) নাম সম্বলিত কয়েকটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম। এছাড়াও শিয়া ও সুন্নী উৎস থেকে এমন অসংখ্য রেওয়ায়েত রয়েছে যেগুলোর কোন কোনটিতে মহানবী (সঃ) থেকে শুধুমাত্র তাঁদের সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। আবার কোন কোনটিতে এ কথাটিও সংযুক্ত আছে যে, তাঁদের সকলেই কোরাইশ বংশের। অপর কিছুতে আবার তাঁদের সংখ্যাকে বনি ইসরাঈলের গোত্রপতিদের সমসংখ্যক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোন কোনটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁদের মধ্যে নয়জন, ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর সন্তান। অতঃপর আহলে সুন্নতের কোন কোন রেওয়ায়েত এবং শিয়া উৎস থেকে বর্ণিত কোন কোন মুতাওয়াতির হাদীসে তাঁদের প্রত্যেকের নাম বর্ণিত হয়েছে। [১] অনুরূপ শিয়া উৎস থেকে আরও অনেক হাদীসে আছে যাতে প্রত্যেক ইমামের (আঃ) ইমামত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ ক্ষুদ্রপরিসরে এগুলোর দৃষ্টান্ত তুলে ধরা সম্ভব নয়। [২]

ফলে এ অধ্যায়ের সর্বশেষ পাঠে আমরা দ্বাদশতম ইমাম হযরত মাহদীর (আঃ) (আল্লাহ তাঁর আত্মপ্রকাশ ত্বরান্বিত করুন) সম্পর্কে আলোচনায় মনোনিবেশ করব এবং সংক্ষিপ্ত কলেবর রক্ষার স্বার্থে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করব।

বিশ্বব্যাপী ঐশী শাসনব্যবস্থা ঃ

ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, নবীগণের (আঃ) আবির্ভাবের মূল ও প্রধাণ উদ্দেশ্য হল সচেতন ও স্বাধীনভাবে বিকাশ ও পূর্ণতা লাভের জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যা ওহীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষের জন্যে বাস্তবায়ন করেছেন। এছাড়া অপর কিছু উদ্দেশ্যও ছিল যেগুলোর মধ্যে যোগ্য ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, আত্মিক ও মানসিক পরিচর্যার কথা উল্লেখ করাযেতে পারে। সর্বোপরি মহান নবীগণ (আঃ) খোদাভীরুতা ও ঐশী মূল্যবোধের

১। মুনতাখাবুল আছার ফিল ইমামিছ ছানিয়া আশার, খঃ- ৩, পৃঃ- (১০-১৪০)।
২। বিহারুল আনওয়ার, গায়াতুল মারাম, ইসবাতুল হুদাহ ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ।

ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সারা বিশ্বময় ন্যায়-নীতির বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। আর এ পথে তাঁদের প্রত্যেকেই যথাসম্ভব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান ও কালে আল্লাহর ঐশী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কারও জন্যেই সমগ্র বিশ্বব্যাপী ঐশী শাসনব্যবস্থা প্রচলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না।

তবে উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি না হওয়ার অর্থ, নবীগণের (আঃ) জ্ঞান ও কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা অথবা পরিচালনা ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অক্ষমতা নয়। অনুরূপ নবীগণের (আঃ) আবির্ভাবের পশ্চাতে প্রভুর উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়নি তা-ও নয়। কারণ, ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানব সম্প্রদায়ের মুক্ত বিকাশ ও পূর্ণতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই হল প্রভুর উদ্দেশ্য । যেমনটি পবিত্র কোরানেও বর্ণিত হয়েছে ঃ

لئلا يكون للنّاس على الله حجّة بعد الرّسل

যাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। (সূরা নিসা-১৬৫)

সুতরাং সত্য ধর্ম গ্রহণে ও ঐশী নেতৃবর্গকে অনুসরণে বাধ্য করা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। ফলে উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, প্রভুর মূল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

অপরদিকে মহান আল্লাহ ঐশী গ্রন্থসমূহে বিশ্বের সর্বত্র ঐশী হুকুমতের বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যাকে মানব সম্প্রদায়ের বৃহত্তর পরিসরে সত্য দ্বীন গ্রহণের ক্ষেত্র সম্পর্কে একপ্রকার ভবিষ্যদ্বাণী বলা যেতে পারে। যখন মানব সম্প্রদায় সকল প্রতিষ্ঠান ও সকল শাসন ব্যবস্থা থেকে নিরাশ হয়ে পড়বে তখন সুনির্বাচিত ব্যক্তি ও ব্যক্তিসমষ্টির মাধ্যমে প্রভুর অদৃশ্য সাহায্যে, বিশ্বময় ঐশী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পথ থেকে সকল প্রকার অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা দূর করতঃ অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানবতার দ্বারে ন্যায় ও সুবিচার পৌঁছে দেয়া হবে। বলা যেতে পারে তখন সর্বশেষ নবীকে (সঃ) প্রেরণ এবং তাঁর বিশ্বজনীন ও চিরন্তন ধর্মের প্রবর্তনের পশ্চাতে প্রভুর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সফল হবে। কারণ তাঁর সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ

ليظهره على الدّين كله...............

অপর সমস্ত দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্যে ....[১]

'ইমামত হল নবুয়্যতের পরিসমাপক এবং খাতামিয়্যাতের পশ্চাতে হিকমাতস্বরূপ' –এর ভিত্তিতে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রভুর উদ্দেশ্য সর্বশেষ ইমামের মাধ্যমেই বাস্তবরূপ লাভ করবে। আর এটি হল, সে বিষয় যা মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে ইমাম মাহদী (আঃ) (আমাদের আত্মা তার জন্যে উৎসর্গ হোক) সম্পর্কে গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে সর্বপ্রথমে এ ধরনের হুকুমতের সুসংবাদবাহী আয়াতসমূহকে পবিত্র কোরান থেকে উল্লেখ করব। অতঃপর এ সম্পর্কিত কিছু রেওয়ায়েতের প্রতি ইংগিত করব।

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ঃ

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরানে উল্লেখ করেছেন ঃ

ولقد كتبنا في الزّبور من بعد الذكر انّ الارض يرثها عبادى الصالحون

আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমরা যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সূরা আম্বিয়া-১০৫)

সূরা আ'রাফের অপর একটি আয়াতে (১২৮-নং) হযরত মুসা (আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয়ই একদা মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে।

অপর এক স্থানে ফিরাউন, যে মানুষকে হীনবল করেছিল, তার কাহিনী উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে ঃ

و نريد ان نّمنّ على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين

আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল, তাদেরকে অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে। (সূরা কাসাস–৫)

১। তওবাহ -৩৩, ফাতহ-২৮, সাফ-৯, বিহারুল আনওয়ার, খঃ- ৫১, পৃঃ- ৫০, খঃ- ২২, পৃঃ- ৬০, খঃ-৫৮ও ৫৯।

এ আয়াতটি বনি ইসরাঈল সম্পর্কে এবং ফিরাউনের থাবা থেকে মুক্তি লাভের পর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সম্পর্কে নাযিল হলেও نريد (অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলাম) কথাটি প্রভুর অব্যাহত ইচ্ছা বা ইরাদার ইঙ্গিত বহন করে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকাংশ হাদীস অনুযায়ী উল্লেখিত আয়াতটি ইমাম মাহ্দীর (আঃ) (আল্লাহ তাঁর আবির্ভাব ত্বরান্বিত করুণ) অগমনের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে বলে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপ অপর এক স্থানে মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ঃ

وعد الله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصّالحات ليستخلفنّهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكننّ لهم دينهم الّذى ارتضى لهم و ليبدّلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لا يشركون بى شيئا و من كفر بعد ذالك فاولئك هم الفاسقون

> তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তী গণকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্যে সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিবাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী। (সুরা নূর– ৫৫)

আর হাদীসে এসেছে যে, এ প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত সহকারে হযরত মাহ্দীর (আঃ) (আল্লাহ তাঁর আবির্ভাব ত্বরান্বিত করুন) সময় বাস্তবরূপ লাভ করবে।[১]

অনুরূপ অপর এক শ্রেণীর হাদীস, কিছু আয়াতানুসারে [২] হযরত মাহদী (আঃ) এর প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখার স্বার্থে ঐগুলোর উল্লেখকরণ থেকে বিরত থাকব ।[৩]

১। বিহারুল আনওয়ার, খঃ- ৫১, পৃঃ- ৫৮, খঃ- ৫০, পৃঃ- ৫৪, খঃ- ৩৪ ও ৩৫।

২। যেমন এ আয়তসমূহ (ويكـون الـدين كلـه لله) (ليظهـره علـي الـدين كلـه) এবং (بقية الله خير لكم ان كنتم مومنين) ইত্যাদি।

৩। বিহারুল আনওয়ার, খঃ-৫১, পৃঃ- ৪৪-৬৪।

রেওয়ায়েত সমূহ ঃ

হযরত মাহ্দী (আঃ) (আল্লাহ তাঁর আবির্ভাব ত্বরান্বিত করুন) সম্পর্কে শিয়া এবং সুন্নী উৎস থেকে হযরত মহানবী (সঃ) থেকে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মুতাওয়াতিরের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে। আর শুধুমাত্র যে সকল হাদীস আহলে সুন্নাতের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর সত্যতা স্বীকার করার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের আলেমদের সংখ্যাও তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌঁছেছে তাদের একদল আলেমের বিশ্বাস যে, হযরত মাহ্দী (আঃ)-এর ব্যাপারে ইসলামের সকল মাযহাব ও ফিরকার মধ্যে মতৈক্য বিদ্যমান।[১] আহলে সুন্নাতের কোন কোন আলেম হযরত মাহ্দী (আঃ) ও তাঁর আবির্ভাবের আলামত সম্পর্কে গ্রন্থও লিখেছেন।[২] এখন আহলে সুন্নাত কর্তৃক বর্ণিত কিছু হাদীস তুলে ধরব। উদাহরণস্বরূপ ঃ মহানবী (সঃ) থেকে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ যদিও পৃথিবীর আয়ুস্কাল একদিনের বেশী অবশিষ্ট না থাকে তবু মহান আল্লাহ ঐ দিনটিকে এমন সুদীর্ঘ করবেন, যাতে আমার আহলে বাইতের মধ্য থেকে আমার নামের অনুরূপ নামধারী কোন ব্যক্তি হুকুমত করতে পারে (এবং পৃথিবীকে তদনুরূপ ন্যায়নীতিতে পূর্ণ করবে যদনুরূপ অন্যায় ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল)[৩]।

উম্মে সালমাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ মাহ্দী আমার বংশধর থেকে এবং ফাতিমার (সাঃ) সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ।[৪]

---

[১]। শারহে নাহজুল বালাগাহ -ইবনে আবিল হাদীদ, খঃ- ২, পৃঃ- ৫৩৫, সাবায়িকুয যাহাব সুবাইদি, পৃঃ- ৮৭, গায়াতুল মা'মূল, খঃ-৫, পৃঃ- ৩৬২।

[২]। যেমন ঃ 'আল বায়ান ফি আখবারি সাহিবিয যামান' সপ্তম শতাব্দীর হাফিয মুহাম্মদ বিন ইউসুফ গাঞ্জি শাফিয়ী আল বুরহান ফি আলামাতুল মাহদী আখিরিয যামান ১০ম শতাব্দীর সুত্তাক্বী হিন্দী কর্তৃক সংকলিত।

[৩]। সাহীহ তিরমিয়ী, খঃ- ২, পৃঃ- ৪৬, সাহীহ আবুদাউদ, খঃ-২, পৃঃ- ২০৭, মুসনাদে ইবনে হাম্বল, খঃ- ১, পৃঃ- ৩৭৮, ইউনাবিউল মুয়াদ্দাহ, পৃঃ- ১৮৬, ২৫৮, ৪৪০, ৪৮৮,৪৯০।

[৪]। আস্আফুর রাগিবিন, পৃঃ-১৩৪, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও বায়হাক্বী থেকে বর্ণিত।

আর ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আলী আমার পর উম্মতের ইমাম এবং তাঁর সন্তানদের মধ্যে কায়িমুল মুনতাযার [ইমাম মাহদী (আঃ)] থাকবে। যখন তাঁর আবির্ভাব হবে তখন তিনি পৃথিবীকে ঐরূপ ন্যায়নীতিতে পরিপূর্ণ করবেন যেরূপ অন্যায়ে পরিপূর্ণ ছিল।[১]

লোকান্তর ও এর গূঢ় রহস্য ঃ

দ্বাদশতম ইমামের বিশেষত্বসমূহের মধ্যে তার লোকান্তরিত হওয়ার ঘটনাটি অন্যতম, যা শিয়া মাযহাব কর্তৃক আহলে বাইত (আঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে গুরুত্ব সহাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণতঃ হযরত আব্দুল আযিম হাসানি, ইমাম মুহম্মদ তাক্বি (আঃ) থেকে, যিনি তাঁর পূর্বসুরিগণ (আঃ) থেকে এবং তাঁর পূর্বসুরিগণ (আঃ) আমিরুল মু'মিনিন হযরত আলী (আঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আমাদের উত্তরাধিকারী সুদীর্ঘ সময় লোকান্তরিত থাকবে, তখন আমাদের অনুসারীগণকে দেখতে পাবে ক্ষুধার্থ প্রাণী যেরূপ চারণভূমির সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সেরূপ তাঁর সন্ধানে রত থাকবে কিন্তু তাঁর সন্ধান পাবে না। জেনে রাখ, তাদের মধ্যে যে কেউ তার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং তার ইমামের লোকান্তরের সময় আপন হৃদয়কে কলুষতামুক্ত রাখবে কিয়ামতের দিবসে আমার সাথে আমার মর্যাদায় অবস্থান করবে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যখন আমাদের উত্তরাধিকারী আত্মপ্রকাশ করবে তখন তার উপর অন্য কারও অধিকার বহাল থাকবে না (অর্থাৎ অত্যাচারী শাসকের কোন আধিপত্য তার উপর থাকবে না)। আর এ কারণে গোপনে তাঁর জন্ম হবে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবে।[২]

অনুরূপ ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা [ইমাম হুসাইন (আঃ)] আমীরুল মু'মিনিন (আঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

আমাদের উত্তরাধিকারীর দু'টি গাইবাত রয়েছে যার একটি অপরটি অপেক্ষা দীর্ঘ এবং শুধুমাত্র যারা দৃঢ় বিশ্বাস ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী

১। ইউনাবিউল মুয়াদ্দাহ, পৃঃ- ৪৯৪।
২। মুনতাখাবুল আছার, পৃঃ- ২৫৫।

হবে তারাই তাঁর ইমামতের উপর বিদ্যমান থাকবে।[১]

এখন আমরা, গাইবাতের রহস্য সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হওয়ার জন্যে পবিত্র ইমামগণের (আঃ) অতীত ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

আমরা জানি যে, রাসূল (সঃ)-এর পর অধিকাংশ মানুষ, প্রথমে আবু বকরের কাছে অতঃপর ওমরের কাছে এবং তৎপর ওছমানের কাছে বাইয়াত করেছিলেন। তবে ওছমানের শাসনকালের শেষ দিকে অন্যায় বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক দুর্নীতির কারণে জনগণ বিদ্রোহী হয়ে তাকে হত্যা করতঃ আমীরুল মু'মিনিন আলী (আঃ)-এর নিকট আনুগত্য প্রকাশ করেছিল।

হযরত আলী (আঃ) যিনি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) কর্তৃক মনোনীত খলিফা ছিলেন, তিনি পূর্ববর্তী খলিফাত্রয়ের শাসনামলে নবীন ইসলামী সমাজের কল্যাণার্থে নিরব ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং শুধুমাত্র কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ ব্যতিত কোন অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেননি। এমতাবস্থায় ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে কোন পদক্ষেপ নিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। অপরদিকে তাঁর কয়েক বছরের শাসনামল উষ্ট্রারোহী (জংগে জামাল), মোয়াবিয়ার (সিফ্‌ফিন) ও খাওয়ারেজদের (নাহরাওয়ান) সাথে যুদ্ধে অতিবাহিত হয়েছে। অবশেষে খাওয়ারেজীদেরই একজনের মাধ্যমে শাহাদাত বরণ করেন।

অনুরূপ ইমাম হাসান (আঃ) ও মোয়াবিয়ার নির্দেশে বিষাক্রান্ত হন এবং মোয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াযিদ, যে ইসলামের সুস্পষ্ট নিয়মের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করত না, সে-ও উমাইয়্যাদের সিংহাসনে আরোহণ করে। আর এভাবে ক্রমান্বয়ে ইসলামের কোন নাম ঠিকানাও অবশিষ্ট ছিল না। আর এ কারণে ইমাম হুসাইনের (আঃ) পক্ষে, এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তিনি নিজের নির্মম শাহাদাতের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা হলেও সাবধানতা ও সচেতনতা সৃষ্টি করেছিলেন এবং ইসলামকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তথাপি ইসলামের ন্যায়নীতিপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সামাজিক পরিবেশ রূপ পরিগ্রহ করেনি। ফলে অন্যান্য ইমামগণ (আঃ) ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের সংহতকরণ, ইসলামের বিধি-

---

[১]। মুনতাখাবুল আছার, পৃঃ- ২৫১।

বিধান, জ্ঞান ও আত্মিক পরিচর্যাগত দিকের প্রচার ও প্রসার এবং যোগ্য ব্যক্তিদের আত্মিক পরিশুদ্ধকরণে মনোনিবেশ করেছিলেন। আবার অনুকূল পরিস্থিতিতে গোপনে জনগণকে অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আহ্বান করতেন। আর একই সাথে তাদেরকে বিশ্বব্যাপি ঐশী শাসনব্যবস্থার বিষয়ে আশাবাদী করে তুলতেন। অবশেষে তাঁরা পরস্পরায় শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

যা হোক পবিত্র ইমামগণ (আঃ) আড়াই শতাব্দী ধরে অবর্ণনীয় সমস্যা ও সংকটের মধ্যেও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে মানুষের নিকট তুলে ধরতে পেরেছিলেন –কিছুটা সাধারণভাবে, আবার কিছুটা বিশেষভাবে বিশ্বস্ত অনুসারী ও একান্ত ব্যক্তিবর্গের জন্যে। আর এভাবেই ইসলামী শিক্ষা, সমাজের সর্বস্তরে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল এবং মুহাম্মদী শরীয়তের নিশ্চয়তা বিধিত হয়েছিল। একই সাথে ইসলামী দেশসমূহের কোন কোন অংশে অত্যাচারী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার জন্যে সংগঠনও রূপ লাভ করেছিল এবং অন্ততঃপক্ষে কিছুটা হলেও অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পেরেছিল।

তবে স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ভয় ও উদ্বেগ বৃদ্ধির কারণ হল, হযরত মাহ্‌দীর (আঃ) আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি, যা তাদের অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করেছে। ফলে ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)-এর সমসাময়িক শাসকবর্গ তাঁকে কঠোর প্রহরার মধ্যে রেখেছিল, যাতে তাঁর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে, তৎক্ষণাৎ শহীদ করতে পারে। এ জন্যেই স্বয়ং হযরত হাসান আসকারীকেও (আঃ) তাঁর যৌবনেই তারা শহীদ করেছিল।

কিন্তু প্রভুর প্রত্যয় ছিল এটাই যে, হযরত মাহ্‌দী (আঃ) জন্মগ্রহণ করবেন এবং মানবতার মুক্তির জন্যে সঞ্চিত থাকবেন। আর এ কারণেই তাঁর পিতার জীবদ্দশায় (পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত) শিয়াদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যতীত[১], অন্য কেউ তাঁকে দেখেননি এবং তিনি তাঁর মহান পিতার শাহাদাতের পর চারজন ব্যক্তির মাধ্যমে জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন,

---

১। উছমান ইবনে সাঈদ, মুহাম্মদ ইবনে উছমান ইবনে সাঈদ, হুসাইন ইবনে রূহ এবং আলী ইবনে মুহাম্মদ সামারী।

যাদের প্রত্যেকেই পরম্পরায় প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। অতঃপর অনির্দিষ্টকালের জন্যে 'গাইবাতে কোবরা' শুরু হয়েছে এবং যে দিন মানব সমাজ বিশ্বজনীন ঐশী শাসন ব্যবস্থাকে গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হবে, সেদিন মহান আল্লাহর নির্দেশে তিনি আত্ম প্রকাশ করবেন।

অতএব হযরত মাহ্দীর (আঃ) গাইবাতের প্রকৃত রহস্য হল এই যে, স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারীদের দুস্কৃতি থেকে নিরাপদ থাকা। এছাড়া কোন কোন রেওয়ায়েতে অন্যান্য হিকমতের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মানুষকে পরীক্ষা করার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎচূড়ান্ত দলিল সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হওয়ার পর মানুষ কতটা অবিচলতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করে তা পরীক্ষা করা।

তবে লোকান্তরের সময়র মানুষ হযরত মাহ্দীর (আঃ) করুণা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়নি এবং কোন এক রেওয়ায়েতের ভাষায় -মেঘের আড়ালে বিদ্যমান সূর্যের[১] ন্যায় কিছুটা হলেও তাঁর দ্যুতি মানুষের নিকট পৌঁছে। যেমনকরে অসংখ্য মানুষ (যতই অপরিচিত অবস্থায়ই হোক না কেন) তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন এবং বস্তুগত ও অবস্তুগত সমস্যাসমূহের সমাধানে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত মাহ্দী (আঃ)-এর বিদ্যমানতা হল মানুষের আস্থাশীলতা ও অনুপ্রেরণার গুরুত্বপূর্ণ কারণ যাতে আত্মসংশোধণের মাধ্যমে হযরত মাহ্দী (আঃ)-এর আত্মপ্রকাশের জন্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে।

---

[১]। বিহারুল আনওয়ার, খঃ-৫২, পৃঃ ৯২।

তৃতীয় খণ্ড

পুনরুত্থান দিবস পরিচিতি

পাঠ – ১

পুনরুত্থান দিবসের পরিচিতির গুরুত্ব

- ভূমিকা
- পুনরুত্থান দিবসের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব
- পুনরুত্থান দিবস সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি কোরানের গুরুত্বারোপ
- উপসংহার

ভূমিকা ঃ

এ পুস্তকের প্রারম্ভে দ্বীন ও এর মৌলিক বিশ্বাসসমূহের (তাওহীদ, নবুয়্যত ও পুনরুত্থান) উপর অনুসন্ধানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং উল্লেখ করেছি যে, মানুষের জীবন মানবীয় হওয়ার ব্যাপারটি উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রকৃত সমাধানের উপর নির্ভরশীল। প্রথম খণ্ডে খোদা পরিচিতি, দ্বিতীয় খণ্ডে পথপ্রদর্শক পরিচিতি ও পথনির্দেশিকা পরিচিতি (নবুয়্যত ও ইমামত) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পুনরুত্থান বা মাআদ (معاد) সম্পর্কে "পুনরুত্থান দিবসের পরিচিতির গুরুত্ব" শিরোনামে আলোচনায় মনোনিবেশ করব।

প্রারম্ভেই এ মৌলিক বিশ্বাসের বিশেষত্ব এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তার ভূমিকা বর্ণনা করব। অতঃপর বিশ্লেষণ করব যে, মাআদের প্রকৃত ধারনালাভ বিমূর্ত ও অমর আত্মার (روح) প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সম্পর্কিত। যেমনকরে 'অস্তিত্ব পরিচিতি' একক প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত অপূর্ণ থাকে, তেমনি 'মানব পরিচিতিও' অমর রূহের বিশ্বাস ব্যতীত অসমাপ্ত থাকে। অবশেষে পুনরুত্থানের মৌলিক বিষয়সমূহকে এ পুস্তকের প্রচলিত রীতিতে ব্যাখ্যা করব ।

পুনরুত্থান দিবসের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব ঃ

প্রয়োজন ও চাহিদার যোগান দান, মূল্যবোধ অর্জন এবং পরিশেষে চূড়ান্ত সৌভাগ্য ও উৎকর্ষে পৌঁছাই হল মানুষের কর্মানুরাগের কারণ। আর কর্মের মান ও গুণ এবং এগুলোর দিকনির্দেশনার প্রক্রিয়া বিভিন্ন উদ্দেশ্য নির্ধারণের উপর নির্ভরশীল এবং জীবনের সকল প্রচেষ্টা ঐ সকল উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যেই সম্পাদিত হয়ে থাকে ।

অতএব জীবনের সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ, কার্যক্রমের দিকনির্দেশনা প্রদান ও কর্ম নির্বাবনের ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা রাখে। প্রকৃতপক্ষে জীবনের অনুসৃত নীতি নির্ধারণের নির্বাহক, স্বীয় বাস্তবতা, উৎকর্ষ ও কল্যাণ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ধরন থেকে রূপলাভ করে। ফলে যিনি শুধুমাত্র বস্তুগত উপাদানসমূহ ও এ গুলোর জটিল ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সমষ্টিকেই স্বীয় জীবনের বাস্তবতা বলে মনে

করেন এবং নিজ জীবনকে সীমাবদ্ধ পার্থিব ইহকালীন জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে ভাবেন এবং ভোগ, বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যকে এ ইহকালীন জীবনের চাওয়া-পাওয়া ব্যতীত কিছু ভাবতে পারেন না, তবে তিনি তার জীবনের কর্মসূচীকে এমনভাবে সজ্জিত করবেন, যা কেবলমাত্র পার্থিব চাহিদা পূরণ করবে। অপরদিকে যিনি জীবনের বাস্তবতাকে বস্তুগত বিষয়ের উর্ধ্বে বলে মনে করেন এবং মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তি নয় বলে জানেন ; বরং মনে করেন যে, মৃত্যু হল এ নশ্বর পার্থিব জীবন থেকে অবিনশ্বর জীবনে পদার্পণের পথে একটি স্থানান্তর বিন্দু এবং যিনি স্বীয় সঠিক আচার-আচরণকে অশেষ কল্যাণ ও উৎকর্ষের মাধ্যম বলে মনে করেন, তবে তিনি তার জীবনের কর্মসূচীকে এমন ভাবে বিন্যাস করবেন, যাতে পরকালীন জীবনে অধিকতর লাভবান হতে পারেন। ফলে পার্থিব জীবনের কষ্ট ও বিফলতা, তাকে হতাশ ও নিরাশ করতে পারে না এবং স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন , অনন্ত সৌভাগ্য ও উৎকর্ষের পথে প্রচেষ্টা চালানো থেকে তাকে বিরত রাখতে পারে না।

এ দু'ধরনের মানব পরিচিতি শুধুমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের উপর প্রভাব ফেলে না বরং তাদের সামাজিক জীবন ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এছাড়া পরকালীন জীবন এবং চিরন্তন স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির প্রতি বিশ্বাস, অপরের অধিকার সংরক্ষণ ও দুস্থ মানবতার সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর যে সমাজে এ ধরনের বিশ্বাস বিরাজমান, সে সমাজে ন্যায়ভিত্তিক কোন কানুন প্রবর্তন করতে এবং অন্যের প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার প্রতিরোধ করতে অপেক্ষাকৃত কম বল প্রয়োগ করতে হয়। স্বভাবতঃই এ বিশ্বাস যতই বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন হতে থাকবে, ততই আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ হ্রাস পেতে থাকবে।

উপরোল্লিখিত বিষয়টির উপর ভিত্তি করে পুনরুত্থানের বিষয় ও এ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণার গুরুত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এমনকি শুধুমাত্র তাওহীদের বিশ্বাস (পুনরুত্থানে বিশ্বাস ব্যতীত), জীবনের কাংখিত দিকনির্দেশনার পথে পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আর এখানেই সকল ঐশী ধর্ম, বিশেষকরে পবিত্র ইসলাম ধর্ম কর্তৃক এ মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করার এবং মানুষের অন্তরে এর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নবীগণের (আঃ) অপরিসীম প্রচেষ্টার রহস্য উদঘাটিত হয়।

পারলৌকিক জীবনের প্রতি বিশ্বাস, একমাত্র তখনই মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচার-আচরণের দিকনির্দেশনা প্রদানের ব্যাপারে স্বীয় ভূমিকা পালন করতে পারবে যখন ইহলৌকিক কর্ম-কাণ্ড ও পরলৌকিক সুখ-দুঃখের মধ্যে একপ্রকার কার্য-কারণগত সম্পর্ক বিদ্যমান বলে গৃহীত হবে এবং ন্যূনতমপক্ষে পারলৌকিক বৈভব ও শাস্তি, ইহলৌকিক সুকর্ম ও দুষ্কর্মের ফলশ্রুতিরূপে পরিগণিত হবে। নতুবা যদি এরূপ মনে করা হয় যে, পরলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধি, এ বিশ্বেই লাভ করা সম্ভব (যেমনকরে পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি এ পৃথিবীতেই লাভ করা সম্ভব), তবে পারলৌকিক জীবনের প্রতি বিশ্বাস, ইহলৌকিক জীবনের কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশনায় স্বকীয়তা বিবর্জিত হবে। কারণ এরূপ ধারণা পোষণ করার অর্থ হবে ঃ এ বিশ্বে সুখ-সমৃদ্ধি অর্জনের নিমিত্তে সচেষ্ট হওয়া উচিৎ এবং পরলৌকিক সমৃদ্ধি লাভ করার জন্যে মরণোত্তর জীবনেই বা পরপারেই সচেষ্ট হতে হবে।

অতএব পুনরুত্থান ও পরলৌকিক জীবনের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি এ দু'লোকের (ইহ ও পারলৌকিক) জীবনের সম্পর্ক এবং অনন্ত সুখ-দুঃখের পথে ঐচ্ছিক ক্রিয়াকলাপের যে প্রভাব বিদ্যমান তা-ও প্রমাণ করতে হবে।

পুনরুত্থান দিবস সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি কোরানের গুরুত্বারোপ ঃ

কোরানের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী আয়াত অনন্ত জীবন সংক্রান্ত ঃ এক শ্রেনীর আয়াত পরকালে বিশ্বাসের আবশ্যকতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে[১] অপর শ্রেণীর আয়াত পরকালকে অস্বীকার করার ফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[২] তৃতীয় শ্রেণীর আয়াতে পরকালীন অনন্ত বৈভব সম্পর্কে[৩] এবং চতুর্থ শ্রেণীর আয়াতে অনন্ত শাস্তি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।[৪]

অনুরূপ সুকর্ম ও কুকর্মের সাথে ঐগুলোর পরকালীন ফলাফল সম্পর্কেও অসংখ্য আয়াতে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া একাধিক পদ্ধতিতে

১। বাকারা-৪, লোকমান-৪, নামল-৩।
২। ইসরা -১০,ফোরকান -১১, সাবা-৮, মু'মিনুন-৭৪।
৩। আর রাহমান - ৪৬ থেকে শেষ পর্যন্ত, ওয়াক্বিয়াহ- ১৫, ৩৮, দাহর -১১,২১।
৪। আল্ হাক্বাহ - ২০,২৭, আল্ মূলক ৬-১১, ওয়াক্বিয়াহ ৪২-৫৬।

পুনরুত্থানের সম্ভাবনা ও আবশ্যকতা সম্পর্কেও গুরুত্বারোপ ও বর্ণনা করা হয়েছে। আর সেই সাথে ক্বিয়ামত বা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হওয়া বা ভুলে যাওয়াই, পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকারকারীদের বিভিন্ন দুষ্কর্ম ও বিচ্যুতির উৎস হিসেবে গণনা করা হয়েছে।[১] কোরানের বিভিন্ন আয়াত থেকে আমরা পাই যে, পায়গাম্বরগণের (আঃ) বক্তব্য ও জনগণের সাথে তর্ক-বিতর্কের একটা প্রধান অংশ জুড়ে ছিল মাআদ বা পুনরুত্থানের ব্যাপার। এমনকি এটুকু বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, এ মূলবিষয়টির প্রতিপাদনের জন্যে তাদের প্রচেষ্টা তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করার চেয়েও অধিক ছিল। কারণ অধিকাংশ মানুষই এ মৌলিক বিষয়টিকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বেশী বিরোধীতা করেছিল। এ বিরোধিতার কারণকে নিম্নরূপে দু'টি সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা যেতে পারে ঃ একটি হল, সকল প্রকার অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য বিষয়কে অস্বীকার করার সাধারণ কারণ। আর অপরটি হল, কেবলমাত্র মাআদ বা পুনরুত্থান সম্পর্কিত অর্থাৎ উচ্ছৃংখলতা ও উদাসীনতা দায়িত্বহীনতার প্রতি ঝোঁক। কারণ যেমনটি ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্বিয়ামত ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস দায়িত্ববোধ, ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমারেখা মেনে চলা, অত্যাচার ও সীমালংঘন এবং দূর্নীতি ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখার শক্তিশালী সহায়ক। আর এর অস্বীকৃতির মাধ্যমে কামনা, বাসনা ও স্বেচ্ছাচারিতার পথ উন্মুক্ত হয়ে থাকে। পবিত্র কোরানে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

ايحسب الانسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوّى بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه

> মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ (গলে যাবার পর) একত্রিত করতে পারব না? বস্তুতঃ আমি তার আংগুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত (প্রথমবারের মত) পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। তবুও মানুষ তার সম্মুখে যা আছে তা অস্বীকার করতে চায়। (কিয়ামাহ ৩-৫)

আর পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করার মত এ ধরনের মন মানসিকতা প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, যারা তাদের বক্তব্যে ও লিখনিতে পুনরুত্থান ও পরকাল এবং এ সম্পর্কিত কোরানের অন্যান্য বক্তব্যকে এ পার্থিব ঘটনাপ্রবাহ ও জাতি বা গোষ্ঠীসমূহের পুনর্জাগরণ ও শ্রেণী বৈষম্যহীন

---

[১]। সাদ-২৬, সিজদাহ-১৪০।

সমাজ প্রতিষ্ঠা কিংবা মর্তের স্বর্গ গড়ার সাথে তুলনা করতে স্বচেষ্ট অথবা চেষ্টা করেন পরকাল বা এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভাবার্থসমূহকে শুধুমাত্র মূল্যবোধগত ভাবার্থ বা বিশ্বাসগত অথবা কাল্পনিক বিষয় [১] বলে ব্যাখ্যা প্রদান করতে। কোরান এ ধরনের লোকদেরকে 'মানব শয়তান' ও 'নবীগনের শত্রু' বলে চিহ্নিত করেছে। এরা তাদের মনোহর ও প্রতারনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় হরণ করে এবং মানুষকে সঠিক বিশ্বাস ও ঐশী বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ থেকে দূরে রাখে।

وكذالك جعلنا لكلّ نبيّ عدوّا شياطين الانس والجنّ يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولوشاء ربّك مافعلوه فذرهم وما يفترون

> এরূপে, মানব ও জিন্নের মধ্যে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে; যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন (জোরপূর্বক তাদেরকে বিরত রাখতেন) তবে তারা এটা করত না (কিন্তু আল্লাহ চান মানুষ সঠিক ও ভ্রান্তপথ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকুক) সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন কর। (সূরা আনআম ১১২)

ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة و ليرضوه و ليقترفوا ما هم مقترفون

> এবং তারা এই উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের মন যেন তার প্রতি অনুরাগী হয় এবং তাতে যেন তারা পরিতুষ্ট হয়, আর তারা যে অপকর্ম করে তারা যেন তাই করতে থাকে। (সূরা আনা'ম -১১৩)

উপসংহার ঃ

কোন ব্যক্তি যাতে তার জীবনে এমন পথ নির্বাচন করতে পারে যে, প্রকৃত সৌভাগ্য ও উৎকর্ষ অর্জন করা যায়, তবে তাকে ভেবে দেখা উচিৎ মৃত্যুর সাথেই কি কোন মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে, না কি অপর কোন জীবন এ জীবনের পরে বিদ্যমান? এ পৃথিবী থেকে অপর কোন জগতে স্থানান্তরিত হওয়ার

---

[১]। সূরা নামল-৬৮, আহক্বাফ-১৭।

অর্থ কি এক শহর থেকে অপর শহরে ভ্রমণের মত যে, জীবন ধারণের যাবতীয় সরঞ্জামাদি ঐ স্থানেই সংগ্রহ করতে পারে, নাকি এ ইহলৌকিক জীবন, পরবর্তী জীবনের সুখ-দুঃখের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং পরবর্তী জীবনের ভূমিকা স্বরূপ, যার ফলে সকল কর্ম এখানেই সম্পন্ন করতে হবে এবং চূড়ান্ত ফল ওখানে লাভ করতে হবে ?

এ প্রশ্নগুলোর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জীবনের জন্যে সঠিক পথ ও সঠিক অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচী নির্বাচনের পালা আসে না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত গন্তব্য নির্ধারণ না হবে, সেখানে পৌঁছার পথও নির্ধারণ করা যাবে না।

পরিশেষে স্মরণযোগ্য যে, এ ধরনের জীবনের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা যতই দুর্বল হোক না কেন, তা-ই সচেতন ও জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে যথেষ্ট, যা তাকে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণায় বাধ্য করে। কারণ "সম্ভাব্যতার পরিমাণ" অপরিসীম।

পাঠ – ২

পুনরুত্থানের বিষয়টি রূহের সাথে সম্পর্কিত

- জীবন্ত অস্তিত্বে একত্বতার ভিত্তি
- মানুষের অস্তিত্বে রূহের অবস্থান

জীবন্ত অস্তিত্বে একত্বের ভিত্তি ঃ

মানুষের শরীর সকল প্রাণীর মতই একাধিক কোষের সমষ্টি যাদের প্রত্যেকটিই সর্বদা রাসায়নিক পরিবর্তন, রূপান্তর ও বিবর্তিত অবস্থায় আছে। এদের সংখ্যাও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবর্তনশীল এবং এমন কোন মানুষ পাওয়া যাবে না যার জীবনে শরীর গঠনকারী উপাদানসমূহ পরিবর্তন হয়নি অথবা যার কোষের সংখ্যা সর্বদা ধ্রুব।

অতএব প্রাণীদেহে এবং বিশেষকরে মানুষের দেহে সংগঠিত এই পরিবর্তন ও রূপান্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন হতে পারে যে, কিসের ভিত্তিতে (একই দেহের একাধিক পরিবর্তন সত্ত্বেও) এ পরিবর্তিত বিষয়গুলোকে অভিন্ন অস্তিত্বরূপে গণনা করা যেতে পারে যদিও তার অঙ্গসমূহ আজীবন অসংখ্য রূপান্তরের সম্মুখীন হয়েছিল ? [১]

এ প্রশ্নের যে সহজ উত্তরটি দেয়া হয় তা হল ঃ সকল প্রকার জীবন্ত অস্তিত্বেরই একত্বের ভিত্তি হল, তাদের একই সময়ের এবং বিভিন্ন সময়ের অঙ্গ-প্রতঙ্গসমূহের মধ্যে সংযোগ। যদিও দেহের কোষসমূহ ক্রমান্বয়ে মৃত্যু লাভ করে এবং নতুন কোষসমূহ ঐগুলোর স্থান দখল করে, তথাপি এ পরিবর্তিত ধারার সংযুক্তিকে অভিন্ন বিষয় বলে গণনা করা যেতে পারে।

কিন্তু এ জবাবটি সন্তোষজনক উত্তর হতে পারে না। কারণ আমরা যদি ইটের তৈরী কোন একটি ইমারতকে কল্পনা করি যার ইটগুলোকে ক্রমান্বয়ে এরূপে পরিবর্তন করা হল যে, কিছুদিন পর পূর্ববর্তী কোন ইটই তাতে অবশিষ্ট রইল না, তবে এ নতুন ইটের সমষ্টিকে ঠিক পূর্বের সে ইমারতই বলে মনে করা যাবে না, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের বক্তব্য শুধুমাত্র তাদের পক্ষ থেকে বিবৃত হয়, যারা সমষ্টির অংশসমূহের পরিবর্তন সম্পর্কে কোন খবর রাখেন না। প্রাগুক্ত প্রশ্নটির জবাবটিকে নিম্নরূপে সম্পূরণ করা যেতে পারে ঃ উল্লেখিত ক্রমানুগতিক পরিবর্তন কেবলমাত্র তখনই কোন সমষ্টির অভিন্নতার

১। এ প্রশ্নটির পূর্বে অপর একটি প্রশ্নও আসতে পারে। যেমন ঃ মূলতঃ কোন নির্দিষ্ট সমষ্টির একত্বের ভিত্তি কী ? রাসায়নিক ও জৈবরাসায়নিক যৌগসমূহ কিসের ভিত্তিতে অভিন্ন অস্তিত্বরূপে পরিগণিত হতে পারে? কিন্তু আলোচনা দীর্ঘায়িত না করার স্বার্থে, এসকল প্রশ্নের উল্লেখকরণ থেকে বিরত থাকলাম। দ্রষ্টব্য ঃ অমূজেশে ফালসাফেহ্, প্রথম খণ্ড।

ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিপত্তি সৃষ্টি করে না যখন তা কোন এক স্বভাবজাত ও আভ্যন্তরীণ নির্বাহীর ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে -যেমনটি জীবন্ত অস্তিত্বের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। তবে ইমারতের ইটসমূহের পরিবর্তন বাহ্যিক ও গাঠনিক নির্বাহীর মাধ্যমে অর্জিত হয় আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে অভিন্নতা ও প্রকৃত একাত্মতাকে অংশসমূহের পরিবর্তন ধারায় ঐগুলোর স্বগোত্র বলে মনে করা যায় না।

এ জবাবটি সেই স্বভাবজাত একক নির্বাহীর গ্রাহ্যতার উপর নির্ভরশীল যা পরিবর্তন ধারায় সর্বদা অবশিষ্ট থাকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত ও অংশগত বিন্যাস ও শৃংখলাকে রক্ষা করে । অতএব স্বয়ং এ নির্বাহী সম্পর্কেই প্রশ্ন আসে যে, প্রকৃতপক্ষে তা কী ? এর একাত্মতার ভিত্তিই বা কী ?

প্রসিদ্ধ দার্শনিক মতবাদানুসারে সকল প্রাকৃতিক অস্তিত্বের একাত্মতার ভিত্তি হল, প্রকৃতি (طبيعت) অথবা গঠন (صورت) [১] নামক এক অস্পৃশ্য ও সরল (بسيط) (অর্থাৎ যা যৌগিক নয়) বিষয়, যা বস্তুর পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় না। জীবন্ত অস্তিত্বে যে খাদ্যগ্রহণ, বিকাশ ও প্রজনন প্রক্রিয়ার মত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হয়, তাকে নাফস (نفس) বা আত্মা নামকরণ করা হয়।

প্রচীন দার্শনিকগণ উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাফস বা আত্মাকে বস্তুগত (مادّي) এবং মনুষ্য আত্মা বা নাফসকে 'অবস্তুগত' (مجرد) বলে মনে করতেন। কিন্তু ইসলামী দার্শনিকদের অনেকেই, বিশেষকরে সাদরুল মুতা'ল্লেহীন শিরাজী প্রাণীর নাফসকেও এক পর্যায়ের অবস্তগত বলে মনে করেছেন এবং চেতনা ও প্রত্যয়কে অবস্তুগত অস্তিত্বের নির্দেশনা ও অপরিহার্যতা বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বস্তুবাদীরা, যারা অস্তিত্বকে শুধুমাত্র বস্তু ও বস্তুর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে মনে করেন, তারা অস্পৃশ্য রূহ বা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে থাকেন। আধুনিক বস্তুবাদীরা (যেমন ঃ পোষ্টিবিষ্টরা) প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার অস্পৃশ্য (অর্থাৎ যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়) বিষয়কেই অস্বীকার করেন বা অস্পৃশ্য বিষয়কে অন্ততঃ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা যায় না বলে মনে করেন। ফলে তারা প্রকৃতি বা অস্পৃশ্য গঠনকে গ্রহণ করেন না। আর স্বভাবতঃই একাত্মতার

১। উল্লেখ্য, এ শব্দগুলোর প্রতিটিরই অন্যান্য পরিভাষাগত অর্থও বিদ্যমান। তবে এখানে এগুলোর মানে হল সেই প্রকারণগত গঠন (صورت نوعيه) ।

ভিত্তি সম্পর্কেও তাদের নিকট কোন সঠিক জবাব নেই।

যেহেতু উদ্ভিদে একাত্মতার ভিত্তি হল উদ্ভিজ্জ আত্মা, সেহেতু উদ্ভিজ্জ জীবন উপযুক্ত বস্তুতে বিশেষ উদ্ভিদীয় গঠন ও আত্মার অস্তিত্বের আওতায় থাকে। আর যখনই বস্তুর এ উপযুক্ততা (বা গ্রহণ ক্ষমতা) বিলুপ্ত হয়, তখনই এ উদ্ভিদীয় গঠন ও আত্মারও বিস্মৃতি ঘটে। আবার যদি সেই বস্তু পুনরায় নতুনভাবে উদ্ভিজ্জ গঠন গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করে, তবে তা নতুন এক উদ্ভিদীয় আত্মার অধিকারী হয়। কিন্তু পুরাতন ও নতুন উদ্ভিদের মধ্যে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, প্রকৃতার্থে এগুলো অভিন্ন নয় এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন উদ্ভিদকে, পূর্বোক্ত উদ্ভিদ রূপেই মনে করা যায় না।

তবে প্রাণী ও মানুষের নাফস বা আত্মা যেহেতু অবস্তুগত, সেহেতু দেহ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকতে পারে এবং পুনরায় যখন দেহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন ঠিক সেই ব্যক্তির একত্বতা ও অভিন্নতাকে রক্ষা করতে সক্ষম, যেরূপে মৃত্যুর পূর্বেও রূহ বা আত্মার ভিত্তিতে এ ব্যক্তির একত্বতা ও অভিন্নতা বজায় ছিল এবং দৈহিক উপাদানের পরিবর্তন ব্যক্তির বিভিন্নতার কারণ হয়নি। কিন্তু যদি কেউ প্রাণী ও মানুষের অস্তিত্বকে শুধুমাত্র এ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহে ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে মনে করে থাকেন এবং রূহকেও কোন এক বা সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের ফল বলে গণনা করে থাকেন, এমনকি একে অস্পৃশ্য গঠন মনে করলে ও বস্তুগত বলে গণনা করেন, যা এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিলুপ্তির সাথে সাথে বিনষ্ট হয়, তবে এ ধরনের ব্যক্তির পক্ষে পুনরুত্থানের সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ যদি ধারণা করা হয় যে, দেহ জীবনের জন্যে নতুনভাবে উপযুক্ততা অর্জন করেছে, তবে তাতে নতুন বৈশিষ্ট্য ও গুণের আবির্ভাব ঘটে। ফলে একাত্মতার বা অভিন্নতার (এটা তা-ই) আর কোন প্রকৃত ভিত্তির অস্তিত্ব থাকে না। কারণ ধারণা করা হয়েছে যে, পূর্বতন সকল বৈশিষ্ট্যই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে এবং নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ রূপ লাভ করেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, একমাত্র তখনই মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে সঠিক রূপে অনুধাবন করা যাবে, যখন রূহকে দেহ ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন অন্য কোন বিষয় বলে মনে করা হবে। এমনকি একে বস্তু গঠন, যা দেহে অনুপ্রবেশ করেছে এবং দেহের অবসানের সাথে সাথে বিনষ্ট হয়ে যায় তা-ও মনে করা যাবে না।

অতএব সর্বপ্রথমে রূহের (روح) অস্তিত্বকে স্বীকার করতে হবে। দ্বিতীয়ত ঃ রূহকে এক সত্তাগত বিষয় (Essence) বলে মনে করতে হবে, দেহ সমন্ধীয় বলে মনে করা যাবে না। তৃতীয়তঃ দেহ বিনষ্ট হওয়ার পরও একে স্বাধীন ও অবশিষ্ট থাকার যোগ্য বলে মনে করতে হবে ; অনুপ্রবেশকারী গঠনের মত নয় (পারিভাষিক অর্থে বস্তুতে সমাপতিত হওয়া) যে, দেহ বিনষ্ট হওয়ার সাথে সাথে বিনষ্ট হয়ে যাবে ।

মানুষের অস্তিত্বে আত্মার অবস্থান ঃ

অপর একটি বিষয় যা এখানে স্মরণ করব তা হল এই যে, দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষের গঠন দু'টি মৌলের সমন্বয়ে গঠিত অন্যান্য রাসায়নিক যৌগের মত নয়। উদাহরণতঃ অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে পানি গঠিত হয়, যাদের পারস্পরিক বিভাজনের ফলে একটি 'সমগ্র' হিসাবে ঐ যৌগের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু রূহ বা আত্মা হল মানুষের মূলসত্তা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ মনুষ্যত্ব এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সংরক্ষিত থাকবে। আর এ কারণেই দেহের কোষসমূহের পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির একত্বতার বা অভিন্নতার কোন ক্ষতি হয় না। কারণ মানুষের প্রকৃত একত্বতার ভিত্তি হল, তার সেই আত্মার একত্ব ।

পবিত্র কোরান এ বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে, পুনরুত্থান বা মাআদের অস্বীকারকারী যারা বলত ঃ "মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ বিধ্বস্ত হওয়ার পর কিরূপে তার পক্ষে নতুন জীবনলাভ সম্ভব ?" তাদের জবাবে বলে ঃ

قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم

বলুন (তোমরা বিলুপ্ত হবেনা বরং) তোমাদের জন্যে নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেস্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। (সূরা সিজদাহ-১১)

অতএব প্রত্যেকেরই মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের ভিত্তি হল তা-ই, যা মৃত্যুর ফেরেস্তা কব্জা বা হরণ করেন; দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নয় যেগুলো মাটির সাথে মিশে যায়।

পাঠ – ৩

আত্মার বিমূর্তনতা

- ভূমিকা
- আত্মার বিমূর্তনতার স্বপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলসমূহ
- কোরান থেকে দলিলাদি

ভূমিক ঃ

ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, মাআদ বা পুনরুত্থানের বিষয়টি আত্মার সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ কেবলমাত্র তখনই বলা যাবে যে, 'মৃত্যুর পর যিনি (পুনরায়) জীবিত হয়ে থাকবেন, তিনি সেই পূর্বের ব্যক্তিই' যখন তার আত্মা, তার দেহ বিনষ্ট হয়ে যাবার পরও অবশিষ্ট থাকবে। অন্যভাবে বলা যায় ঃ সকল মানুষই, বস্তুগতদেহ ছাড়া ও এক অবস্তুগত সত্তার অধিকারী, যা দেহ থেকে স্বাধীন হওয়ার যোগ্যতা রাখে এবং তার মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বও এর উপর নির্ভরশীল। নতুবা ঐ ব্যক্তির জন্যে নতুন কোন জীবনের ধারণা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

অতএব পুনরুত্থান ও এতদসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের উপর আলোচনা করার পূর্বে এ বিষয়টিকে প্রতিপাদন করতে হবে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই এ পাঠে আমরা কেবলমাত্র এ বিষয়টির উপরই আলোকপাত করব এবং একে প্রমাণের জন্যে দু'ধরনের যুক্তির অবতারণা করব ঃ একটি হল বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অপরটি হল ওহীর মাধ্যমে'।[১]

আত্মার বিমূর্তনতার স্বপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলসমূহ ঃ

প্রাচীনকাল থেকেই দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ রূহ (روح) বা আত্মা (দর্শনের পরিভাষায় যাকে নাফ্স বলা হয়[২]) সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে ইসলামী দার্শনিকগণ এ বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব

১। সম্ভবতঃ এ ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে যে, রূহ ও পুনরুত্থানের বিষয়কে ওহীর মাধ্যমে প্রমাণ করাটা আবর্তচক্রিক (vicious circle) যুক্তি প্রদর্শন করার শামিল। কারণ যে সকল দলিল, নবুয়্যতের প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণের জন্যে উপস্থাপন করা হয়েছে, সে গুলোতেই পরকালীন জীবনকে (যা রূহের উপর নির্ভরশীল) আসল বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে ওহী ও নবুয়্যতের মাধ্যমে এ মূলের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন আবশ্যকীয় রূপে আবর্তচক্রিক হবে।

কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, ওহীর মাধ্যমে যুক্তি প্রদর্শনের সঠিকতা 'নবুয়্যতের প্রয়োজনীয়তা' সম্পর্কিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে না; বরং এর (নবুয়্যতের) বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল, যা মু'জিযাহর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। আর যেহেতু স্বয়ং পবিত্র কোরানই মু'জিযাহ এবং ইসলামের নবী (সঃ)-এর সত্যতার স্বপক্ষে দলিলস্বরূপ, সেহেতু রূহ ও মাআদের প্রতিপাদনে এর মাধ্যমে যুক্তি উপস্থাপন সঠিক।

২। উল্লেখ্য, দর্শনে নাফ্স যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা আখলাকে ব্যবহৃত নাফ্সের ব্যতিক্রম। কারণ আখলাকের পরিভাষায় একে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিকূলে ব্যবহার করা হয়।

প্রদান করেছিলেন এবং তাদের দর্শন সম্পর্কিত পুস্তকসমূহের বিশেষ অংশ জুড়ে এ বিষয়টি স্থান পেলেও, তারা এ বিষয়টির শিরোনামে পৃথক পৃথক পুস্তক-পুস্তিকাও লিখেছিলেন। আর সেই সাথে যারা রূহকে দৈহিক সংঘটনসমূহের (Accidents) মধ্যে একটি সংঘটন (Accident) বলে মনে করেন অথবা বস্তুগত গঠন (দৈহিক উপাদানের অনুসারী) বলে গণনা করেন, তাদের বক্তব্যকে একাধিক যুক্তির মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

স্পষ্টতঃই এ ধরনের বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা এ পুস্তকসংশ্লিষ্ট নয়। ফলে এ বিষয়টির উপর কিছুটা আলোকপাত করেই তুষ্ট থাকব। আর চেষ্টা করব এ বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট ও একই সাথে সুদৃঢ় বক্তব্য উপস্থপন করতে। একাধিক বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের সমন্বয়ে এ বক্তব্যটির উপস্থাপন নিম্নলিখিত ভূমিকার মাধ্যমে সূচনা করব ঃ

আমরা আমাদের নিজ নিজ চর্মের রং ও দেহের গঠনকে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করি এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোমলতা ও কর্কশতাকে স্পর্শেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করতে পারি। আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে পরোক্ষভাবে অবহিত হতে পারি। কিন্তু ভয়-ভীতি, অনুগ্রহ-ক্রোধ, ইচ্ছা ও আমাদের চিন্তাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীতই অনুধাবন করে থাকি। অনুরূপ যে 'আমা' হতে এ অনুভব, অনুভূতির মত মানসিক অবস্থা প্রকাশ পায়, তাকেও কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেই উপলব্ধি করতে পারি।

সুতরাং মানুষ দু'প্রকার অনুভূতির অধিকারী ঃ এক প্রকারের অনুভূতি হল, যার জন্যে ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করতে হয় এবং অপর শ্রেণী হল, যার জন্যে ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না।

অপর একটি বিষয় হল ঃ ইন্দ্রিয়ানুভূতি যে, বিভিন্ন প্রকার ভুল-ভ্রান্তিতে পতিত হয় তার আলোকে বলা যায়, প্রাগুক্ত প্রথম শ্রেণীর অনুভূতি, দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুভূতির ব্যতিক্রমে ত্রুটি-বিচ্যুতিতে পতিত হওয়ার সম্ভাবণা থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুভূতিতে ভুল-ত্রুটি ও দ্বিধ-দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ থাকে না। যেমন ঃ কেউ হয়ত সন্দেহ করতে পারে যে, তার চামড়ার রং যে রকম দেখছে ঠিক সেরকমটি কি না। কিন্তু কেউই সন্দেহ করতে পারে না যে, সে কোন চিন্তা করে কি না, সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি না, সন্দেহ করছে কি না ।

আর এ বিষয়টিই দর্শনে এ ভাবে বর্ণিত হয় যে, স্বজ্ঞাত স্বতঃলব্ধ জ্ঞান (Intuitive Knowledge) প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং বাস্তবতার সাথে সমন্ধ স্থাপন করে। ফলে ত্রুটি-বিচ্যুতির কোন সুযোগ থাকে না। কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ বা অর্জিত জ্ঞান (Empirical Knowledge) অনুভূতিক গঠনের (Form) মাধ্যমে অর্জিত হয়। ফলে স্বভারতঃই সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে।

অর্থাৎ মানুষের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য জ্ঞান হল স্বজ্ঞাত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান, যা নাফ্স বা আত্মার জ্ঞান, আবেগ, অনুভূতি ও অন্যান্য সকল মানসিক অবস্থাকে সমন্বিত করে । অতএব উপলব্ধি ও চিন্তার ধারক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এ 'আমা'র অস্তিত্বে কখনোই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না –যেমনিকরে ভয়, অনুগ্রহ, ক্রোধ, চিন্তা ও ইচ্ছার অস্তিত্বে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না।

এখন প্রশ্ন হল ঃ এই 'আমা' কি সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বস্তুগত দেহ এবং মানসিক অবস্থা কি দেহ সংঘটিত; নাকি তাদের অস্তিত্ব দেহ ভিন্ন অন্য কিছু –যদিও 'আমা' দেহের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত এবং নিজের অনেক কর্মই দেহের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে; এছাড়া দেহ কর্তৃক প্রভাবিত হয় ও দেহকে প্রভাবিত করে ?

উল্লেখিত ভূমিকাটির আলোকে এর জবাব খুব সহজেই আমরা পেতে পারি। কারণ ঃ

প্রথমত ঃ 'আমা' কে স্বজ্ঞাত জ্ঞানে উপলব্ধি করব; কিন্তু দেহকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চিনতে হবে। অতএব 'আমা' (নাফস ও রূহ) দেহ ভিন্ন অন্য বিষয়।

দ্বিতীয়ত ঃ 'আমা' এমন এক অস্তিত্ব, যা যুগযুগান্তরে একত্বতার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃত ব্যক্তিত্বসহ অবশিষ্ট থাকে এবং এ একত্বতা ও ব্যক্তিত্বকে আমরা ভুল-ত্রুটি বিবর্জিত স্বজ্ঞাত জ্ঞানের মাধ্যমে খুঁজে পাই। অথচ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ অসংখ্যবার পরিবর্তিত হয় এবং পূর্ববর্তী ও উত্তরবর্তী অংশের একত্ব ও অভিন্নতার (এটা তা-ই) জন্যে কোন প্রকার প্রকৃত ভিত্তিরই অস্তিত্ব নেই।

তৃতীয়ত ঃ 'আমা' এক সরল (بسيط) ও অবিভাজ্য অস্তিত্ব।

উদাহরণতঃ একে দু'অর্ধ 'আমা'তে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। অথচ দেহের অঙ্গসমূহ বিবিধ এবং বিভাজনোপযোগী।

চতুর্থত ঃ কোন মানসিক অবস্থাই যেমন ঃ অনুভূতি ইচ্ছা ইত্যাদি বস্তুগত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বিস্তৃতি ও বিভাজন ইত্যাদির অধিকারী নয়। আর এ ধরনের কোন অবস্তুগত বিষয়কে বস্তু (দেহ) সংঘটন বলে গণনা করা যায় না। অতএব এ সংঘটনের বিষয় (موضوع) হল অবস্তুগত সত্তা (مجرد)।

রূহের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা এবং মৃত্যুর পরও এর অবশিষ্ট থাকার স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য ও মনোহর যুক্তিসমূহের মধ্যে একটি হল সত্য স্বপ্নসমূহ, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের মৃত্যুর পর সঠিক সংবাদসমূহ স্বপ্নদর্শনকারীর নিকট পৌঁছিয়েছেন। অনুরূপ আত্মাসমূহকে ডেকে পাঠানো, যা চূড়ান্ত ও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তসমূহ সহকারে একথার স্বপক্ষেই দলিল উপস্থাপন করে। এছাড়া আল্লাহর ওলীগণের কেরামত, এমনকি যোগীদের কোন কোন কর্মের কথাও আত্মা ও এর বিমূর্ততার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। এ বিষয়ের উপর লিখিত পৃথক পৃথক পুস্তক রয়েছে।

কোরান থেকে দলিলাদি ঃ

কোরানের ভাষায় মানুষের আত্মা সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই যে, রূহ অসীম মর্যাদার প্রান্ত থেকে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হয়। যেমনটি মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

ونفخ فيه من روحه

এবং তাতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর নিকট হতে। (সূরা সেজদা-৯)

অর্থাৎ দেহ গঠন করার পর নিজের (আল্লাহর) সাথে সম্পর্কিত রূহ তাতে প্রদান করলেন, খোদার জাত (ذات) থেকে নয়, যার ফলে খোদা মানুষে স্থান্তরিত হবেন (মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ ধরনের চিন্তা থেকে রক্ষা করুন)।

অনুরূপ হযরত আদমের (আঃ) সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

و نفخت فيه من روحي

এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করলাম। (হিজর -২৯) এবং (সাদ-৭২)

এছাড়া অপর কিছু আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাই যে, রূহ দেহ বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও সংঘটন ব্যতীত অন্য বিষয় এবং তা দেহ ব্যতীতই অবশিষ্ট থাকার যোগ্যতা রাখে। যেমন ঃ কাফেরদের বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলাহয় যে, তারা বলত ঃ

أءذا ضللنا في الارض أءنا لفى خلق جديد

আমরা (মৃত্যু বরণ এবং) মৃত্তিকায় পর্যবসিত হলেও এবং আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ মৃত্তিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লেও কি আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? (সেজদা-১০)

মহান আল্লাহ জবাব দিলেন ঃ

قل يتوفاكم ملك الموت الّذى وكل بكم ثمّ الى ربّكم ترجعون

বল, (তোমরা নিখোঁজ হবে না বরং) তোমাদের জন্যে নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেস্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (সোজদা-১১)

অতএব মানুষের স্বরূপের ভিত্তি মূলে রয়েছে তার আত্মা বা রূহ, যা মৃত্যুর ফেরেস্তা কর্তৃক হরণ করা ও সংরক্ষিত হয়ে থাকে; দেহের বিভিন্ন অংশ, যেগুলো বিধ্বস্ত ও মৃত্তিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, তা নয়।

অপর এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت في منامها فيمسك التى قضى عليها الموت و يرسل الاخرى الى اجل مسمّى

আল্লাহই জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্যে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলি এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ফিরিয়ে দেন। (সূরা যুমার -৪২)

অত্যাচারীদের মৃত্যুর প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হযেছে ঃ

اذ الظالمون في غمرات الموت و الملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم..

যখন জালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেস্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের কর ...। (আনআম-৯৩)

এ আয়াতসমূহ এবং অপর আয়াতসমূহ থেকে (সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখার জন্যে, এ গুলোর উল্লেখ থেকে বিরত থাকছি) আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য এমন কিছুতে বিদ্যমান যা মহান আল্লাহ ও মৃত্যুর ফেরেস্তাগণ বা রূহ কজাকারী ফেরেস্তাগণ হরণ করে থাকেন এবং দেহের বিনাশের ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বের একত্বতার ও রূহের বিদ্যমানতার কোন ক্ষতি করে না।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রিক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, প্রথমতঃ মানুষে রূহ (روح) ও আত্মা নামক কিছু বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ মানুষের আত্মা অবশিষ্ট থাকার ও দেহ থেকে স্বাধীন হওয়ার যোগ্যতা রাখে, বস্তুসংঘটন ও বস্তুগত গঠনের (صور مادّي) মত অবস্থানের বিলুপ্তির সাথে সাথে বিনাশ হয়ে যায় না। তৃতীয়তঃ সকলের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্রিকতা তার আত্মার উপর নির্ভরশীল। অন্যকথায় ঃ প্রত্যেক মানুষেরই বাস্তবতা বা প্রকৃত অবস্থা হল, তার আত্মায় এবং দেহ সেখানে আত্মার অধীনে সরঞ্জামের ভূমিকা রাখে মাত্র।

পাঠ – ৪

মাআদ বা পুনরুত্থানের প্রতিপাদন

- ভূমিকা
- প্রজ্ঞাভিত্তিক দলিল
- ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক দলিল

ভূমিকা ঃ

এ পুস্তকের প্রারম্ভেই আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, পুনরুত্থানে বিশ্বাস ও পরকালীন জগতে প্রত্যেক মানুষের জীবনলাভের বিশ্বাস, প্রতিটি ঐশী ধর্মেরই মৌলিকতম বিশ্বাসসমূহের অন্যতম। আল্লাহ্ প্রেরিত পুরুষগণ এ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন এবং মানুষের হৃদয়ে এর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার জন্যে অপরিসীম শ্রম ব্যয় করেছিলেন।

পবিত্র কোরানে পুনরুত্থান (معاد) ন্যায়পরায়ণতা (عدل) ও একক খোদার প্রতি বিশ্বাস সমান গুরুত্ব পেয়েছে এবং বিশটিরও অধিক সংখ্যক আয়াতে الله (আল্লাহ) ও واليوم الاخر (ওয়াল ইয়াওমূল আখির) একইসাথে ব্যবহার করা হয়েছে (পরকালীন জীবন সম্পর্কে বর্ণিত যে দু'সহস্রাধিক আয়াত এসেছে তা ব্যতীত)।

এ খণ্ডের শুরুতেই বিচার দিবসের পরিচিতির উপর গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এবং ব্যাখ্যা করেছিলাম যে, পুনরুত্থানের সঠিক ধারণা, আত্মা বা রূহকে স্বীকার করার উপর নির্ভরশীল, যা প্রত্যেক মানুষেরই স্বরূপের ভিত্তি এবং যা মৃত্যুর পরও অবশিষ্ট থাকে, যার ফলে বলা যায় ঃ যে ব্যক্তি পরলোকগমণ করে, ঠিক সে ব্যক্তিই পুনরায় পরকালে জীবন লাভ করবে। অতঃপর এ ধরনের রূহ বা আত্মার অস্তিত্বকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও ওহীভিত্তিক দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি, যাতে 'মানুষের অনন্ত জীবন' শীর্ষক মূল আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এখন এ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়টির প্রতিপাদনের পালা এসেছে।

রূহ বা আত্মার বিষয়টি যেরূপ দু'ভাবে (বুদ্ধি বৃত্তিক ও ওহী) প্রমাণিত হয়েছে সেরূপ এ বিষয়টিও দু'ভাবেই প্রতিপাদনযোগ্য। আমরা এখানে পুনরুত্থানের প্রয়োজনীয়তার উপর দু'টি বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল উপস্থাপন করব। অতঃপর পুনরুত্থানের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তার উপর পবিত্র কোরানের বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরব।

প্রজ্ঞাভিত্তিক দলিল ঃ

খোদা পরিচিতি খণ্ডে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, প্রভুর সৃষ্টি

উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থক নয়, বরং কল্যাণ ও পূর্ণতার প্রতি যে অনুরাগ প্রভুর সত্তায় (ذات) বিদ্যমান। মূলতঃ স্বয়ং সত্তায় এবং অনুবর্তনক্রমে এর প্রভাব, যা কল্যাণ ও পূর্ণতার একাধিক স্তরবিশিষ্ট, তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ফলে তিনি এ বিশ্বকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, যথাসম্ভব সর্বাধিক পূর্ণতা ও কল্যাণ তাতে অর্জিত হয়। আর এ কারণেই আমরা মহান প্রভুর প্রজ্ঞা বা হিকমত নামক গুণটি প্রমাণ করেছি, যার দাবী হল সৃষ্ট বিষয়সমূহকে তাদের চূড়ান্ত ও যথোপযুক্ত উৎকর্ষে পৌঁছানো। কিন্তু বস্তুগত বিশ্বে রয়েছে বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতা এবং বস্তুগত অস্তিত্বসমূহের কল্যাণ ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান পারস্পরিক বিরোধ। প্রজ্ঞাময় প্রভুর পরিচালনায় সৃষ্ট বিষয়াদি এরূপে বিন্যাসিত হয়েছে যে, সামগ্রিকভাবে ঐগুলো সর্বাধিক কল্যাণ ও পূর্ণতার অধিকারী হতে পারে। অন্যকথায় ঃ বিশ্ব সুশৃংখলিত বিন্যাস ব্যবস্থার অধিকারী হতে পারে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিভিন্ন উপাদান ও এগুলোর সংখ্যা, গুণ, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও গতি এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যে, প্রাণী ও উদ্ভিদরাজি সৃষ্টির ক্ষেত্র এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষ (যা এ বিশ্বের পূর্ণতম অস্তিত্ব) সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অপরদিকে যদি এ বিশ্বকে এরূপে সৃজন করা হত যে, জীবিত অস্তিত্বসমূহের সৃষ্টি ও উৎকর্ষ অসম্ভব হয়ে পড়ত, তবে তা প্রভুর প্রজ্ঞার পরিপন্থী হত।

এখন আমরা বলব ঃ মানুষ অমর আত্মার অধিকারী এবং সে এমন অনন্ত ও চিরন্তন পূর্ণতা বা কামালতের অধিকারী হতে সক্ষম যে, তা অস্তিত্বগত মর্যাদা ও মূল্যবোধের দিক থেকে বস্তুগত পূর্ণতার সাথে অতুলনীয়। যদি মানুষের জীবন কেবলমাত্র এ পার্থিব জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়, তবে তা স্রষ্টার প্রজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। বিশেষকরে তা এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, পার্থিব জীবন অপরিসীম শ্রান্তি, দুর্ভোগ ও দুর্যোগপূর্ণ এবং অধিকাংশ সময়ই দুর্ভোগ ও দুঃখ-দুর্দশা ভোগ ব্যতীত কোন কিছুর সাধ ও আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব হয় না; যেমনিকরে হিসাবী ব্যক্তিদেরকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, এ সীমাবদ্ধ সুখের বিনিময়ে এ সমস্ত কষ্ট ও ক্লেশ ভোগের মূল্যায়ন হয় না। আর এ ধরনের হিসাবের ফলেই জীবনের ব্যর্থতা ও নিরর্থকতা অনুভূত হয়। এমনকি কেউ কেউ পার্থিব জীবনের প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। প্রকৃতই যদি মানুষের জীবনে অনবরত কষ্ট ও শ্রম ব্যতীত কিছুই না থাকত এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমস্যার সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত হতে

হয়, যাতে এক মুহূর্ত আনন্দ ও সম্ভোগ পেতে পারে; অতঃপর সীমাহীন শ্রান্তিতে নিদ্রায় ঢলে পড়বে, যাতে নবোদ্যমে কর্ম সম্পাদনের জন্যে শরীর প্রস্তুত হতে পারে; আর এ ভাবে নিত্য নতুন কর্ম সম্পাদন করবে, যাতে এক চিলতে রুটি উপার্জন করতে পারে এবং কিঞ্চিৎকাল সে রুটির স্বাদ আস্বাদন করতে পারে এবং অতঃপর কিছুই না! তবে এ ধরনের ক্ষতিকর ও বিষাদময় ধারাবাহিকতাকে বুদ্ধিবৃত্তি গ্রহণ করত না বা মনোনীত করত না। এ ধরনের জীবনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল ঃ সেই গাড়ী চালকের মত, যে তার গাড়ীকে পেট্রোল পাম্পের নিকট পৌঁছাতে ও পেট্রোল ভর্তি করতে চেষ্টারত, অতঃপর এ পেট্রোল খরচ করে অন্য এক পেট্রোল পাম্পের নিকট পৌঁছাবে এবং এ প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার গাড়ীটি অক্ষম ও বিনষ্ট হবে অথবা অন্য কোন গাড়ী বা প্রতিবন্ধকের সাথে সংঘর্ষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে !

স্পষ্টতঃই এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তিগত ফল মানুষের জীবনের অন্তঃসার শুন্যতা বৈ কিছু নয়।

অপরদিকে মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা হল অমর ও চিরস্থায়ী থাকার বাসনা। যা মহান প্রভুর উদারহস্ত তার প্রকৃতিতে (فطرت) গচ্ছিত রেখেছে এবং যা সেই বর্ধিত গতিশক্তির অধিকারী, যে গতিশক্তি তাকে অনন্তের দিকে ধাবিত করে ও সর্বদা এ গতির ক্ষিপ্রতা প্রদান করে। এখন যদি মনে করা হয় যে, এ ধরনের গতির শেষফল ক্ষিপ্রতার চূড়ান্ত পর্যায়ে কোন এক প্রস্তর খণ্ডের সাথে সংঘর্ষ ঘটা ও বিধ্বস্ত হওয়া ব্যতীত কিছু নয়, তবে কি এ ধরনের বর্ধিত শক্তির অস্তিত্ব, প্রাগুক্ত ফলশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে ?

অতএব বর্ণিত সহজাত প্রবণতা একমাত্র তখনই প্রভুর প্রজ্ঞার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, যখন এ জীবন ছাড়াও মরণোত্তর অপর এক জীবন তার অপেক্ষায় থাকবে।

উপরোল্লিখিত দু'টি ভূমিকার সমন্বয়ে (অর্থাৎ প্রভুর প্রজ্ঞা এবং মানুষের জন্যে অনন্ত জীবনের সম্ভাবনা) আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, পার্থিব এ সীমাবদ্ধ জীবনের পরে, অপর এক জীবনের অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক, যাতে প্রভুর প্রজ্ঞার পরিপন্থী না হয়।

অনুরূপ অমরত্ব লাভের প্রবণতাকে অপর একটি ভূমিকারূপে গ্রহণ

করতঃ প্রভুর প্রজ্ঞার সমন্বয়ে, একে অপর একটি দলিলরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে এটাও সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষের অনন্ত জীবন অপর এমন এক নিয়মের অধীন হতে হবে। যেখানে পার্থিব জীবনের মত (সুখ-শান্তি) কষ্ট ও শ্রান্তি মিশ্রিত হবে না। নতুবা পার্থিব এ জীবনের পরিধি যদি অসীম পর্যন্তও বিস্তৃত হওয়া সম্ভব হয়, তবে তা প্রভুর প্রজ্ঞার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না।

ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক দলিল ঃ

এ পৃথিবীতে মানুষ সুকর্ম ও কুকর্ম নির্বাচন ও সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীন ঃ একদিকে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা সর্বদা আল্লাহর উপাসনায় ও তাঁর সৃষ্টির কল্যাণে নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। অপরদিকে এমন কিছু দুষ্কৃতকারী আছে, যারা তাদের শয়তানী কুপ্রবৃত্তির চাহিদা মিটাতে নিকৃষ্টতম ও জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হয়। মূলতঃ এ বিশ্বে মানুষের সৃষ্টি, একাধিক প্রবৃত্তি ও প্রবণতায় এবং ইচ্ছাশক্তি ও নির্বাচনে তাকে সুসজ্জিতকরণ, বুদ্ধিবৃত্তিক ও উদ্ধৃতিগত জ্ঞানের আলোকে তাকে সন্নিবেশিতকরণ, তার জন্যে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ এবং তাকে সত্য ও মিথ্যা বা কল্যাণ ও অকল্যাণের দ্বিধাবিভক্ত পথে স্থাপনের উদ্দেশ্য হল, তাকে অসংখ্য পরীক্ষার সম্মুখীন করা। আর এ ভাবে সে স্বীয় উৎকর্ষের পথকে নিজ ইচ্ছায় নির্বাচন করতঃ নিজ ইচ্ছাধীন কর্মের ফল বা পুরস্কার ও শাস্তি প্রাপ্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে মানুষের জন্যে সর্বদাই রয়েছে পরীক্ষা এবং পৃথিবী হল তার স্বরূপের প্রস্ফুটন ও আত্মগঠনের সময়। এমনকি (এ পার্থিব) জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সে এ পরীক্ষা ও দায়িত্ব পালন থেকে মুক্ত নয়।

কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, এ বিশ্বে সুকর্ম ও দুষ্কর্ম সম্পাদনকারী নিজ নিজ কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি ভোগ করে না। বরং দুষ্কৃতকারী অধিক বৈভবের অধিকারী ছিল এবং আছে। মূলতঃ পার্থিব জীবন অধিকাংশ কর্মেরই পুরস্কার বা শাস্তি লাভের অযোগ্য, যেমনঃ যে ব্যক্তি শতসহস্র মানুষকে হত্যা করেছে, তার উপর একাধিকবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সম্ভব নয় এবং নিঃসন্দেহে অপরসংখ্যক অত্যাচারের শাস্তি তাকে প্রদান করা সম্ভব হয়নি। অথচ

প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার [১] দাবী হল, যে কেউ ন্যূনতম পরিমাণ সুকর্ম ও কুকর্ম সম্পাদন করবে, তাকে অবশ্যই এর ফল ভোগ করতে হবে।

অতএব এ ধরিত্রী যেমন মানুষের জন্যে কর্ম ও পরীক্ষাস্থল তেমনি অপর এক জীবনেরও অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক। যেখানে সে তার কৃতকর্মের জন্যে পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করবে এবং প্রত্যেকেই তার যথোপযুক্ত প্রাপ্তি লাভ করবে। আর কেবল তখনই প্রভুর ন্যায়পরায়ণতা বাস্তব রূপ লাভ করবে।

প্রসঙ্গক্রমে উপরোক্ত আলোচনার আলোকে এটাও সুস্পষ্ট হয়েছে যে, পরকাল লক্ষ্যনির্বাচন ও কর্ম সম্পাদনের স্থান নয়। পরবর্তীতে এ প্রসঙ্গে অনেক বিষয়েরই আলোচনা আসবে।

১। প্রভুর ন্যায়পরায়ণতা বিষয়ক আলোচনায় (প্রথম খণ্ডের ২০ নং পাঠে) বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে ন্যায়পরায়ণতা হল প্রজ্ঞারই একটি দৃষ্টান্ত। এর আলোকে এ দলিলটিকেও প্রকারান্তরে প্রজ্ঞাভিত্তিক দলিলেরই একটি বলে মনে করা যেতে পারে।

পাঠ - ৫

পবিত্র কোরানে পুনরুত্থান দিবস

- ভূমিকা
- পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা অযৌক্তিক
- পুনরুত্থানের সদৃশ ঘটনাবলী
    - ক) উদ্ভিদের উদগতি
    - খ) আসহাবে কাহফের নিদ্রা
    - গ) প্রাণীদের জীবন লাভ
    - ঘ) কোন কোন মানুষের পুর্নজীবন লাভ

ভূমিকা ঃ

পুনরুত্থানের স্বপক্ষে এবং একে প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ পবিত্র কোরানের উপস্থাপিত আয়াতসমূহকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা ঃ

১। ঐ সকল আয়াত যেগুলোতে উল্লেখ করা যায় যে, মাআদ বা পুনরুত্থানের অস্বীকার করণের স্বপক্ষে কোন দলিল নেই। এ আয়াতসমূহ পুনরুত্থানের বিরুদ্ধবাদীদের নিরমস্ত্রীকরণ করে থাকে।

২। ঐ সকল আয়াত, যেগুলো পুনরুত্থানের অনুরূপ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে, যার ফলে এর অসম্ভাব্যতার ধারণা অপনোদিত হয়।

৩। ঐ সকল আয়াত, যেগুলো পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীদের ভ্রান্ত ধারণাকে বর্জন করে এবং এর সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করে।

৪। ঐ সকল আয়াত, যেগুলো পুনরুত্থানকে প্রভুর এক আবশ্যকীয় ও অনিবার্য প্রতিশ্রুতিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে পুনরুত্থানের সংঘটনকে সত্য সংবাদবাহকের সংবাদের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়ে থাকে।

৫। ঐ সকল আয়াত, যেগুলোতে পুনরথানের আবশ্যকতার স্বপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মূলত ঃ প্রথম তিন শ্রেণী হল পূনরুত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কিত এবং অবশিষ্ট দু'শ্রেণী হল এর সংঘটনের আবশ্যকীয়তা সম্পর্কিত।

পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা অযৌক্তিক ঃ

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোরানের যুক্তি প্রদর্শনের একটি পদ্ধতি হল, তাদেরকে তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের আহ্বান জানানো। যাতে প্রমাণিত হয় যে, তাদের বিশ্বাসের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই। যেমন ঃ কয়েকটি আয়াতে এসেছে ঃ

قل هاتوا برهانكم

(হে নবী) বল, তোমাদের দলিল উপস্থাপন কর। (সূরা বাক্বারা-১১১, সূরা আম্বিয়া-২৪, নামল-৬৪)

এ ধরনেরই অপর কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে এ ভাবে বলা হয়েছে যে, এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারীদের কোন বাস্তব জ্ঞান ও বিশ্বাস বা যুক্তি নেই। বরং তারা অযৌক্তিক ও অবাস্তব ধারণা ও কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। *

পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে পবিত্র কোরানের বক্তব্য ঃ

و قالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت و نحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذالك من علم ان هم الا يظنّون

> তারা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবন ব্যতীত আমাদেরকে এমন কোন জীবন নেই যে, আমরা মৃত্যুবরণ করব ও জীবিত হব এবং কাল ব্যতীত কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করে না। বস্তুতঃ এই ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো কেবলমাত্র মনগড়া কথা বলে। (জাসিয়া -২৪)

অনুরূপ অপর কিছু আয়াতে এ বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, পুনরুত্থানের অস্বীকৃতি অযৌক্তিক ও অনর্থক ধারণা বৈ কিছুই নয়।[১] তবে অযৌক্তিক ধারণাসমূহ যখন কুমন্ত্রণার অনুগামী হয়, তখন সম্ভবতঃ কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের নিকট তা সমাদৃত হয়ে থাকে[২] এবং এর ফলশ্রুতিতে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া তাদের জন্যে নিশ্চিত রূপ লাভ করে।[৩] এমনকি তখন ব্যক্তি এ ধরনের বিশ্বাসের উপর দৃঢ়তা প্রদর্শন করে।[৪]

পবিত্র কোরানে, পুনরুত্থানকে প্রত্যাখ্যানকারীদের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। এ গুলোর অধিকাংশেরই মূলবক্তব্য, পুনরুত্থানকে অসম্ভব বলে মনেকরণ ব্যতীত কিছুই নেই। কিছু কিছু আবার তাদের দূর্বল ধারণার প্রতি ইঙ্গিত করেছে, যেগুলো পুনরুত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ ও এর অসম্ভাব্যতার ধারণার উৎস[৫]। ফলে একদিকে যেমন পুনরুত্থানের সদৃশ ঘটনাসমূহকে স্মরণ করা হয়েছে, যাতে অসম্ভাব্যতার ধারণা বিদূরিত

---

* মু'মিনুন -১৭, নিসা-১৫৭, আনআম -১০০, ১১৯, ১৪৮, ক্বাহাফ-৫, হজ্ব-৩, ৮, ৭১, আনকাবুত-৮, রূম-২৯, লোকমান-২০, গাফির -৪২, যোখরুফ-২০, নাজম-২৮।

১। ক্বাসাস- ৩৯, কাহাফ-৩৬, সাদ-২৭, জাছিয়া -৩২, ইনশিক্বাক -১৪।

২। আল ক্বিয়ামাহ-৫।

৩। রূম-১০, মোতাফ্‌ফিফীন (১০-১৪)।

৪। নাহল-৩৮।

৫। যে সকল বিষয় পরস্পরের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সে সকল বিষয় ঠিক ঐবিশেষ উদাহরণগত দিক থেকেই অভিন্ন নির্দেশের অধিকারী হোক সে এ নির্দেশের সম্ভাবনা থাকুক বা না থাকুক ঃ حكم الامثال فى ما يجوز و ما لا يجوز واحد

হয়।* অপরদিকে তেমনি ভ্রান্ত ধারণাগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে, যাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে এবং পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা পরিপূর্ণরূপে প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বরং 'প্রভুর এ প্রতিশ্রুতি অবশ্যম্ভাবী' এ কথা প্রমাণের পাশাপাশি, মানুষের জন্যে চূড়ান্ত দলিল উপস্থাপনের জন্যে ওহীর মাধ্যমে পুনরুত্থানের আবশ্যকতার উপর বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী পাঠে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ।

পুনরুত্থানের সদৃশ ঘটনাবলী ঃ

ক) উদ্ভিদের উদগতিঃ মৃত্যুর পর মানুষের জীবন লাভের ঘটনা, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীতে শুষ্ক ও মৃত উদ্ভিদের উদগতির মত। ফলে মৃত্যুর পরে নিজেদের জীবন লাভের সম্ভাবনা অনুধাবনের জন্যে এ ঘটনার উপর চিন্তা করাই যথেষ্ট, যা সকল মানুষের চোখের সম্মুখে অহরহ ঘটে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাটিকে একটি স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করা এবং এর গুরুত্বকে বিস্মৃত হওয়ার যে কারণ তা হল, এ ঘটনাগুলোর পর্যবেক্ষণে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। নতুবা নতুন জীবন লাভের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের সাথে মৃত্যুর পরে মানুষের জীবনলাভের কোন পার্থক্য নেই।

পবিত্র কোরানে এ নিত্য ঘটমান ঘটনাটির পর্যবেক্ষণের জন্যে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ও মানুষের পুনরুত্থানকে এর সাথে তুলনা করা হয়েছে।[১] যেমন বলা হয়েছে ঃ

فانظر الى ءاثار رحمت الله كيف يحيى الارض بعد موتها انّ ذلك لمحيى الموتى و هو على كلّ شيء قدير

আল্লাহর অনুগ্রহের ফলশ্রুতি সম্পর্কে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর এটাকে পূনর্জীবিত করেন; এ ভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি

---

* হূদ-৭, ইসরা-৫১, সাফ্‌ফাত-১৬,৫৩, দুখান-(৩৪-৩৬), আহক্বাফ-১৮, ওয়াক্বিয়াহ (৪৭-৪৮), ক্বাফ-৩, মুতাফফিফীন (১২-১৩), নাযিয়াত (১০-১১)।

১। আ'রাফ-৫৭, হাজ্জ-(৫-৬), রূম-১৯, ফাতির -৯, ফসসিলাত-১৯, যুখরূফ -১১, ক্বাফ-১১।

সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (রূম-৫০)

খ) আসহাবে কাহফের নিদ্রা ঃ পবিত্র কোরান অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয়সমলিত আসহাবে কাহ্ফের বিস্ময়কর কাহীনী বর্ণনা করার পর বলে ঃ

وكذالك اعثرنا عليهم ليعلموا انّ وعد الله حقّ وانّ السّاعة لا ريب فيها

এবং এভাবে আমি মানুষকে তাদের (আসহাবে কাহ্ফ) বিষয় জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং ক্বিয়ামত যে সংঘটিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। (কাহ্ফ-২১)

এ ধরনের বিস্ময়কর সংবাদ যে, মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি কয়েকশতাব্দী (তিনশত সৌর বর্ষ বা তিনশত চন্দ্র বর্ষ) ধরে নিদ্রিত ছিলেন; অতঃপর জাগ্রত হয়েছেন, নিঃসন্দেহে তা পুনরুত্থানের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও এর অসম্ভাব্যতাকে দূরীভূত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। কারণ প্রতিটি নিদ্রায়ই মৃত্যুসম (নিদ্রা মৃত্যুর ভাই) প্রতিটি জাগরনই মৃত্যু পরবর্তী জীবন সমতুল্য হলেও সাধারণ নিদ্রায় শরীরের জৈবিক (Biologic) প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই অব্যাহত থাকে; ফলে রূহের প্রত্যাবর্তন কোন আকস্মিক ঘটনা বলে মনে হয় না। কিন্তু যে শরীর তিনশত বছর ধরে কোন প্রকার খাদ্যোপাদান গ্রহণ করেনি প্রকৃতির প্রচলিত নিয়মানুসারে সে শরীর মৃত্যু বরণ করতঃ বিনষ্ট হতে বাধ্য এবং রূহের প্রত্যাবর্তনের জন্যে স্বীয় যোগ্যতা ও প্রস্তুতি হারাতে বাধ্য। অতএব এ ধরনের অলৌকিক ঘটনাই এ স্বাভাবিক নিয়মের উর্ধ্বে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম। ফলে মানুষ অনুধাবন করতে পারবে যে, দেহে রূহের প্রত্যাবর্তন সর্বদা এ সাধারণ ও প্রাকৃতিক নিয়মাধীন কারণ ও শর্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

অতএব মানুষের নব জীবনও যতই এ পৃথিবীর জীবন-মৃত্যুর ব্যতিক্রম হোক না কেন, তা কোন ভাবেই পরিত্যাজ্য নয়। বরং প্রভুর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তা সংঘটিত হবেই।

গ) প্রাণীদের জীবন লাভ ঃ পবিত্র কোরানে একইভাবে কয়েকটি প্রাণীর অসাধারণ ভাবে জীবন লাভের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমে কয়েকটি পাখীর জীবন লাভ* এবং কোন এক

---

* বাক্বারা-২৬০।

নবীকে বহনকারী পশুর কাহিনী, (যার সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হবে) ইত্যাদির কথা উল্লেখযোগ্য। অতএব কোন প্রাণীর জীবিত হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে মানুষের পক্ষেও জীবিত হওয়া অসম্ভব নয়।

ঘ) এ পৃথিবীতেই কোন কোন মানুষের পুনর্জীবন লাভ ঃ এ প্রসঙ্গে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, এ পৃথিবীতেই কোন কোন মানুষের পুনর্জীবন লাভ করা। পবিত্র কোরানে এ ধরনের কিছু উদাহরণ উল্লেখ হয়েছে। যেমন ঃ বনী ইসরাঈলের একজন নবীর ঘটনা যে, তার যাত্রাপথে কিছু মৃত মানুষের গলিত লাশ তার চোখে পড়ে। হঠাৎ তার ধারণা হল যে, কিরূপে এ মানুষগুলো পুনরায় জীবিত হবে। মহান আল্লাহ তার আত্মা ফিরিয়ে নিলেন এবং একশত বছর পর তাকে জীবিত করলেন। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ স্থানে তুমি কত সময় যাবৎ অবস্থান করছো ? তিনি যেন নিদ্রা থেকে জেগে উঠে ছিলেন ও বললেন ঃ একদিন অথবা একদিনের কোন এক অংশ। প্রতি উত্তরে বলা হল ঃ বরং তুমি একশত বছর এখানে অবস্থান করছো। অতএব লক্ষ্য কর একদিকে তোমার রুটি ও পানি সঠিকভাবে রক্ষিত, অপরদিকে তোমাকে বহনকারী পশু পঁচে গলে গিয়েছে! এখন দেখ যে, আমরা কিরূপে এ পশুর হাড়গুলোকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করছি; পুনরায় এগুলোকে মাংস দ্বারা আবৃত করছি এবং একে জীবিত করছি।[১]

অপর একটি কাহিনী হল এই যে, বনী ইসরাঈলের একদল লোক হযরত মূসাকে (আঃ) বললঃ আমরা খোদাকে প্রকাশ্যে না দর্শন করা ব্যতীত কখনোই বিশ্বাস স্থাপন করব না। ফলে মহান আল্লাহ তাদেরকে বজ্রপাত দ্বারা ধ্বংস করলেন। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুরোধে পুনরায় তাদেরকে জীবন দিলেন।[২]

অনুরূপ বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির (যে মূসা (আঃ)-এর সময় নিহত হয়েছিল) একটি জবাইকৃত গরুর দেহের কোন এক অংশের আঘাতে জীবিত হওয়ার কাহিনী উল্লেখযোগ্য, যা সূরা বাক্বারায় বর্ণিত হয়েছে এবং এর উপর ভিত্তি করেই সূরা বাক্বারার নামকরণ করা হয়েছে। এ কাহিনীর বর্ণনায় বর্ণিত

১। বাক্বারা-২৫৯।
২। বাক্বারা-(৫৫-৫৬)।

হয়েছে ঃ

كذلك يحى الله الموتى و يريكم اياته لعلكم تعقلون

এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁর নিদর্শন তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার। (বাক্বারা-৭৩)

এছাড়া ঈসা (আঃ)[১] এর মু'জিযাহর ফলে কিছু মৃত ব্যক্তির জীবিত হওয়ার ঘটনাকেও পুনরুত্থানের সম্ভাবনার নিদর্শন বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

১। আল ইমরান -৪৭ , মায়িদাহ- ১১০

পাঠ – ৬

পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকারকারীদের প্রশ্নের জবাব

- বিলুপ্তির অস্তিত্ব লাভের ক্ষেত্রে অনুপপত্তি
- নবজীবন লাভে দেহের অযোগ্যতা বিষয়ক অনুপপত্তি
- কর্তার ক্ষমতা সম্পর্কিত অনুপপত্তি
- কর্তার জ্ঞান সম্পর্কিত অনুপপত্তি

পবিত্র কোরান পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যে যুক্তি উপস্থাপন করেছে এবং যে ভাষায় তাদেরকে জবাব দিয়েছে, তা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের অন্তরে কিছু সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। জবাবের উপর ভিত্তি করে ঐগুলোকে আমরা নিম্নরূপে উল্লেখ করব। যথা ঃ

১। বিলুপ্তির অস্তিত্ব লাভের ক্ষেত্রে অনুপপত্তি ঃ

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, যারা বলত ঃ "মানুষ তার দেহের বিগলনের পর পুনরায় কিরূপে জীবিত হতে সক্ষম?" তাদের মোকাবিলায় পবিত্র কোরান যে জবাব দেয়, তার বিষয়বস্তু হল ঃ তোমাদের স্বরূপের ভিত্তি হল তোমাদের রূহ, তোমাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়, যেগুলো ভূপৃষ্ঠে বিচ্ছিন্ন ও ছড়িয়ে পড়ে।[১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা উদঘাটন করতে পারি যে, কাফেরদের এ অস্বীকৃতির উৎস হল তা, যা দর্শনের পরিভাষায় "বিলুপ্তের প্রত্যাবর্তন অসম্ভব" বলে পরিচিত। অর্থাৎ তারা দাবী করত যে, (রক্ত-মাংসে গড়া) এ দেহই হল মানুষ, যা মৃত্যুর মাধ্যমে ছিন্নভিন্ন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং যদি নতুন করে জীবতও হয় তবে সে হবে অন্য এক মানুষ। কারণ যে অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছে, তাকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব এবং সত্তাগতভাবে তা সম্ভব নয়।

এ অনুপপত্তির জবাব ঃ কোরানের উপরোল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক মানুষেরই স্বরূপ তার আত্মা বা রূহের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ পুনরুত্থানের অর্থ বিলুপ্তের প্রত্যাবর্তন নয়; বরং অস্তিত্বশীল রূহের প্রত্যাবর্তন।

২। নবজীবন লাভে দেহের অযোগ্যতা সম্পর্কিত অনুপপত্তি ঃ

পুর্ববর্তী অনুপপত্তিটি ছিল পুনরুত্থানের সত্তাগত সম্ভাবনা ভিত্তিক। আর এ অনুপপত্তিটি প্রাগুক্ত সম্ভাবনাকে স্বীকার করে। অর্থাৎ বলে যে, যদিও দেহে

১। সেজদা-(১০-১১)।

রূহের প্রত্যাবর্তন বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অসম্ভব নয় এবং তা কল্পনা করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিরোধ নেই; কিন্তু তা সংঘটনের ব্যাপারটি দেহের যোগ্যতার শর্তাধীন এবং আমরা দেখতে পাই যে, জীবনের অস্তিত্বলাভ, বিভিন্ন কারণ ও শর্তের সাথে সম্পর্ক যুক্ত যেগুলো সংগত কারণেই পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়। যেমন ঃ শুক্রাণুর জরায়ুতে অবস্থান গ্রহণ করা, এর বিকাশের জন্যে উপযুক্ত অবস্থার সমাহার, যাতে উত্তর উত্তর পূর্ণ ভ্রূণে পরিণত হয়ে পূর্ণ মানুষের রূপ লাভ করে। কিন্তু যে দেহ ছিন্ন-ভিন্ন ও ছড়িয়ে পড়েছে সে দেহের আর জীবন লাভের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা থাকে না।

এর জবাব হল ঃ এ দৃষ্ট পার্থিব নিয়মই, কেবলমাত্র সম্ভব নিয়ম নয় এবং অভিজ্ঞতার আলোকে যে সকল কারণ শনাক্ত করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যেই সকল কারণ সীমাবদ্ধ নয়। যার প্রমাণ এই যে, এ পৃথিবীতেই প্রাণী ও মানুষের জীবন লাভ সম্পর্কিত অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল।

এ জবাবটিকে আমরা পবিত্র কোরানে বর্ণিত এ ধরনের অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা থেকে পেতে পারি।

৩। কর্তার ক্ষমতা সম্পর্কিত অনুপপত্তি ঃ

অপর একটি অনুপপত্তি হল ঃ কোন ঘটনার সংঘটনে সত্তাগত সম্ভাবনা ছাড়াও কর্তার যোগ্যতাকেও বিবেচনা করতে হবে। সুতরাং কোথা থেকে আমরা জানতে পারব যে, মহান আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন ?

এ ভিত্তিহীন ও উদ্ভট প্রশ্নটি তাদের পক্ষ থেকেই এসেছিল যারা মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে অনুধাবন করতে পারেননি। এর জবাব হল ঃ আল্লাহর ক্ষমতার কোন সীমা বা গণ্ডি নেই এবং তার ক্ষমতা সকল সম্ভাব্য ঘটনাকেই সমন্বিত করে। যেমন ঃ কোন এক সময় অস্তিত্বহীন এ বিশ্বকে এ সমস্ত মহান কল্যাণের সমাহারে সৃষ্টি করেছেন।

اولم يروا انّ الله الّذى خلق السّموات والارض و لم يعى بخلقهنّ بقادر
على ان يحيى الموتى بلى انّه على كلّ شيء قدير

তারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন

এবং এ সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। বস্তুতঃ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (আহক্বাফ-৩৩)[২]

তাছাড়া নতুন করে সৃষ্টি করা , প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে জটিলতর নয় এবং এর জন্যে অধিকতর শক্তি ও ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। বরং বলা যেতে পারে অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ তাতো বিদ্যমান রূহের প্রত্যাবর্তন বৈ কিছুই নয়।

فسيقولون من يعيدنا قل الّذى فطركم اوّل مرّة فسينغضون اليك رؤوسهم

তারা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে? বল, তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তারা তোমার সম্মুখে মাথা নাড়াবে (এবং এ উত্তরে তারা বিস্মিত হবে)। (ইসরা-৫১) [৩]

وهو الّذى يبدؤا الخلق ثمّ يعيده و هو اهون عليه

তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনিই এটাকে সৃষ্টি করবেন পুর্নবার এবং ইহা তাঁর জন্যে অতি সহজ। (রূম-২৭)

৪। কর্তার জ্ঞান সম্পর্কিত অনুপপত্তি ঃ

অপর একটি প্রশ্ন হল এই যে, যদি মহান আল্লাহ মানুষকে জীবন দিতে এবং তাদের কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন তবে একদিকে যেমন তাকে অসংখ্য দেহসমষ্টির প্রত্যেকটি থেকে স্বতন্ত্ররূপে শনাক্ত করতে হবে, যাতে প্রতিটি আত্মাকে এর নিজস্ব দেহে প্রত্যাবর্তন করাতে পারেন; অপরদিকে তেমনি সকল ভাল ও মন্দ কর্মের হিসাব তার স্মরণে থাকতে হবে, যাতে নির্দিষ্ট কর্মের জন্যে নির্দিষ্ট পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করতে পারেন। তাহলে যে সকল দেহ মৃত্তিকায় পরিণত হয়েছে এবং যেগুলোর অনুসমূহ পরস্পর বিগলিত হয়েছে সেগুলোকে কিরূপে পুনঃশনাক্তকরণ সম্ভব ? আর কিরূপেই বা শত-সহস্র, এমনকি লক্ষ-কোটি বছর ধরে সকল মানুষের আচার-আচরণকে সুচারুরূপে ধারণ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব ?

২। এছাড়াও ঃ সূরা ইয়াসীন-৮১, ইসরা-৯৯, আসসাফফাত -১১, আন্নাযিয়াত-২৭, দ্রষ্টব্য।
৩। অনুরূপ আনকাবুত (১৯-২০), ক্বাফ-১৫, ওয়াক্বিয়াহ-৬২, ইয়াসীন-৮০, হাজ্জ-৫, আল-ক্বিয়াম- ৪০, আত্তারিক্ব-৮।

এ প্রশ্নটিও তাদের পক্ষ থেকেই বর্ণনা করা হয়েছে, যারা প্রভুর অসীম জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারেনি এবং একে তাদের নিজেদের সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণ জ্ঞানের সাথে তুলনা করেছেন। আর এর জবাব হল ঃ মহান আল্লাহর জ্ঞানের কোন সীমা নেই এবং সব কিছুই তাঁর জ্ঞানের অধীন। আর মহান আল্লাহ কখনোই কোন কিছুকে বিস্মৃত হন না।

পবিত্র কোরানে ফেরাউনের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, সে মুসাকে (আঃ) বলেছিল ঃ

فما بال القرون الاولى

তা'হলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী হবে? (যদি মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে জীবিত করে থাকবেন ও আমাদের হিসাব নিয়ে থাকবেন) (তোহা-৫১)

হযরত ঃ মুসা (আঃ) বললেন ঃ

قال علمها عند ربّى في كتاب لايضلّ ربّى و لا ينسى

বললেন ঃ এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট লিপিবদ্ধ আছে, আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। (তোহা-৫২)

অপর একটি আয়াতে শেষোক্ত দু'টি অনুপপত্তির জবাব এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قل يحييها الّذى انشأها اوّل مرّة وهو بكلّ خلق عليم

বল, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। (ইয়াসীন-৭৯)

পাঠ - ৭

ক্বিয়ামত সম্পর্কে প্রভুর প্রতিশ্রুতি

- ভূমিকা
- প্রভুর অনিবার্য প্রতিশ্রুতি
- বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের প্রতি ইঙ্গিত

ভূমিকা ঃ

পবিত্র কোরান একদিকে পুনরুত্থান সম্পর্কে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের নিকট সংবাদরূপে যা প্রেরিত হয়েছে তার উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং একে প্রভুর নিশ্চিত ও অলংঘনীয় প্রতিশ্রুতি বলে গণনা করেছে। আর পবিত্র কোরান এভাবে মানুষের জন্যে চূড়ান্ত দলিল সম্পন্ন করে থাকে। অপরদিকে পুনরুত্থানের আবশ্যকতার উপর বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি প্রদর্শন করে, যাতে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচিতির পক্ষে মানুষের আকাংখা পূর্ণ হয় এবং দলিল শক্তিশালী হয়।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে পুনরুত্থানের প্রমাণের ক্ষেত্রে কোরানের বক্তব্যকে আমরা দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করব এবং প্রতিটি শ্রেণীর জন্যে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ থেকে উদাহরণ তুলে ধরব।

প্রভুর অনিবার্য প্রতিশ্রুতি ঃ

পবিত্র কোরান, ক্বিয়ামতের সংঘটন ও পরকালে সকল মানুষের পূনর্জীবন লাভের ঘটনাকে একটি সুনিশ্চিত ঘটনা বলে উপস্থাপন করেছে ঃ

ان السّاعة لاتية لا ريب فيها

কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। (সূরা গাফির - ৫৯) [১]

এ ছাড়া কোরান ক্বিয়ামতকে সত্য ও অলংঘনীয় প্রতিশ্রুতি বলে বর্ণনা করেছে

بلى وعدا عليه حقا

হ্যাঁ (প্রভুর) প্রতিশ্রুতি এ ব্যাপারে সত্য (নাহল -৩৮)। [২]

১। এছাড়াও দেখুন ঃ আল ইমরান-৯, ২৫, নিসা-৮৭, আনআম-১২, কাহাফ-২১, হাজ্জ-৭, শূরা-৭, জাছিয়া-২৬, ৩২।

২। এছাড়াও দেখুন ঃ আল ইমরান-৯, ১৯১, নিসা-১২২, ইউনুস-৪, ৫৫, কাহাফ-২১, আম্বিয়া-১০৩, ফুরকান-১৬, লুকমান-৯, ৩৩, ফাতির-৫, যুমার-২০, নাজম-৪৭, জাছিয়া-৩২, আহক্বাফ-১৭, দ্রষ্টব্য।

মহান আল্লাহ একাধিকবার কিয়ামত সংঘটনের ব্যাপারে শপথ ঘোষনা করেছেন। যেমন ঃ

قل بلى و ربّى لتبعثنّ ثمّ لتنبّؤنّ بما عملتم وذلك على الله يسير

বল, নিশ্চয়ই (পুনরুত্থিত) হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হইবে। অতঃপর তোমরা যা করতে সে সমন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে এবং তা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (সূরা তাগাবুন-৭)[১]

পবিত্র কোরানে পুনরুত্থানের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করাকে নবীগণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে গণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

يلقى الرّوح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق

তিনি তাঁর বান্দাদিগের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ, যাতে সে সতর্ক করতে পারে ক্বিয়ামত দিবস সম্পর্কে। (গাফির-১৫)[২]

এছাড়া পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীদের জন্যে অনন্ত শাস্তি ও নরক যন্ত্রণার কথা উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে ঃ

واعتدنا لمن كذب بالسّاعة سعيرا

এবং যারা ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে আমি প্রস্তুত রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নি। (ফুরকান-১১)[৩]

অতএব যে কেউ এ ঐশী গ্রন্থের সত্যতা সম্পর্কে জানতে পারবে, পুনরুত্থান সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও একে অস্বীকার করার মত কোন অজুহাতই তার থাকবে না। এছাড়া পূর্ববর্তী পাঠে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, কোরানের সত্যতা সকল সত্যানুসন্ধিৎসু ও ন্যায়পন্থী মানুষের জন্যে অনুধাবনযোগ্য। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে কারও নিকটই ক্বিয়ামতকে অগ্রাহ্য করার অজুহাত নেই -তবে তারা ব্যতীত, যাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের স্বল্পতা আছে অথবা অন্য কোন কারণে কোরানের সত্যতাকে উপলব্ধি করতে অপারগ।

১। অনুরূপ দেখুন ঃ ইউনূস-৫৩, সাবা-৩, দ্রষ্টব্য।
২। আনআম-১৩০, ১৫৪, রা'দ-২, শূরা-৭, যুখরুফ-৬১, যুমার-৭১, দৃষ্টব্য।
৩। ইসরা-১০, সাবা-৮, মু'মিনুন-৭৪, দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের প্রতি ইঙ্গিত ঃ

কোরানের অনেক আয়াতই পুনরুত্থানের প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে। এ সকল আয়াতকে প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরায়ণতা ভিত্তিক দলিলসমূহের প্রতীক বলা যেতে পারে। যেমন ঃ তিরস্কারমূলক প্রশ্নাকারে বলে ঃ

افحسبتم انّماخلقناكم عبثاً و انّكم الينا لا ترجعونَ

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না ? (সূরা মু'মিনুন-১১৫)।

উল্লিখিত আয়াতটি সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, যদি পুনরুত্থান ও আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারটি না থাকত, তবে এ বিশ্বে মানুষের সৃষ্টিই অনর্থক হয়ে যেত। কিন্তু প্রজ্ঞাময় প্রভু অনর্থক কর্ম সম্পাদন করেন না। অতএব নিজের দিকে প্রত্যাবর্তন করানোর জন্যে তিনি অপর এক জগতের ব্যবস্থা করবেন।

এ দলিলটি হল, একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি ব্যবস্থা। এর প্রথম ভূমিকাটি (যা একটি শর্তযুক্ত যুক্তিবাক্য) এ যুক্তি উপস্থাপন করে যে, এ বিশ্বে মানুষের সৃষ্টি তখনই প্রজ্ঞাময় উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট হবে যখন মানুষ এ পার্থিব জীবনের পর, মহান প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং পরকালে স্বীয় কর্মফল ভোগ করবে। আমরা এ অনিবার্য বিষয়টিকে প্রজ্ঞাগত দলিলের বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করেছিলাম। ফলে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

আর দ্বিতীয় ভূমিকাটি (মহান আল্লাহ অনর্থক কর্ম সম্পাদন করেন না) হল, প্রভুর প্রজ্ঞা এবং তার কর্ম অনর্থক না হওয়া, যা খোদাপরিচিতি অধ্যায়ে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া তা প্রজ্ঞাগত দলিলের বর্ণনায়ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতএব উল্লিখিত আয়াতটি সম্পুর্ণরূপে বর্ণিত দলিলের উপর সমাপতনযোগ্য।

এখন মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এ পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছিল, এর আলোকে বলা যায়, যদি এ বিশ্বে মানুষের অনর্থক সৃষ্টি প্রজ্ঞাবিরোধী কর্ম হয়, তবে পৃথিবীর সৃষ্টিও হবে অনর্থক ও অহেতুক। এ বিষয়টিকে আমরা সে আয়াত থেকে অনুধাবন করতে পারি, যাতে পরকালের অস্তিত্বকে এ বিশ্ব সৃষ্টির প্রজ্ঞাপূর্ণ

দাবী বলে মনে করা হয়েছে । যেমন ঃ জ্ঞানীগনের (اولوالالباب) বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ পূর্বক বলা হয় ঃ

......و يتفكرونَ في خلق السموات و الارض ربّنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النّار

... ... এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে (এবং বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করনি, (নিরর্থক কর্ম সম্পাদন থেকে) তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি হতে রক্ষা কর। (সুরা আল ইমরান -১৯১)

এ আয়াত থেকে আমরা আরও বুঝতে পারি যে, বিশ্বের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তাকরণ মানুষকে প্রভুর প্রজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত করে। অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান প্রভু তাঁর এ মহান সৃষ্টির পশ্চাতে এক প্রজ্ঞাপূর্ণ উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করেছেন এবং একে অহেতুক ও বৃথা সৃষ্টি করেননি। যদি অন্য এমন কোন জগতের অস্তিত্ব না থাকে, যা বিশ্বসৃষ্টির চুড়ান্ত উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হবে, তবে স্রষ্টার সৃষ্টি বৃথা ও নিরর্থক হয়ে পড়বে।

পুনরুত্থানের আবশ্যকতার স্বপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের ইঙ্গিতবহ, অপর এক শ্রেণীর আয়াতকে, ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক দলিল বলে গণনা করা যেতে পারে।[১] অর্থাৎ প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার দাবী হল, সৎকর্মকারী ও দুষ্কৃতকারীদেরকে তাদের কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করা এবং তাদের পরকালীন জীবনকে পৃথক করা। আর যেহেতু এবিশ্বে এ ধরনের কোন পার্থক্য বিরাজ করে না, সেহেতু ন্যায়পরায়ণ প্রভুর জন্যে অপর এক জগৎ সৃষ্টিকরণ আবশ্যক, যাতে স্বীয় ন্যায়পরায়ণতাকে বাস্তবায়িত করতে পারেন। যেমন ঃ

ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين ءامنوا و عملوا الصالحات سواءً محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون

দুষ্কৃতকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়া উহাদিগকে তাহাদিগের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে ? উহাদিগের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! (এবং যেমনিকরে পার্থিব আনন্দ-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট ও নিয়ামতের অংশীদার, মৃত্যুর পরও তেমনি তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না ?) (জাসিয়াহ - ২১)

১। সুরা সাদ -২৮, গাফির -৫৮, কালাম - ৩৫, ইউনুস - ৪।

وخلق الله السموات والارض بالحق و لتجزى كل نفس بما كسبت و هم لا يظلمون

আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে, আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (জাছিয়া -২২)

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, و خلق الله السموات والارض بالحق (অর্থাৎ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে) এ বাক্যটিকে প্রজ্ঞাভিত্তিক দলিলের ইঙ্গিতবহ বলে গণনা করা যেতে পারে; যেমনিকরে ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক দলিলকে মুলতঃ প্রজ্ঞাভিত্তিক দলিলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কারণ যেমনটি আমরা প্রভুর ন্যায়পরায়ণতা শীর্ষক আলোচনায় ব্যাখ্যা করেছিলাম যে , ন্যায়পরায়ণতা (عدل) হল প্রজ্ঞারই (حكمت) একটি দৃষ্টান্ত।

পাঠ – ৮

পরকালীন জগতের বিশেষত্বসমূহ

- ভূমিকা
- বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরজগতের বিশেষত্বসমূহ

ভূমিকা ঃ

যে সকল বিষয় সম্পর্কে মানুষের কোন অভিজ্ঞতা নেই অথবা যেগুলোকে অন্তর্দৃষ্টিগত ও প্রত্যক্ষ সচেতন জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধি করেনি কিংবা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেও অনুভব করতে পারেনি, তবে সে সকল বিষয় সম্পর্কে মানুষ পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারেনা। ফলে এ বিষয়টির আলোকে আমাদের মনে রাখতে হবে, পরকালীন জীবনের স্বরূপ ও ঘটনাপ্রবাহসমূহকে সঠিকরূপে অনুধাবন করতে পারব –এটা আশা করা অনুচিত। বরং বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে অথবা ওহীর মাধ্যমে পরকালের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যতটুকু জানতে পারি, তাতেই তুষ্ট থাকব এবং ততোধিক ভাবনা থেকে বিরত থাকব।

পরিতাপের বিষয় হল, একদিকে একদল লোক পরজগৎকে ইহজগতের মত বলে প্রচার করার চেষ্টা করছেন এবং এমনকি তাদের কল্পনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা বলেন ঃ পরকালীন বেহেশ্‌ত আকাশেরই এক বা একাধিক স্তরে ইহজগতেই বিদ্যমান। আর একদা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষ সেখায় অবস্থান গ্রহণ করবে এবং অনাক্লিষ্ট ও পরিতৃপ্ত জীবনের অধিকারী হবে।

অপরদিকে অপর একদল, পরকালের বাস্তবতাকেই অস্বীকার করেছেন এবং চিরন্তন বেহেশতকে চারিত্রিক মূল্যবোধ বলেই মনে করেছেন, যা সমাজের বিভিন্ন মুক্তমনা ও সেবক মানুষের কামনা হয়ে থাকে। এছাড়া এ ধরনের লোকেরা ইহ ও পরকালের পার্থক্যকে লাভ ও মূল্যমানের পার্থক্যের মত মনে করেছেন।

প্রাগুক্ত প্রথম দলের কাছে প্রশ্ন করার অবকাশ থাকে ঃ যদি চিরন্তন বেহেশ্‌ত অপর এক গ্রহে থেকে থাকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেখানে যাবে এ কথা সঠিক হয়ে থাকে, তবে তুনরুত্থান দিবসে যে সকল মানুষকে জীবিত করা হবে, যা পবিত্র কোরানে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে, তার অর্থ কী?

অনুরূপ দ্বিতীয় দলের কাছেও প্রশ্ন থাকতে পারে ঃ যদি বেহেশ্‌ত কেবলমাত্র চারিত্রিক মূল্যবোধ ব্যতীত কিছুই না হয়ে থাকে এবং স্বভাবতঃই দোযখও যদি কেবলমাত্র মূল্যবোধ বিরোধী বৈ কিছুই না হয়ে থাকে, তবে

পুনরুত্থান ও পুনর্জীবন লাভের বিষয়টি প্রমাণ করার জন্যে কোরানের এত পীড়াপীড়ি কেন? এটাই কি ভাল ছিল না যে, আল্লাহর বাণীবাহকগণ এ অর্থটিকেই সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করতেন, যাতে অতসব বিরোধিতা, উন্মাদাখ্যা ও প্রলাপবকা ইত্যাদি অপবাদে ভূষিত না হন ?

যা হোক এ সকল অনর্থক বাক্যাল্যাপের যবনিকা টেনে শারীরিক ও আত্মিক পুনরুত্থানের বিষয়ে দার্শনিক ও কালামবিদদের মধ্যে যে বিরোধ ও মতপার্থক্য বিদ্যামান সে গুলোতে মনোনিবেশ করব। এছাড়া ঐ সকল বিষয় সম্পর্কেও আলোচনা করব যে, এ বস্তুজগৎ কি সম্পর্ণরূপে বিনাশিত হবে, না কি হবে না ? এবং পরকালীন দেহ কি পুরোপুরি এ পার্থিব দেহই, না এর মত হবে ? ইত্যাদি।

সত্য উদঘাটন অথবা বাস্তবতার নিকটবর্তী হওয়ার জন্যে এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক প্রচেষ্টা যতই প্রশংসাযোগ্য কিংবা এর ছায়ায় চিন্তাগত দূর্বল ও শক্তিশালী দিকগুলো যতই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হোক না কেন, এটা আশা করা কখনোই উচিৎ নয় যে, এ সকল আলোচনার মাধ্যমে পরকালীন জীবন যেমন আছে ঠিক তেমনটিই অনুধাবণ করতে পারব।

প্রকৃতপক্ষে অদ্যাবধি এ পৃথিবীর বাস্তবতাসমূহও কি সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা গিয়েছে? পদার্থবিদ, রসায়নবিদ ও জীববিজ্ঞানী এবং অন্যান্য মনীষীগণ কি বস্তু, শক্তি ও অন্যান্য শক্তি বৈচিত্রের স্বরূপ উদঘাটনে সক্ষম হয়েছেন ? তারা কি বিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত ধারণা দিতে সক্ষম ? তারা কি জানেন, যদি এ বিশ্বব্রম্মাণ্ড থেকে মহাকর্ষশক্তির অপসারণ করা হয় অথবা ইলেকট্রনের গতিকে স্তব্ধ করা হয়, তবে কি ঘটনা ঘটতে পারে ? কিংবা এ ধরনের ঘটনা ঘটবে কি না ?

দার্শনিকগণও কি এ বিশ্বের সকল বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়সমূহকে নিশ্চিতরূপে সমাধান করতে ? বস্তুসমূহ (اجسام), প্রকারান্ত গঠনসমূহ (صور نوعيه) এবং আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ইত্যাদির মত বিষয়সমূহের বাস্তবতাকে উদঘাটনের জন্যে অধিকতর গবেষণার প্রয়োজন নয় কি? (নিশ্চয়ই)

তবে কিরূপে আমরা নিজেদের এ সকল সীমাবদ্ধ ও স্বল্প জ্ঞান ও চিন্তার মাধ্যমে এমন এক জগতের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করব, যার সম্পর্কে

আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই ?

তবে মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতার অর্থ এ নয় যে, মানুষ কোন কিছুকেই কোন ভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম নয় কিংবা বাস্তব অস্তিত্বকে অপেক্ষাকৃত ভাল ভাবে অনুধাবন করার জন্যে চেষ্টা করা অনুচিত। নিঃসন্দেহে আমরা প্রভু প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে অধিকাংশ বাস্তবতাকেই উপলব্ধি করতে সক্ষম। অনুরূপ সক্ষম ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকৃতির অনেক রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতে। তবে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারের সমৃদ্ধি ঘটাতে, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রচেষ্টার পথে চলার পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তির শক্তি সীমা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পারঙ্গমতা সম্পর্কে আমাদের জানা থাকতে হবে। আর তাই অনর্থক উচ্চাভিলাষ থেকে নিজেদেরকে সংযত করব এবং স্বীকার করে নিব যে,

وما اوتيتم من العلم الا قليلا

তোমাদিগের নিকট জ্ঞানের ক্ষুদ্রাংশ ব্যতীত কিছুই আসে নাই।(ইসরা -৮৫)

হ্যাঁ জ্ঞানীরূপ বাস্তবদর্শিতা, প্রজ্ঞাধিকারীরূপ বিনতী ও দায়িত্বশীলরূপ ধর্মীয় সংযমের দাবী হল এই যে, ক্বিয়ামত ও অদৃশ্যজগৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত মতবাদ ব্যক্তকরণ কিংবা অযৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান থেকে সংযত থাকব। তবে যতটুকু বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি এবং কোরানের সুস্পষ্ট দলিল অনুমতি দেয়, ঠিক ততটুকু ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হব ।

যা হোক প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্যে যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, তার সত্যতাকে স্বীকার করাই যথেষ্ট, যদিও ঐগুলোর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নির্ধারিতরূপে জানতে অথবা ঐগুলোর ব্যাখ্যা দিতে অপারগ। বিশেষকরে ঐ সকল বিষয় যেগুলো আমাদের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবৃত্তির নাগালের বাইরে এবং আমাদের জ্ঞান ঐগুলোতে পৌঁছতে অপারগ।

এখন আমরা চেষ্টা করে দেখব, বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে পরজগতের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব এবং ইহজগতের সাথে এর পার্থক্য সম্পর্কে কতটুকু ধারণা লাভ করতে পারি।

বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরজগতের বিশেষত্বসমূহ ঃ

পুনরুত্থানের আবশ্যকতার স্বপক্ষে উপস্থাপিত দলিলের উপর চিন্তা করলেই পরজগতের বিশেষত্বসমূহ খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য ।

১। পরজগতের প্রথম বিশেষত্ব যা প্রথম দলিল থেকে অর্জিত হয় তা হল ঃ পরজগৎ চিরন্তন ও অনন্ত হতে হবে। কারণ ঐ দলিলে চিরন্তন জীবনের সম্ভাবনা ও এ ধরনের জীবনের উপর মানুষের ফিত্‌রাতগত চাহিদার গুরুত্ব এবং এর সংঘটন প্রভুর প্রজ্ঞার দাবী বলে পরিগণিত হয়েছে।

২। অপর যে বিশেষত্ব, যা উভয় দলিল থেকে অর্জিত হয় এবং যা প্রথম দলিলের অন্তরালে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হল ঃ পরজগতের নিয়ম-শৃংখলা এমন হতে হবে যেন, ঐ সকল ব্যক্তিই নির্মল অনুগ্রহ এবং কষ্টক্লেশমুক্ত বৈভবের অধিকারী হতে পারেন যারা চরম মানবীয় উৎকর্ষে পৌঁছতে পেরেছেন এবং কোন প্রকার পাপাচার ও বিচ্যুতিতে লিপ্ত হননি, যা ইহজগতের ব্যতিক্রম। ইহজগতে এ ধরনের কোন নিরংকুশ সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। বরং পার্থিব সৌভাগ্য হল, আপেক্ষিক ও কষ্টক্লেশ মিশ্রিত।

৩। তৃতীয় বিশেষত্ব হল ঃ কর্মফল লাভের জন্যে পরজগতের কমপক্ষে অনুগ্রহ ও শাস্তি, এ দু'টি বিভাগ থাকতে হবে, যাতে সুকীর্তিকারী ও দুষ্কৃতিকারীরা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মফল লাভে সক্ষম হয়। আর এ দু'টি বিভাগ ঠিক তা-ই যা শরীয়তের ভাষায় বেহেশ্‌ত ও দোযখ বলে পরিচিত।

৪। চতুর্থ বিশেষত্ব, যা বিশেষকরে ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক দলিল থেকে অর্জিত হয় তা হল ঃ পরজগৎকে এতটা বিস্তৃত হতে হবে যে, সকল মানুষের সুকর্ম ও দুষ্কর্ম অনুসারে তাদেরকে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করা যায়। যেমন ঃ যদি কেউ লক্ষ লক্ষ মানুষকে অন্যায় ভাবে হত্যা করে থাকে, তবে তাকে শাস্তি দেয়া যেমন সম্ভব হয় তেমনি যদি কেউ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা করে থাকে তবে তাকেও পুরস্কৃত করা সম্ভব হয়।

৫। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অপর বিশেষত্বটি, যা এ ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক

দলিল থেকেই হস্তগত হয় এবং উক্ত দলিল উপস্থাপনের সময় ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকাল হল 'কর্মফল লাভের স্থান' কর্ম সম্পাদনের স্থান নয়।

এর ব্যাখ্যা হল ঃ পার্থিব জীবন এরূপ যে, মানুষ পরস্পরবিরোধী ইচ্ছা ও আকাংখা পোষণ করে থাকে এবং সর্বদা দ্বিধা-বিভক্ত পথপ্রান্তে অবস্থান নিয়ে থাকে । ফলে এ দু'য়ের মধ্যে যে কোনটিকে নির্বাচন করতে বাধ্য হয়। আর এ বিষয়টিই সে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে, যা জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরত চলতে থাকে। প্রভুর প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরায়ণতার দাবী হল, যারা নিজ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেননি, তারা যথোপযুক্ত পুরস্কার লাভ করবে এবংএর অন্যায়কারীরা নিজ কর্মের শাস্তি ভোগ করবে।

এখন যদি আমরা কল্পনা করি যে, কর্মক্ষেত্র ও এর নির্বাচন পরজগতেও বিদ্যমান তবে প্রভুর অনুগ্রহ ও কল্যাণের দাবী হল ঃ কর্ম সম্পাদন ও নির্বাচনের অন্তরায় না হওয়া। আর এভাবে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের জন্যে অপর এক জগৎ আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। তখন যে জগৎকে আমরা পরজগৎ হিসেবে কল্পনা করেছি, প্রকৃতপক্ষে তা অপর এক ইহজগৎ রূপে পরিগণিত হয়। আর প্রকৃত পরকালীন জগৎ হল সর্বশেষ ও চূড়ান্ত জগৎ, যেখানে আর কোন দায়িত্ব, পরীক্ষা ও এর ক্ষেত্র (অর্থাৎ একাধিক চাহিদার মধ্যে কোন বিরোধ) থাকবে না।

আর এখানেই ইহ ও পর জগতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য প্রকাশ লাভ করে। অর্থাৎ ইহজগৎ হল এমন এক জগৎ, যেখানে নির্বাচন ও পরীক্ষার ক্ষেত্র বিদ্যমান। অপরদিকে পরজগৎ হল সেই জগৎ, যেখানে ইহজগতে যে সকল সুকর্ম ও দুষ্কর্ম সম্পাদন করেছে, সেগুলোর চিরন্তন পুরস্কার, শাস্তি ও ফল গ্রহণের ক্ষেত্র বিদ্যমান।

وانّ اليوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل

আজ প্রকৃতপক্ষে কর্ম সম্পাদনের সময়, হিসেবের সময় নয়, আর কাল হল হিসেবের সময়, কর্ম সম্পাদনের সময় নয়। (নাহজুল বালাগা, খোতবাহ -৪২)

পাঠ -৯

মৃত্যু থেকে ক্বিয়ামত

- ভূমিকা
- সকল মানুষই মৃত্যু বরণ করবে
- সমস্ত আত্মার হরণকারী
- সহজ ও কঠোরভাবে আত্মার হরণ
- মৃত্যুকালে তওবাহ ও বিশ্বাস স্থাপনের কোন মূল্য নেই
- পৃথিবীতে ফিরে আসার ইচ্ছা
- বারযাখ্

ভূমিকা ঃ

আমরা জানি যে, আমরা আমাদের এ ক্ষুদ্র জ্ঞানে পরকালের ঘটনা প্রবাহ এবং পরম অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা লাভ করতে অক্ষম। তাই কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের ভিত্তিতে যে একশ্রেণীর সামগ্রিক ধারণা লাভ করতে পারি এবং ওহীর মাধ্যমে পরকালের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বসমূহের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতেই তুষ্ট থাকব। তবে পরজগতের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে কখনো কখনো যে সকল পরিভাষা ব্যবহার করা হয় সম্ভবতঃ তা সাদৃশ্যার্থেই ব্যবহার করা হয়। ফলে ঐ সকল পরিভাষা শ্রবণের মাধ্যমে যে ধারণা লাভ হয়ে থাকে সম্ভবতঃ তা বাস্তব দৃষ্টান্তের সাথে সম্পূর্ণরূপে না-ও মিলতে পারে। আর এটা বর্ণনার অপারগতা নয় বরং আমাদের বোধের অক্ষমতার কারণেই হয়ে থাকে। নতুবা আমাদের মস্তিষ্কের কাঠামোকে বিবেচনা করতঃ যে সকল শব্দসমষ্টি ঐ সকল বাস্তবতার প্রদর্শক হতে পারে নিঃসন্দেহে তা ঐ সকল শব্দসমষ্টিই, যা পবিত্র কোরান নির্বাচন করেছে ।

যেহেতু কোরানের বর্ণনা পরকালের সূচনালগ্নকেও সমন্বিত করে সেহেতু 'মানুষের মৃত্যু' থেকেই আমাদের আলোচনা শুরু করব।

সকল মানুষই মৃত্যুবরণ করবে ঃ

পবিত্র কোরান গুরুত্বের সাথে উপস্থপন করে যে, সকল মানুষেরই (বরং সমস্ত জীবনেরই) মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং এ পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরস্থায়ীভাবে থাকবে না ।

كلّ من عليها فان

যা কিছুই এখানে (পৃথিবীতে) বিদ্যমান, ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। (আর্ রাহ্মান-২৬)

كلّ نفس ذائقة الموت

প্রত্যেকেই মৃত্যুরস্বাদ আস্বাদন করবে। (আল্ ইমরান-১৮৫)

মহানবীকে (সঃ) উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ঃ

انّك ميّت و انهم ميّتون

প্রকৃতপক্ষে তুমিও মৃত্যু বরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। (যুমার-৩০)

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افاين متّ فهم الخالدون

আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি, সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে ? (আম্বিয়া -৩৪)

অতএব মৃত্যু প্রত্যেক জীবনের জন্য এক সামগ্রিক ও অব্যতিক্রমধর্মী নিয়ম।

সমস্ত আত্মার হরণকারী ঃ

পবিত্র কোরানে একদিকে আত্মার হরণকারী হিসেবে মহান আল্লাহর কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

الله يتوفىّ الانفس حين موتها

আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময়। (যুমার -৪২)

অপরদিকে মৃত্যুর ফেরেশ্‌তাকে রূহ কবজ করার জন্যে আদিষ্ট বলে পরিচয় দেয়া হয়েছে ঃ

قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم

বল, তোমাদের জন্যে নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। (সেজদা -১১)

অপর এক স্থানে প্রাণ হরণকারী হিসেবে ফেরেশ্‌তাগণ এবং প্রভু কর্তৃক প্রেরিতগণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا

অবশেষে যখন তোমাদের কারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায়। (আনয়াম-৬১)

স্পষ্টতঃই যখন কোন কর্তা, অপর কোন কর্তার মাধ্যমে কোন কার্য সম্পাদন করে, তবে ঐ কার্যের কর্তারূপে উভয়কেই উল্লেখ করা সঠিক। অনুরূপ যদি দ্বিতীয় কর্তাও অপর কোন কর্তার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করে , তবে তৃতীয় কর্তাকে কার্য সম্পাদনকারী হিসেবে গণনা করা সঠিক হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ আত্মাসমূহের হরণকর্ম মৃত্যুর ফেরেশ্‌তার (ملك الموت) মাধ্যমে সম্পন্ন

করেন এবং তিনিও যেহেতু তাঁর অনুগত ফেরেশ্‌তাদের মাধ্যমে উক্ত কর্ম সম্পাদন করেন, সেহেতু উক্ত তিনজনকেই কার্যের সম্পাদনকারী হিসেবে মনে করা সঠিক।

সহজ ও কঠোরভাবে আত্মার হরণ ঃ

পবিত্র কোরানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিযুক্তগণ সকল মানুষের প্রাণ একইভাবে গ্রহণ করেন না। বরং কারও কারও ক্ষেত্রে খুব সহজ ও সম্মানের সাথে এবং কারও কারও ক্ষেত্রে কঠোর ও অপমানের সাথে প্রাণ হরণ করে থাকেন। উদাহরণতঃ মু'মিনগণের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ঃ

الذين تتوفاهم الملائكة طيّبين يقولون سلام عليكم

ফেরেশ্‌তাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় আনন্দাবস্থায় (তাদেরকে) ফেরেশ্‌তাগণ বলবে, 'তোমাদের প্রতি শান্তি (ও সম্মান)! (নাহল -৩২) [১]

আবার কাফেরদের সম্পর্কে বলে ঃ

ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم و ادبارهم....

তুমি যদি দেখতে পেতে ফেরেশ্‌তাগণ কাফেরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে ------ (আনফাল -৫০) [২]

মৃত্যুকালে তওবাহ ও বিশ্বাস স্থাপণের কোন মূল্য নেই ঃ

যখন কাফের ও পাপিষ্ঠদের মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং পৃথিবীতে আর বেঁচে থাকার কোন আশা থাকে না তখন পূর্বে সম্পাদিত স্বীয় কর্ম সম্পর্কে অনুতপ্ত হয় এবং বিশ্বাস স্থাপন করে ও নিজের পাপের জন্যে তওবাহ্ করে। কিন্তু মহান আল্লাহর নিকট এ ধরনের বিশ্বাস ও তওবার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। পবিত্র কোরান এ সম্পর্কে বলে ঃ

يوم يأتى بعض ءايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا

১। এছাড়া সূরা আনয়াম -৯৩ দ্রষ্টব্য

২। এছাড়া সূরা মুহাম্মাদ (সঃ) - ২৭ দ্রষ্টব্য

যে দিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে সে দিন তার ঈমান কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি। (আনআম -১৫৮)

وليست التوبة للذين يعملون السّيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى تبت الان...

তওবাহ তাদের জন্যে নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে এবং তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, ' আমি এখন তওবাহ্ করছি, ... । (নিসা -১৮)

ফেরাউনের বক্তব্যে উল্লেখিত হয়েছে যে, যখন (নীল নদের পানিতে) নিমজ্জিত হচ্ছিল, তখন বলছিল ঃ

ءامنت انّه لا اله الاّ الّذى ءامنت به بنو اسرائيل انا من المسلمين

আমি বিশ্বাস করলাম যে, বনী ইসরাঈল যাতে বিশ্বাস করে -তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভূক্ত। (ইউনূস-৯০)

এবং তার উত্তরে বলা হয় ঃ

الآن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين

এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছি এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (সূরা ইউনুস-৯১)

পৃথিবীতে ফিরে আসার ইচ্ছা ঃ

অনুরূপ পবিত্র কোরান কাফের ও দুস্কৃতিকারীদের সম্পর্কে বর্ণনা করে যে, যখন তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয় অথবা বিধ্বংসী আযাব তাদের উপর অবর্তীণ হয়, এই ইচ্ছা পোষণ করে ঃ 'হায়! যদি পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম এবং বিশ্বাসী ও সৎকর্মকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারতাম!' অথবা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে, আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমাদের পূর্ববর্তী কর্মসমূহের ক্ষতিপূরণ করতে পারি। কিন্তু এ ধরনের আকাংখা ও প্রার্থনার কোন কার্যকারিতা নেই ।[১]

১। স্মরণ রাখতে হবে যে, পবিত্র কোরান তাদের প্রত্যাবর্তনকেই অস্বীকার করে, যারা সমস্ত জীবন কুফর ও গুনাহের মাঝে অতিবাহিত করেছিল এবং মৃত্যুর সময় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের ও গুণাহমোচনের ইচ্ছা পোষণ করে। এছাড়া ও কিয়ামতের মাঠ থেকে ফিরে আসাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আর এ নেতিবাচকতার অর্থ এ নয় যে, সমস্ত প্রত্যাবর্তনকেই অস্বীকার করে। কারণ যেমনটি ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমনও কেউ ছিলেন যে দ্বিতীয়বার এ পৃথিবীতেই ফিরে এসেছিলেন এবং শিয়া বিশ্বাস মতে ইমামে যামান (আঃ)-এর আবির্ভাবের পরও একদল পুনরায় এ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন (رجعت) করবে।

কোন কোন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি তাদেরকে (পৃথিবীতে) ফিরিয়েও দেয়া হত তবে তারা পূর্বের প্রক্রিয়াই চালিয়ে যেত।[১] অনুরূপ ক্বিয়ামতের দিনেও এ ধরনের ইচ্ছা ও প্রার্থনা করবে, যার জবাব প্রাথমিকভাবেই নেতিবাচক হবে।

حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلّي اعمل صالحا فيما تركت كلا انّها كلمة هو قائلها........

> যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি। না, তা হওয়ার নয়। এটা তো তার একটি উক্তি মাত্র। (এবং এটা এমন এক আকাংখা, যা কখনোই কার্যকরী হবে না)। (মু'মিনুন ৯৯-১০০)

او تقول حين ترى العذاب لو انّ لى كرّة فاكون من المحسنين

> অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাকেও বলতে না হয়, 'আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম। (যুমার-৫৮)

اذ وقفوا على النّار فقالوا يا ليتنا نردّ ولا نكذب بايات ربّنا و نكون من المؤمنين

> যখন তাদেরকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করান হবে এবং তারা বলবে হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভূক্ত হতাম। (আনআম –২৭)

اذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم ربّنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انّا موقنون

> যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হয়ে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন তুমি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ কর, আমরা সৎকর্ম করব, আমরা তো দৃঢ়বিশ্বাসী। (সেজদা-১২)

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে সুস্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, পরকাল নির্বাচন ও কার্য সম্পন্ন করার স্থান নয়। এমনকি যে দৃঢ়বিশ্বাস মৃত্যুর সময় অথবা পরজগতে অর্জিত হয়, মানুষের উৎকর্ষের পথে তারও কোন গুরুত্ব নেই এবং তা তাকে পুরস্কারের যোগ্যও করে তুলে না।

---

[১]। আনয়াম-(২৭-২৮)।

এভাবেই কাফের ও পাপিষ্ঠরা পৃথিবীতে ফিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করে, যাতে স্বেচ্ছায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে ও যথোপযুক্ত কার্য সম্পন্ন করতে পারে।

বারযাখ ঃ

পবিত্র কোরানের আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ মৃত্যুর পর কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট সময় কবর ও বারযাখে অতিবাহিত করবে এবং কিছুটা হলেও ভোগ ও বিলাস অথবা কষ্ট ও ক্লেশের অধিকারী হবে। অনেক রেওয়াতে এসেছে যে, বিশ্বাসী পাপীরা এ সময় তাদের পাপানুপাতে কিছু কষ্ট ও ক্লেশ ভোগের মাধ্যমে পবিত্র হয়, যাতে পরজগতে দায়ভার মুক্ত হতে পারে।

যেহেতু বারযাখ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবী রাখে, সেহেতু ঐগুলো সম্পর্কে আলোচনা না করে কেবলমাত্র একটি আয়াতের উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি। পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে ঃ

ومن ورآئهم برزخ الى يوم يبعثون

তাদের সম্মুখে (তাদের মৃত্যুর পর) বারযাখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (মু'মিনুন-১০০)

পাঠ -১০

পবিত্র কোরানে পুনরুত্থানের চিত্র

- ভূমিকা
- ভূপৃষ্ঠ, সমুদ্র ও পর্বতসমূহের অবস্থা
- আকাশ ও নক্ষত্রসমূহের অবস্থা
- মৃত্যু শানাই
- জাগরণতুর্য এবং পুনরুত্থানের সূচনা
- প্রভুর শাসনব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ এবং পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ
- প্রভুর ন্যায়দণ্ড
- অনন্ত জীবনের পথে
- বেহেশ্‌ত
- দোযখ

ভূমিকা ঃ

পবিত্র কোরান থেকে জানা যায় যে, পরজগতের অস্তিত্বলাভ শুধুমাত্র মানুষের নবজীবন লাভের সাথেই সম্পর্কিত নয়। বরং মূলতঃ এ পার্থিব জগতের সকল নিয়মের পরিবর্তন ঘটে এবং অপর এমন এক জগৎ এক নতুন নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রকাশ লাভ করে, যে জগৎ আমাদের ধারণাতীত এবং স্বভাবতঃই এ জগতের বিশেষত্ব সম্পর্কে আমাদের কোন সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে পারে না। তখন সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ ছিল সকলেই একইসাথে জীবন লাভ করে এবং স্বীয় কৃতকর্মের ফল লাভ করে। আর বৈভব বা শাস্তির অধিকারী হয়।

যেহেতু এ আলোচনা সংশ্লিষ্ট আয়াতের সংখ্যা ব্যাপক এবং এগুলোর আলোচনার জন্যে বিস্তৃত সময়ের প্রয়োজন, তাই কেবলমাত্র ঐ আয়াতগুলোর অন্তর্গত বিষয়সমূহকে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেই তুষ্ট থাকব।

পৃথিবী, সমূদ্র ও পর্বতসমূহের অবস্থা ঃ

পৃথিবীতে এক মহা ভূকম্পনের সৃষ্টি হবে[১] এবং যা কিছু ভূঅভ্যন্তরে আছে বের করে দিবে[২], এর বিভিন্ন অংশ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে[৩] সমূদ্রসমূহ বিভক্ত হয়ে পড়বে[৪], পর্বতসমূহ গতিশীল[৫] ও ভেঙ্গে চরমার হয়ে যাবে[৬] এবং বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে,[৭] অতঃপর ধুনকৃত তুলার রূপ ধারণ করবে[৮]

১। যিলযাল-১, হাজ্জ-১, ওয়াক্বিয়াহ-৪, মুযাম্মিল-১৪।
২। যিলযাল-২, ইনশিক্বাক্ব-৪।
৩। আল হাক্বা-১৪, ফাজর-২১।
৪। তাক্বভির-৬, ইনফিতার-৩।
৫। কাহ্ফ-৪৭, নাহল-৮৮, তাহুর-১০, তাক্বভির-২।
৬। আল হাক্বা-১৪, ওয়াকিয়াহ-৫।
৭। মুযাম্মিল-১৪।
৮। মায়ারিজ-৯, ক্বারিয়াহ-৫।

অতঃপর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে[১] এবং গগনচুম্বী পর্বতসমূহ মরিচীকায় রূপ নিবে।[২]

আকাশ ও নক্ষত্রসমূহের অবস্থা ঃ

চন্দ্র[৩] সূর্য[৪] বৃহদাকার নক্ষত্রসমূহ, যাদের কোন কোনটি আমাদের সূর্যের লক্ষ লক্ষগুণ বৃহৎ ও উজ্জ্বল তাদের সকলেই নির্বাপিত ও তিমিরে পরিণত হবে।[৫] ঐগুলোর গতির শৃংখলা বিনষ্ট হবে।[৬] যেমন ঃ চন্দ্র ও সূর্য একাকার হয়ে যাবে[৭] এবং যে আকাশ এ পৃথিবীর উপর সুরক্ষিত ও দৃঢ় ছাদ সদৃশ তা দুর্বল, প্রকম্পিত[৮] ও বিদীর্ণ হবে এবং পরস্পর থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে [৯], কুণ্ডুলাকৃতি হয়ে পরস্পর ছড়িয়ে পড়বে[১০] আকাশের জড় উপাদানগুলো গলিত ধাতুর রূপ ধারণ করবে[১১] এবং বিশ্বের সর্বত্র ধুম্রাচ্ছন্ন ও মেঘাচ্ছন্ন হবে[১২]।

মৃত্যু শানাই ঃ

আর এ ধরনের পরিস্থিতিতেই মৃত্যু শানাই বেজে উঠবে। সকল

১। তোহা-(১০৫-১০৭), মুরসিলাত-১০।
২।। কাহ্‌ফ-৮, নাবা-২০।
৩। আল ক্বিয়ামাহ-৮।
৪। তাক্বভির-১।
৫। তাক্বভির-২।
৬। ইনফিতার-২।
৭। আল ক্বিয়ামাহ-৯।
৮। তূর-১, আলহাক্বা-১৬।
৯। আর্ রাহমান-৩৭, আল হাক্বা-১৬, মুযাম্মিল-১৮ মূরসিলাত-৯, নাবা-১৯, ইনফিতার-১, ইনশিক্বাক্ব-১।
১০। আম্বিয়া-১০৪, তাক্বভির-১১।
১১। মায়ারিজ-৮।
১২। ফুরক্বান-২৫, দূখান-১০।

জীবিত অস্তিত্বেরই মৃত্যু ঘটবে[১] এবং প্রকৃতি ভুবনে আর কোন জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর ভয়-ভীতি ও অনিশ্চয়তার ছায়া সকল মানুষের উপর নেমে আসবে[২] কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা বাস্তবতা ও অস্তিত্বের রহস্য সম্পর্কে অবগত এবং যাদের আত্মাগুলো প্রভুর জ্ঞান ও প্রেমের গভীরে নিমজ্জিত।

জাগরণতুর্য এবং পুনরুত্থানের সূচনা ঃ

অতঃপর অমর এ চিরন্তনতার অধিকারী অপর এক জগৎ অস্তিত্ব লাভ করবে,[৩] ধরিত্রীর রূপ ঐশী জ্যোতির আলোকে আলোকিত হবে,[৪] জাগরণতুর্য উচ্চনিনাদে বেজে উঠবে[৫], সকল মানুষ (এমনকি সকল পশু-পাখীও)[৬] এক মুহূর্তের মধ্যে পুনর্জীবন লাভ করবে[৭], হতভম্ব ও হতচকিত[৮] পঙ্গপাল ও প্রজাপতির মত[৯] দ্রুত গতিতে[১০] প্রভুর দিকে ধাবিত হবে[১১] এবং সকলেই এক মহা ময়দানে উপস্থিত হবে[১২]। এমতাবস্থায় অধিকাংশেরই দাবী থাকবে যে, বারযাখে তাদের অবস্থান হয়েছিল একঘণ্টা, একদিন অথবা কয়েকদিন।[১৩]

১। যুমার-৬৮, আল হাক্কা-১৩, ইয়াসীন-৪৯।
২। নামল-৮৭-৮৯।
৩। ইব্রাহীম-৪৮, যুমার-৬৭, মারিয়াম-৩৮, ক্বাফ-২২।
৪। যুমার-৬৯।
৫। যুমার-৬৮, কাহ্‌ফ-৯৯, ক্বাফ-২০, ২৪, নাবা-১৮, নাযিয়াত-১৩-১৪, মুদাছছির-৮, সাফফত-১৯।
৬। আনআম-৩৮, তাকভির-৫।
৭। কাহ্‌ফ-৪৭, নাহল-৭৭, ক্বামার-৫০, নাবা-১৮।
৮। ক্বাফ-২০।
৯। ক্বারিয়াহ-৪, ক্বামার-৭।
১০। ক্বাফ-৪৪, মায়ারিজ-৪৩।
১১। । ইয়াসীন-৫১, মুতাফ্‌ফিফীন-৩০, আল ক্বিয়ামাহ-১২, ৩০, এছাড়া (حشر) (نشر) (لقاء الله) (ردّ الي الله) (رجوع الي الله) ইত্যাদি আয়াতসমূহ দ্রষ্টব্য।
১২। কাহ্‌ফ- ৯৯, তাগাবুন- ৯ , নিসা-৮৭, আনআম- ১২, আলে ইমরান-৯, হুদ-১০৩।
১৩। রূম-৫৫, নাযিয়াত-৪৬, ইউনুস-৪৫, ইসরা-৫২, তোহা-১০৩-১০৪, মু'মিনূন-১১৩, আহক্বাফ-৩৫।

প্রভুর বিচারব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ এবং পারস্পরিক সম্পর্কোচ্ছেদ ঃ

ঐ জগতে সকল বাস্তবতা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে[১] এবং প্রভুর শাসন ব্যবস্থা ও রাজত্ব চূড়ান্ত রূপ ধারণ করবে[২] আর সৃষ্টির উপর এমন আতংকের ছায়া নেমে আসবে যে, কারোই উচ্চবাচ্য করার কোন সামর্থ্য থাকবে না[৩]। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অদৃষ্টের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে এবং এমনকি সন্তানরা পিতা-মাতা থেকে, নিকটজন ও আত্মীয়-স্বজন পরস্পর থেকে পলায়ন করবে[৪]। মূলত ঃ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হবে[৫] এবং পার্থিবলাভ ও শয়তানী মানদণ্ডের ভিত্তিতে যে সকল বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল, সে সকল সম্পর্ক শত্রুতায় পরিণত হবে[৬]। ইতিপূর্বে কৃত অপরাধের জন্যে অনুতাপ ও অনুশোচনায় হৃদয় আবিষ্ট হবে[৭]।

প্রভুর ন্যায়দণ্ড ঃ

অতঃপর প্রভুর ন্যায়দণ্ডভিত্তিক বিচারালয় রূপ লাভ করবে এবং সকল বান্দাদের কৃতকর্ম উপস্থিত হবে[৮], আমলনামাসমূহ বিতরণ করা হবে[৯], কোন কর্তার কৃতকর্ম এতটা সুস্পষ্ট যে, কাউকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবে না যে, কী করেছে[১০] ?

---

[১]। ইব্রাহীম- ২১, আল আদিয়াত- ১০, আত্তারিক্ব- ৯, ক্বাফ-২২, আল হাক্বাহ- ১৮।
[২]। হাজ্জ-৫৬, ফুরক্বান- ২৬, গফির- ১৬, ইনফিতার-১৯।
[৩]। হূদ- ১০৫, তোহা- ১০৮, ১১১, নাবা-৩৮।
[৪]। আবাসা-(৩৪-৩৭), শুয়ারা- ৮৮, মায়ারিজ-(১০-১৪), লুকমান – ৩৩।
[৫]। বাক্বারা-১৬৬, মু'মিনুন- ১০১।
[৬]। যুখরূফ- ৬৭।
[৭]। আনআম- ৩১, মারিয়াম- ৩৯ , ইউনুস- ৫৪।
[৮]। আলে ইমরান- ৩০, তাক্বভির- ১৪, ইসরা-৫৪।
[৯]। আলে ইমরান-১৩, ১৪, ৭১ আল হাক্বাহ- ১৯, ২৫ ইনশিক্বাক- ৭, ১০।
[১০]। আর্ রাহমান- ৩৯।

এ বিচারালয়ে ফেরেশ্‌তাগণ, নবীগণ ও আল্লাহর নির্বাচিতগণ সাক্ষীরূপে উপস্থিত হবেন[১]। এমনকি মানুষের হস্ত, পদ এবং ত্বকও সাক্ষ্য প্রদান করবে[২]। সকল মানুষের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ও প্রভুর ন্যায়দণ্ডের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হবে[৩] এবং ন্যায় ও আদ্‌লের ভিত্তিতে তাদের বিচার করা হবে[৪]। প্রত্যেকেই তার চেষ্টা ও শ্রমের ফল লাভ করবে[৫]। সৎজনকে তার কর্মের দশগুণ বেশী পুরস্কার প্রদান করা হবে[৬] এবং কেউই কারও বোঝা বহন করবে না।[৭] কিন্তু যারা অন্যান্যদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, তারা নিজেদের পাপ ছাড়াও পথভ্রষ্টদের পাপও স্বীয় স্কন্ধে ধারণ করবে[৮]। (তাদের পাপ লাঘব তো হবেই না) উপরন্তু তাদের নিকট থেকে (তাদের পাপকর্মের পরিবর্তে) কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না[৯] এবং (তাদের জন্যে) কারও সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না[১০]। কেবলমাত্র তাদের সুপারিশই গ্রহণ করা হবে, যারা মহান আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্ত হবেন এবং তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির মানদণ্ডের ভিত্তিতে শাফায়াত করবেন[১১]।

অনন্ত জীবনের পথে ঃ

অতঃপর আল্লাহর আদেশ ঘোষণা করা হলে[১২] সৎকর্ম সম্পাদনকারী

১। যুমার-৬৯, বাক্বারা-১৪৩, আল ইমরান-১৪০, নিসা-৪১, ৬৯, হুদ-১৮, হাজ্জ-৭৮, ক্বাফ-২১, নাহল-৮৪,৮৯।
২। নূর-২৪, ইয়াসীন-৬৫, ফুচ্ছিলাত ২০-২১।
৩। আ'রাফ-৮, ৯, আম্বিয়া-৪৭, মু'মিনূন- ১০২-১০৩ ক্বারিয়াহ ৬-৮।
৪। ইয়ূনূস ৫৪, ৯৩, জাসিয়াহ-১৭, নামল-৭৮, যুমার ৬৯-৭৫।
৫। আন্‌ নাজম- ৪০-৪১, বাক্বারা- ২৮১, ২৮৬, আলে ইমরান-২৫, ১৬১, আনআম-৭০, হুদ-১১১, ইব্রাহীম-৫১, তোহা-১৫, গাফির-১৭, যাছিয়াহ-২২, তূর-২১, মুদাছছির-৩৮, ইয়াসীন-৫৪, যুমার-২৪।
৬। আনআম-১৬০।
৭। আন্‌ নাজম- ৩৯, আনআম-১৬৪, ফাতির-১৮, যুমার-৭।
৮। আন্‌ নাহল-২৫, আনক্বাবুত-১৩, প্রসঙ্গক্রমে এখান থেকেই আমরা ধারণা করতে পারি যে, যারা অপরের হিদায়াতের কারণ হয় তারা অতিরিক্ত ছওয়াবের অধিকারী হবে, যেমনটি স্পষ্টরূপে রেওয়াতে এসেছে।
৯। বাক্বারা- ৪৮-১২৩, আলে ইমরান- ৯১, লুক্বমান-৩৩, মায়িদাহ-৩৬, হাদীদ-১৫।
১০। বাক্বারা- ৪৮, ১২৩, ২৫৪, মূদচ্ছির-৪৮।
১১। আম্বিয়া-২৮, বাক্বারা-২৫৫, ইউনুস-৩, মারিয়াম-৭৮, তোহা- ১০৯, সাবা-২৩, যুখরুফ-৮৬, আননাজম-২৬
১২। আ'রাফ-৪৪।

ও অন্যায়কারীরা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যাবে।[১] বিশ্বাসীগণ আনন্দিত ও হাস্যেজ্জ্বল বদনে বেহেশ্‌তে[২] এবং অবিশ্বাসীরা অপমানিত, লাঞ্ছিত ও মলিনবদনে দোযখের পথে যাত্রা করবে[৩]। সকলেই দোযখের পথ অতিক্রম করবে[৪]। তবে বিশ্বাসীগণের বদন থেকে জ্যোতি নির্গত হবে এবং স্বীয় পথকে উজ্জ্বল করবে[৫] আর কাফের ও মুনাফিকরা অন্ধকারে পতিত হবে।

যে মুনাফিকরা পৃথিবীতে মু'মিনদের সাথে মিশে ছিল, তারা মু'মিনগণের নিকট তাদের দিকে ফিরে তাকাতে ফরিয়াদ করবে, যাতে তাদের জ্যোতি ব্যবহার করে মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে পারে। মু'মিনদের পক্ষ থেকে জবাব দেয়া হবে "জ্যোতি লাভ করতে পশ্চাতে (পৃথিবীতে) ফিরে যাও! মুনাফিকরা বলবে ঃ আমরা কি পৃথিবীতে তোমাদের সাথে ছিলাম না ? জবাবে বলা হবে ঃ কেন, তবে বাহ্যিকভাবে আমাদের সাথে ছিলে। কিন্তু নিজেদেরকে পরিবেষ্টিত করেছিলে এবং তোমাদের অন্তরগুলো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও নির্মমতায় জড়িয়ে পড়েছিল। আর অদ্য তোমাদের সকল ক্রিয়া নিস্পন্ন হয়ে গিয়েছে এবং তোমাদের থেকে ও কাফেরদের থেকে (শাস্তির) বিকল্প হিসেবে কিছুই গ্রহণ করা হবে না। অবশেষে কাফের ও মুনাফিকদেরকে নরক গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে[৬]।

যখন বিশ্বাসীগণ বেহেশ্‌তের নিকটবর্তী হবে তখন এর দ্বারগুলো খুলে যাবে এবং রহমতের ফেরেশ্‌তারা তাদেরকে স্বাগতম জানাতে আসবে। তারা সম্মান ও সালামের সাথে তাদেরকে (মু'মিনগণকে) অনন্তসৌভাগ্যের সুসংবাদ দিবে[৭] অপরদিকে যখন কাফের ও মুনাফিকরা দোযখের নিকটবর্তী হবে, তখন

---

[১]। আনফাল- ৩৭, রূম- ১৪-১৬,৪৩, ৪৪, শুরা-৭, হুদ ১০৫-১০৮, ইয়াসীন-৫৯।
[২]। যুমার- ৭৩, আলে ইমরান- ১০৭, মারিয়াম-৮৫, আল ক্বিয়ামাহ- ২৪-৪২, মুতাফফীন-২৪, গাশিয়াহ-৮, আবাসা-৩৮, ৩৯।
[৩]। যুমার- ৬০,৭১ আলে ইমরান- ১০৬, আনআম- ১২৪, ইয়ূনুস- ২৭ মারিয়াম-৮৬, তোহা-১০১, ১২৪-১২৬, ইব্রাহীম-৪৩ ক্বামার-৮, মুয়ারিজ-৪৪, গাশিয়াহ-২, ইসরা-৭২,৯৭, আবাসা- ৪০,৪১।
[৪]। মারিয়াম ৭১-৭২।
[৫]। হাদীদ- ১২।
[৬]। হাদীদ ১৩-১৫, নিসা ১৪০।
[৭]। যুমার-৭৩, রাদ ২৩-২৪।

এর দ্বারগুলোও খুলে যাবে এবং আযাবের ফেরেশ্‌তারা তাদেরকে রূঢ়তাসহকারে ভর্ৎসনা করবে। তারা (আযাবের ফেরেশ্‌তারা) অনন্তশাস্তির প্রতিশ্রুতি দিবে[১]।

বেহেশ্‌তঃ

বেহেশ্‌তে বিস্তৃত কাননসমূহ, প্রশস্ত আকাশসমূহের ছায়ায়, বিস্তৃত ভূমির উপর অবস্থান করবে,[২] যে গুলোতে নানাবিধ বৃক্ষরাজি, সকল প্রকার পরিপক্ক ফল (বেহেশ্‌তবাসীর) নাগালের মধ্যে অবস্থান করবে।[৩] আর থাকবে আড়ম্বরপূর্ণ ইমারতসমূহ[৪], স্বচ্ছ পানি[৫] এবং পবিত্র পেয়, দুগ্ধ ও মধুর ঝর্ণাধারা[৬]। এ ছাড়া যা কিছুই বেহেশ্‌তবাসীর কাংখিত,[৭] বরং তাদের যাঞ্চারও অধিক বৈভবে পরিপূর্ণ থাকবে ঐ বেহেশ্‌ত[৮]। বেহেশ্‌তবাসীগণ বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য ও চিত্রাংকিত মসৃন রেশমী পোশাকে সজ্জিত হয়ে[৯] মণিমুক্তা খচিত আরামদায়ক সুকোমল সজ্জায় পরস্পরের মুখোমুখী অবস্থানে হেলান দিয়ে বসে থাকবে[১০] এবং প্রভুর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে[১১]। অনর্থক কোন কথা বলবে না বা শুনবে না[১২]। হিমেল বা তপ্ত বাতাস কোনটিই তাদেরকে

---

[১]। যুমার ৭১-৭২ , তাহরীম -৬, আম্বিয়া - ১০৩।
[২]। আলে ইমরান -১৩৩, হাদীদ ২১।
[৩]। আল হাক্কাহ -২৩, আদদাহর -১৪ , নাবা - ৩২।
[৪]। তাওবাহ -৭২, ফুরক্বান -৭৫ , যুমার -২০ , সাবা - ৩৭।
[৫]। বাকারা -২৫, আলে ইমরান - ১৫, এবং আরও শতশত আয়াত।
[৬]। মুহাম্মদ -১৫, আদ্ দাহার ৬,১৮,২১, মুতাফ্‌ফিফীন - ২।
[৭]। নাহল -৩১, ফুরকান -১৬, যুমার -৩৪, ফুছ্‌ছিলাত - ৩১, শুরা -২২, যুখরুফ - ৭১।
[৮]। ক্বাফ -৩৫।
[৯]। কাহ্‌ফ -৩১, হাজ্জ - ২৩, ফাতির - ৩৩, দুখান -৫৩, দাহর -২১, আ'রাফ -৩২।
[১০]। হিজর -৪৮, কাহ্‌ফ- ৩১, সাফফাত - ৪৪, তূর - ২০ , আর্ রাহমান -৫৪,৭৬, ওয়াকিয়াহ - ১৫,১৬, গাশিয়াহ - ১৩-১৬, ইয়াসীন - ৫৬।
[১১]। আ'রাফ -৪৩, ইউনুস - ১০, ফাতির -৩৪, যুমার -৭৪।
[১২]। মারিয়াম - ৬২, নাবা - ৩৫, গাশিয়াহ - ১১।

কষ্ট দিবে না[১]। তাদের থাকবে না কোন দুর্ভোগ, ক্লান্তি ও বিষাদ[২] কিংবা থাকবে না কোন ভয় ও বেদনা[৩] অথবা থাকবে না তাদের কোন হিংসা বা ক্রোধ।[৪] সুদর্শন সেবকগণ তাদের চারপাশে পরিভ্রমণরত থাকবে[৫]। স্বর্গীয় সুন্দর পানপাত্র থেকে তাদেরকে পান করানো হবে, যা তাদের বর্ধিত আনন্দ ও উপভোগের কারণ হবে এবং কোন প্রকার দুর্দৈবই তাদেরকে স্পর্শ করবে না[৬]। নানাবিধ ফল-মূল ও পাখীর মাংস তারা ভক্ষণ করবে[৭]। নিষ্কলুষ অপরূপ সুদর্শনা ও দয়াশীলা স্ত্রীগণের কোমল স্পর্শে তারা হবে ধন্য[৮]। সবকিছুর উর্ধ্বে তারা প্রভুর পক্ষ থেকে আত্মিক তুষ্টির মত নেয়ামতের অধিকারী হবে[৯]। তারা তাদের প্রভুর করুণা ও দয়ায় ধন্য হবে, যা তাদেরকে মহার্ঘ্যে নিমজ্জিত করবে এবং কারও পক্ষেই সে আনন্দের সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়[১০]। আর এ অতুলনীয় সৌভাগ্য, অবর্ণনীয় বৈভব এবং প্রভুর অনুগ্রহ, তুষ্টি ও সান্নিধ্য সর্বদা সেথায় বিরাজ করবে[১১], যা কখনোই শেষ হবে না[১২]।

---

[১]। দাহ্র -১৩।

[২]। ফাতির -৩৫, হিজর -৪৮।

[৩]। যুখরুফ - ৬৮, আহকাফ -১৩ , আ'রাফ - ৩৫,৪৯, ফুছ্ছিলাত -৩।

[৪]। আ'রাফ -৪৩, হিজর - ৪৭।

[৫]। তূর -২৪, ওয়াকিয়াহ -১৭, দাহর -১৯।

[৬]। সাফফাত ৪৫-৪৭, সাদ - ৫১, তূর -২৩, যুখরুফ -৭১ , ওয়াকিয়াহ ১৮,১৯ দাহর ৫,৬ , ১৫-১৯, নাবা -৩৪, মুতাফ্ফিফীন ২৫-২৮।

[৭]। সাদ - ৫১, তূর -২২, আর্ রাহমান -৫২,৬৮, ওয়াকিয়াহ ২০,২১, মুরসিলাত -৪২ , নাবা- ৩২।

[৮]। বাকারা -২৫, আলে ইমরান -১৫, নিসা -৫৭ , সাফফাত - ৪৮,৪৯ সাদ- ৫২, যুখরুফ -৭০ দুখান -৫৪, তূর-২০ , আর্ রাহমান- ৫৬, ৭০-৭৪ , ওয়াকিয়াহ ২২,২৩,৩৪-৩৭ নাবা-৩৩।

[৯]। আলে ইমরান -১৫, তাওবা -২১,৭২, হাদীদ -২০, মায়িদাহ -১১৯ মুযাদিলাহ -২৯ , বায়্যিনাহ -৮।

[১০]। সিজদাহ -১৭।

[১১]। বাকারা ২৫-৮২, আলে ইমরান -৩৬,১০৭,১৯৮, নিসা- ১৩,৫৭,১২২, মায়িদাহ -৮৫,১১৯ আ'রাফ -৪২ তাওবা- ২২,৭২,৮৯,১০০, ইউনুস-২৬, হুদ -২৩,১০৮, ইব্রাহীম-২৩, হিজর-৪৮, কাহফ-৩,১০৮, তোহা-৭৬, আম্বিয়া -১০২, মু'মিনুন- ১১, ফুরকান -১৬,৭৬ আনকাবুত - ৫৮, লুকমান -৯, যুমার - ৭৩, যুখরুফ -৭১, আহকাফ- ১৪, কাফ - ৩৪, ফাত -৫ ,হাদীদ -১২, মুজাদিলাহ- ২২, তাগাবুন -৯, তালাক -১১, বায়্যিনাহ-৮।

[১২]। দুখান - ৫৬, (ফুছ্ছিলাত -৮, ইনশিকাক -২৫, তীন -৬)।

দোযখ ঃ

দোযখ সে সকল কাফের ও মুনাফিকদের আবাসস্থল, যাদের অন্তরে ঈমানের কোন প্রকার জ্যোতিরই অস্তিত্ব নেই[১]। আর এ দোযখের ধারণক্ষমতা এত বেশী যে, সমস্ত অন্যায়কারীদেরকে ধারণ করার পরও বলবে ' هل من مزيد' অর্থাৎ আরও আছে কি ?[২] সেথায় আছে শুধু আগুন আর আগুন, শাস্তি আর শাস্তি !

আগুনের লেলিহান শিখাগুলো সবদিক থেকে (জাহান্নামীদেরকে) গ্রাস করবে। আর কর্ণবিদারী, ক্রোধান্বিত গর্জনে দোযখবাসীর ভয়-ভীতির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে[৩]। কদাকার, ভগ্ন কৃষ্ণকায়, কুৎসিৎ চেহারার[৪] এ দোযখবাসীরা এমন কি দোযখের ফেরেস্তাদের চেহারায় ও কোন প্রকার দয়া করুনা ও নমনীয়তার ছোঁয়া দেখতে পাবে না[৫]।

নরকবাসীরা লোহার গলাবন্ধ, জিঞ্জির দ্বারা বাঁধা থাকবে[৬]। আগুন তাদের আপদমস্তক গ্রাস করবে[৭] এবং স্বয়ং তারাই সে আগুনের ইন্ধন হবে[৮]। নরকের এহেন পরিবেশে নরকবাসীদের ক্রন্দন, চিৎকার, আহাজারী এবং নরকপ্রহরীদের হুংকার ব্যতীত কিছুই শুনতে পাওয়া যাবে না[৯]। পাপীদের আপদমস্তকে ফুটন্ত পানি ঢালা হবে। ফলে তাদের দেহের অভ্যন্তরভাগও গলে যাবে[১০]। যখনই পিপাসার প্রচণ্ডতা ও প্রদাহে পানি প্রার্থনা করবে তখনই উত্তপ, কলুষিত ও দুর্গন্ধময় পানি তাদেরকে প্রদান করা হবে, যা তারা গোগ্রাসে পান

১। নিসা –১৪০ ইত্যাদি।
২। কাফ –৩০।
৩। হুদ – ১০৬ আম্বিয়া –১০০,ফুরকান –১২, মুলক ৭–৮।
৪। আলে ইমরান –১০৬, মূলক –২৭ ইউনুস –২৭, মু'মিনুন –১০৪, যুমার–৬০।
৫। তাহরীম –৬।
৬। রা'দ –৫, ইব্রাহীম –৪৯, সাবা –৩৩, গাফির– ৭১,৭২, আল হাক্কাহ– ৩২, দাহর –৪।
৭। ইব্রাহীম – ৫০, ফুরকান – ১৩, আম্বিয়াহ – ৩৯, হামযাহ – ৬,৭।
৮। বাকারা – ২৪, আলে ইমরান – ১০, আম্বিয়া – ৯৮, জীন –১৫, তাহরীম –৬।
৯। ফুরকান – ১৩,১৪, ইনশিকাক –১১।
১০। হাজ্জ – ১৯ ,২০, দুখান –৪৮।

করবে [১]। তাদের খাবার হবে যাক্কুম (زقوم) বৃক্ষের ফল, যা আগুন থেকে জন্ম গ্রহণ করে। আর এ ফল ভক্ষণে তাদের অভ্যন্তরের যন্ত্রণা অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পাবে [২]। তাদের পোশাক হবে এক প্রকার কৃষ্ণকায় পদার্থ থেকে তৈরীকৃত, যা আঠালো এবং তাদের দুর্ভোগবৃদ্ধির কারণ হবে [৩]। তাদের সঙ্গী হবে শয়তান ও পাপিষ্ঠ জীনরা যাদের কাছ থেকে তারা পলায়ন করতে চাইবে [৪]। আর তারা পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ ও অভিসম্পাত করবে [৫]।

যখনই তারা মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাইবে, তখন দূর হও, চুপ কর, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাদেরকে স্তব্ধ করে দেয়া হবে [৬]। অতঃপর দোযখের প্রহরীদের শরণাপন্ন হয়ে বলবে যে ,"তোমরা আল্লাহর কাছে চাও, যাতে আমাদের শাস্তিকিছুটা হ্রাস করে।" উত্তরে শ্রবণ করবে ঃ মহান আল্লাহ কি নবীগনকে (আঃ) প্রেরণ করেননি? এবং তোমাদেরকে কি তারা চূড়ান্ত দলিল প্রদর্শন করেননি [৭]?"

অতঃপর তারা মৃত্যু কামনা করবে। জবাবে বলা হবে যে, "তোমরা অনন্তঃকাল দোযখে অবস্থান করবে[৮]। যদিও মৃত্যু তাদেরকে সর্বদিক থেকে আগ্রাসন করবে, কিন্তু তারা মরবে না[৯]। যতবারই তাদের শরীরের চামড়া ঝলসে যাবে, ততবারই নতুন চামড়া সৃষ্টি হবে; আর এ ভাবে তাদের আযাব চলতে থাকবে[১০]।

---

[১]। আনআম – ৭০, ইউনুস – ৪, কাহাফ –২৯, ওয়াকিয়াহ – ৪২–৪৪, ৫৫, মুহাম্মাদ – ১৫।
[২]। সাফফাত, ৬২–৬৬, সাদ – ৫৭, দুখান – ৪৫,৪৬, ওয়াকিয়াহ – ৫২,৫৩, নাবা – ২৫, গাশিয়াহ - ৬,৭।
[৩]। ইব্রাহীম – ৫০, হাজ্জ –১৯।
[৪]। যুখরুফ – ৩৮,৩৯, শুয়ারাহ –৯৪,৯৫, সাদ –৮৫।
[৫]। আ'রাফ – ৩৮,৩৯, আনকাবুত – ২৫, আহযাব – ৬৮, সাদ ৫৮–৬৪।
[৬]। মুমিনুন– ১০৮, রূম –৫৭, গাফির –৫২, মুরসিলাত –৩৫,৩৬।
[৭]। গাফির – ৪৯, ৫০।
[৮]। যুখরুফ – ৭৭।
[৯]। ইব্রাহীম – ১৭, তোহা –৭৪, ফাতির – ৩৬।
[১০]। নিসা – ৫৬।

বেহেশ্‌তবাসীদের নিকট থেকে কিঞ্চিৎ পানি ও খাবার ভিক্ষা করলে বলা হবে, 'মহান আল্লাহ বেহেশ্‌তের নেয়ামত তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন[১]। বেহেশ্‌তবাসীগণ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের এ দুর্ভাগ্যের কারণ কী এবং কী কারণে তোমাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়েছে ? জবাবে দোযখবাসীরা বলবে, আমরা মহান আল্লাহর এবাদত ও সালাত পাঠ করতাম না এবং নিঃস্ব ও দরিদ্রদেরকে সাহায্য করতাম না, পাপীষ্ঠদের সহযোগিতা করতাম, আর কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করতাম[২]।

অতঃপর দোযখবাসীরা পরস্পরের সাথে কলহে লিপ্ত হবে[৩]। বিপথগামীরা, যারা তাদেরকে বিপথগামী করেছে, তাদেরকে বলবে ঃ তোমরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিলে। তারা জবাবে বলবে ঃ তোমরা স্বেচ্ছায় আমাদেরকে অনুসরণ করেছিলে[৪]।

অধীনস্থরা ক্ষমতাধরদেরকে বলবে ঃ তোমরাই আমাদের এ হতভাগ্যের জন্যে দায়ী। তারা জবাবে বলবে ঃ আমরা কি তোমাদেরকে জোরপূর্বক তোমাদের সত্য পথ থেকে বিরত রেখেছিলাম[৫]। অবশেষে শয়তানকে বলবে ঃ তুই-ই আমাদের বিপথগামীতার কারণ।সে জবাবে বলবে ঃ মহান আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তোমরা তা অগ্রাহ্য করেছ। আর আমি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তোমরা তা গ্রহণ করেছিলে। সুতরাং আমাকে ভর্ৎসনা করার পরিবর্তে, তোমাদের নিজেদেরকে ভর্ৎসনা কর। অদ্য আমরা কেউই কারও উপকারে আসতে পারব না [৬]।

আর এভাবে নিজেদের কুফরি ও অবাধ্যতার শাস্তি ভোগ ব্যতীত তাদের আর কোন উপায় থাকবে না এবং অনন্তকাল তারা সেথায় আযাব ভোগ

---

[১]। আ'রাফ - ৫০।
[২]। মুদাছ্‌ছির ৩৯-৪৭।
[৩]। সাদ ৫৯-৬৪।
[৪]। আ'রাফ - ৩৮,৩৯, সাফফাত ২৭-৩৩, কাফ - ২৭,২৮।
[৫]। ইব্রাহীম - ২১, সাবা-(৩১-৩৩)।
[৬]। ইব্রাহীম-২২।

করতে থাকবে[১]।

[১]। বাক্বারা-৩৯ , ৮১,১৬২, ২১৭, ২৫৭, ২৭৫, আলে ইমরান-৮৮,১১৬, নিসা-১৬৯, মায়িদাহ-৩৭, ৮০, আনআম-১২৮, আরাফ-৩৬, তাওবাহ- ১৭,৬৩, ৬৮, ইউনুস-২৭,৫২ হূদ-১০৭ রাদ-৫ নাহল-২৯, কাহ্ফ-১০৮, তোহা-১০১, সাজদাহ-২০ মু'মিনূন- ১০৩, আহযাব- ৬৫, যুমার-৭২, গাফির-৭৬, যুখরুফ-৭৪, মুজাদিলাহ-১৭, তাগাবুন-১০, জীন-২৩, বায়্যিনাহ-৬।

পাঠ – ১১

ইহকাল ও পরকালের মধ্যে তুলনা

- ভূমিকা
- নশ্বর পৃথিবী ও অবিনশ্বর আখেরাত
- আখেরাতের আযাব থেকে নেয়ামতের পৃথকীকরণ
- আখেরাতই মূল
- পার্থিব জীবনকে নির্বাচনের পরিণতি

ভূমিকাঃ

বুদ্ধিবৃত্তিক ও উদ্ধৃতিগত পথে পরজগতের যে পরিচয় আমরা লাভ করেছি, তার মাধ্যমে পৃথিবী ও আখেরাতকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনা করতে পারি। সৌভাগ্যবশতঃ এ ধরনের তুলনা স্বয়ং পবিত্র কোরানেও সংঘটিত হয়েছে এবং আমরা কোরানের উদ্ধৃতির মাধ্যমে পার্থিব জীবন এবং পরকালীন জীবনের সঠিক মূল্যায়ন করতঃ পরকালীন জীবনের শ্রেষ্ঠত্বকে উপস্থাপন করতে পারি ।

নশ্বর পৃথিবী ও অবিনশ্বর আখেরাত ঃ

পৃথিবী ও আখেরাতের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল ঃ পৃথিবীর আয়ুষ্কালের সীমাবদ্ধতা ও আখেরাতের চিরন্তনতা। এ পৃথিবীতে সকল মানুষেরই জীবনকালের পরিসমাপ্তি বিদ্যমান যা অতিসত্বর বা অনতিসত্বর ঘটে থাকবেই। এমনকি যদি কেউ শতসহস্র কালও এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, তবে অবশেষে এ প্রাকৃতিক বিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি অর্থাৎ যখন (نفخ صور اول) প্রথম ফুৎকার ধ্বনিত হবে, তখনই তার জীবনাবসান ঘটবে, যেমনটি আমরা পূর্ববর্তী পাঠসমূহে জানতে পেরেছি। অপরদিকে কোরানের প্রায় অষ্টাদশ সংখ্যক আয়াত আখেরাতের চিরন্তনতা ও অবিনশ্বরতার প্রমাণ বহন করে।[১] আর এটা সুস্পষ্ট যে, যা নশ্বর তা যত সুদীর্ঘকালই থাকুক না কেন, অবিনশ্বরের সাথে তার কোন তুলনা হতে পারে না ।

অতএব পরজগত অমরত্ব ও চলিষ্ণুতার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর উপর এক বিরাট শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এই বিষয়টিই পবিত্র কোরানের একাধিক আয়াতে পরকালের আবকা (ابقي) অর্থে উল্লেখিত হয়েছে। [২] এছাড়া পৃথিবীর কালিল (قليل) অর্থাৎ অতি সামান্য হওয়ার কথাও স্মরণ করা হয়েছে। [৩] অপর কিছু আয়াতে পার্থিব জীবনকে ঐ সকল উদ্ভিদের সাথে তুলনা করা হয়েছে,

---

১। বেহেশ্‌ত ও দোযখের চিরন্তনতা সম্পর্কিত আয়াত দ্রষ্টব্য ।

২। কাহাফ-৪৬, মারিয়াম-৭৬, তোহা-৭১,১৩১, কাসাস-৬০, শুরা-৩৬, গাফির-৩৯, আ'লা-১৭।

৩। আলে ইমরান -১৯৭, নিসা- ৭৭, তওবাহ - ৩৮, নাহল -১১৭।

যেগুলো কেবলমাত্র অতিক্ষুদ্র সময়ের জন্যে সবুজ ও মনোরম হয়, অতপর হলুদাভ ও বিবর্ণরূপ ধারণ করে এবং অবশেষে শুষ্ক ও লীন হয়ে যায়।* এছাড়া একটি আয়াতে সামগ্রিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

ما عندكم ينفد و ما عند الله باق

তোমাদের নিকট যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর নিকট যা আছে তা স্থায়ী। (নাহল – ৯৬)

আখেরাতের আযাব থেকে নেয়ামতের পৃথকীকরণ ঃ

পার্থিব জীবন ও পরকালীন জীবনের মধ্যে অপর মৌলিক পার্থক্যটি হল ঃ পার্থিব সুখ–সমৃদ্ধি কষ্ট ও ক্লেশমিশ্রিত এবং এমনটি নয় যে, এক শ্রেণীর মানুষ সর্বদা সর্বাবস্থায় নেয়ামতের অধিকারী হবে এবং সদানন্দ বিহারে জীবনাতিবাহিত করবে ; আর অপর একশ্রেণীর মানুষ সর্বদা কষ্টক্লিষ্ট জীবন যাপন করবে; বরং সকলেই একদিকে যেমন কমবেশী আনন্দ ও ভোগ-বিলাসের অধিকারী অপরদিকে তেমনি কষ্ট, ক্লেশ ও উদ্বেগেরও অধিকারী। কিন্তু পরজগৎ দু'টি স্বতন্ত্র (বেহেশত ও দোযখ) ভাগে বিভক্ত। একাংশে কষ্ট-ক্লেশ ও ভয়-ভীতির লেশমাত্র নেই। আর অপরাংশে ব্যথা, বেদনা, অগ্নিযন্ত্রনা, ভয়-ভীতি ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্বনেই। স্বভাবতঃই আখেরাতের ভোগ-বিলাসে ও কষ্ট-ক্লেশ পৃথিবীর তুলনায় চুড়ান্ত মাত্রায় পরিলক্ষিত হবে।

এধরনের মূল্যায়নও পবিত্র কোরানে উদ্ধৃত হয়েছে। আর পরকালীন নেয়ামত এবং প্রভুর সান্নিধ্য ও নৈকট্যের শ্রেষ্ঠত্ব, পার্থিব নেয়ামতের তুলনায় অধিক গুরুত্ব পেয়েছে;[১] যেমনকরে পরকালীন আযাব ও কষ্ট-ক্লেশ, পার্থিব কষ্ট-ক্লেশের চেয়ে অধিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[২]

---

* ইউনুস – ২৪, কাহ্ফ – ৪৫,৪৬, হাদীদ –২০।

১। আলে ইমরান–১৫, নিসা–৭৭, আনআম–৩২, আ'রাফ–৩২, ইউসুফ–১০৯, নাহাল–৩০, ইসরা–২১, কাহ্ফ–৪৬, মারিয়াম–৭৬, তোহা–৭৩, ১৩১, কাসাস–৬০, শুরা–৩৬, আ'লা–১৭।

২। রা'দ–৩৪, তাহা–১২৭, সেজদাহ–২১, যুমার–২৬, ফুছ্ছিলাত–১৬, কালাম–৩৩, গাশিয়াহ–২৪।

আখেরাতই মূল ঃ

পৃথিবী ও আখেরাতের মধ্যে অপর গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি হল ঃ পার্থিব জীবন, আখেরাতের সূচনাস্বরূপ এবং অনন্তসৌভাগ্য লাভের মাধ্যম। আর পরকালীন জীবনই হল চূড়ান্ত ও মূল জীবন, যদিও পার্থিব জীবন ও এতে বিদ্যমান বস্তুগত ও অবস্তুগত নেয়ামতসমূহ মানুষের জন্যে জরুরী, কিন্তু যেহেতু এর সবগুলোই হল পরীক্ষাস্বরূপ এবং সত্যিকারের উৎকর্ষ ও অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যম, তাই এর কোন মৌলিকত্ব নেই। পার্থিব নেয়ামতসমূহের প্রকৃত মূল্যমান ঐ সকল রসদের উপর নির্ভরশীল, যেগুলো কোন ব্যক্তি অনন্ত জীবনের জন্যে সংগ্রহ করে থাকে। [১]

অতএব, যদি কেউ পরকালীন জীবনকে বিস্মৃত হয় এবং পার্থিব রূপ-যৌলুসের উপরই আপন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, কিংবা এ জীবনের ভোগ-বিলাসকেই চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করে তবে সে এর প্রকৃত মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছে এবং এর জন্যে ভ্রান্ত মূল্যমান নির্ধারণ করেছে। কারণ সে মাধ্যমকেই চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে চিহ্নিত করেছে। আর এ ধরনের কর্মের অর্থ ক্রীড়া-কৌতুক ও প্রতারিত হওয়া বৈ কিছুই নয়। এ কারণেই পবিত্র কোরান পার্থিব জীবনকে ক্রীড়া-কৌতুক ও প্রতরণার মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে [২] এবং পরকালীন জীবনকে প্রকৃত জীবন বলে গণনা করেছে।[৩] কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর প্রতি যে সকল ভর্ৎসনা নিক্ষিপ্ত হয়েছে তার অধিকাংশই হল দুনিয়া পূজারী মানুষেরই এক ধরনের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির ফল। নতুবা পার্থিব জীবন আল্লাহর যোগ্য মানুষ যারা এর বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত এবং একে মাধ্যমে হিসেবে গণনা করেন ও স্বীয় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অনন্তসৌভাগ্য অর্জনের পথে নিয়োগ করেন, তারা এ পার্থিব জীবনকে ভর্ৎসনাতো করেনই না বরং এর জন্যে অভূতপূর্ব মূল্যমান নির্ধারণ করে থাকেন।

১। কাসাস- ৭৭।
২। আলে ইমরান-১৮৫, আনকাবুত- ৬৪, মুহাম্মদ- ৩৬, হাদীদ-২০।
৩। আনকাবূত-৬৪, ফাজর- ২৪।

পার্থিব জীবনকে নির্বাচনের পরিণতি ঃ

পরকালীন জীবনের বিশেষত্ব ও পার্থিব ভোগ-বিলাসের উপর স্বর্গীয় নেয়ামতসমূহের অবর্ণনীয় শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রভুর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্যের কথা বিবেচনা করলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পরকালীন জীবনের পরিবর্তে পার্থিব জীবনকে নির্বাচন করা কখনোই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।[১] আর এর ফলশ্রুতি দুর্ভোগ ও দুঃখ ব্যতীত কিছুই নয়। কিন্তু এ ধরনের নির্বাচনের কদর্যতা ও অসারতা তখনই অধিকতর প্রকাশ লাভ করে যখন জানব যে, পৃথিবী ও এর ভোগ-বিলাসের প্রতি আকর্ষণ, কেবলমাত্র অনন্ত সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ারই কারণ নয় বরং চিরন্তন দুর্ভোগেরও গুরুতর কারণ।

এর ব্যাখ্যা এরূপ ঃ যদি মানুষ অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধির পরিবর্তে দ্রুত অপসৃয়মান পার্থিব ভোগ-বিলসকে এমনভাবে নির্বাচন করতে পারত যে, চিরন্তন জীবনের জন্যে এর কোন বিরূপ প্রভাব থাকবে না, তারপরও পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধির সীমাহীন অগ্রাধিকারের কথা বিবেচনা করলে এ ধরনের কর্ম, নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করত। তদুপরি অনন্ত জীবন থেকে কেউই পলায়ন করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনের জন্যেই তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এবং পরকালীন জগৎকে ভুলে গিয়েছে কিংবা অস্বীকার করেছে, তবে সে কেবল স্বর্গীয় বৈভব থেকেই বঞ্চিত হবে না বরং চিরকালের জন্যে সে নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে এবং অধিকমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[২]

এ কারণে পবিত্র কোরান একদিকে পরকালীন নেয়ামতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে এবং সতর্ক করে দেয়, যাতে পার্থিব জীবন তাকে প্রতারিত না করতে পারে।[৩] আবার অপরদিকে পৃথিবীর প্রতি আসক্তি ও আখোরাতকে ভুলে যাওয়া কিংবা অস্বীকার করা অথবা এ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার নির্মম পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে এবং সতর্ক করে দেয় যে, এহেন কর্ম চিরন্তন দুর্দশা ও দুর্ভোগের কারণ হয়ে থাকে।[৪] আর এমনটি নয় যে,

---

১। আ'লা (১৬-১৭)

২। হুদ-২২, কাহ্ফ ১০৪-১০৫, নামল ৪-৫।

৩। বাক্কারা-১০২,২০০, তওবাহ-৩৮, রূম-৩৩, ফাতির-৫, শুরা-২০ যুখরূফ (৩৪-৩৫)

৪। ইসরা-১০, বাকারা-৮৬, আনয়াম-১৩০, ইউনুস-৭-৮, হূদ-১৫-১৬ ইব্রাহীম-৩, নাহল-২২,১০৭ মু'মিনূন-৭৪, নামল-৪-৫,৬৬, রূম-৭,১৬, লুকমান-৪, সাবা-৮,২১, যুমার-৪৫, ফুছ্ছিলাত-৭, নাযিয়াত ৩৮-৩৯।

পৃথিবীকে নির্বাচনকারী পরকালীন পুরস্কার থেকেই কেবলমাত্র বঞ্চিত হবে বরং এ ছাড়াও সে অনন্ত শাস্তিতেও পতিত হবে।

এর নিগূঢ় তথ্য হল এখানে ঃ দুনিয়াপূজারী, মহান আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতাসমূহকে বিনষ্ট করেছে। আর যে বৃক্ষ অনন্তসৌভাগ্যের ফলধারণ ক্ষমতাকে শুষ্ক ও নিষ্ফল করে ফেলেছে এবং প্রকৃত বৈভবদাতার অধিকারকে (আল্লাহর উপাসনা) ক্ষুণ্ন করেছে, তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতকে তাঁরই অসন্তুষ্টির পথে ব্যয় করেছে, এহেন ব্যক্তিই যখন তার মন্দ ও ভ্রান্ত মনোনের ফল দেখতে পাবে, তখন এ প্রত্যাশ্য করবে যে, হায় যদি মৃত্তিকা হতাম! তবে এ নির্মম পরিণতির শিকার হতাম না[১]।

[১]। নাবা-৪০।

পাঠ – ১২

দুনিয়া ও আখেরাতের সম্পর্ক

- ভূমিকা
- দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র
- পার্থিব বৈভবসমূহ পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধির কারণ নয়
- পার্থিব বৈভবসমূহ পরকালীন দুর্দশার কারণও নয়
- উপসংহার

ভূমিকা ঃ

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, মানুষের জীবন কেবলমাত্র দ্রুত অপসৃয়মান এ পার্থিব জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং পুনরায় পরকালে জীবন লাভ করবে এবং চিরকাল সেথায় বেঁচে থাকবে। অনুরূপ জানতে পেরেছি যে, পরকালীন জীবনই হল প্রকৃত ও সত্যিকারের জীবন। মূলতঃ পার্থিব জীবন এদিক থেকে পরকালীন জীবনের তুলনায় জীবন নামকরণেরই অযোগ্য। এমন নয় যে, পরকালীন জীবনের অর্থ ভাল বা মন্দ নাম অথবা কাল্পনিক বিষয় বা কোন সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত বিষয়।

এখন পার্থিব ও পরকালীন জীবনের মধ্যে তুলনা ও এতদুভয়ের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারণের পালা এসেছে। তবে পূর্ববর্তী পাঠসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কের প্রকৃতি কিছুটা হলেও প্রতীয়মান হয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান নানাবিধ বক্রচিন্তার কথা বিবেচনা করে এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা প্রয়োজন মনে করছি। আর বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলসমূহ ও কোরানের বক্তব্যসমূহের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান, তা পরিষ্কার হওয়া জরুরী ।

দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র ঃ

এখানে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে, তা হল ঃ পরকালীন জীবনের সুঃখ, দুঃখ পৃথিবীতে মানুষের আচার-ব্যবহারের অনুগামী। এমনটি নয় যে, পরকালীন বৈভব অর্জনের জন্যে ঐ জগতেই চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করতে হবে এবং যারা অধিক দৈহিক শক্তি ও তীক্ষ্ণচিন্তার অধিকারী, তারা অধিক নেয়ামত ভোগ করতে পারবেন অথবা কেউ কেউ প্রতারণার মাধ্যমে অপরের অর্জিত বৈভব অপব্যবহার করতে পারবেন; যেমনটি কোন কোন নির্বোধ ব্যক্তি ধারণা করে এবং পরজগৎকে পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করে।

পবিত্র কোরানের ভাষায় কোন কোন কাফেরের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে ঃ

وما اظنّ السّاعة قائمة و لئن رددت الى ربّى لا جدنّ خيرا منها منقلبا

(দুনিয়াপূজারী ব্যক্তি বলল) আমি মনে করি না যে, ক্বিয়ামত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই, তবে আমি তো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব। (কাহ্ফ-৩৬)

অন্য এক প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

وما اظنّ السّاعة قائمة ولئن رجعت الى ربىّ انّ لى عنده للحسنى

আমি মনি করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতি পালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হই–ও, তার নিকট তো আমার জন্যে কল্যাণই থাকবে। (ফুস্‌সিলাত-৫০)

এ ধরনের ব্যক্তিরা মনে করেছেন যে, পরকালীন জীবনেও পৃথিবীর মতই স্বীয় চেষ্টায় অসংখ্য নেয়ামতের অধিকারী হতে পারবেন অথবা ধারণা করেছেন যে, এ পার্থিব জীবনে সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হওয়া, তার প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন, সুতরাং পরকালেও এ ধরনের অনুগ্রহেরই অধিকারী হবেন !

যা হোক যদি কেউ পরকালীন জগৎকে পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন জগতরূপে বিবেচনা করে থাকেন এবং পৃথিবীতে যে সুকর্ম ও দুষ্কর্ম সম্পাদন করেছেন আখেরাতের নেয়ামত ও শাস্তির জন্যে এর কোন প্রভাব আছে বলে মনে না করেন তবে যে পরকাল সকল ঐশী ধর্মেরই মৌলিক বিশ্বাস, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেননি। কারণ এ মূলনীতিটি পার্থিব জগতে সম্পাদিত কর্মের পুরস্কার ও শাস্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই পৃথিবীকে আখেরাতের বাজার বা আখেরাতের শস্যক্ষেত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং এখানে শ্রম দিতে হবে, বীজ বপন করতে হবে, প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং ফসল ও সম্পদ পরজগতে লাভ করতে হবে।[১] পুনরুত্থানের স্বপক্ষে উপস্থাপিত দলিলের দাবী এবং কোরানের বক্তব্যও তা–ই, যার জন্যে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

১। স্মরণ রাখতে হবে যে, পবিত্র কোরানে পার্থিব পুরস্কার ও শাস্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পরিপূর্ণ ও অশেষ পুরস্কার ও শাস্তি কেবলমাত্র আখেরাতের জন্যেই নির্ধারিত ।

পার্থিব বৈভবসমূহ পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধির কারণ নয় ঃ

কেউ কেউ মনে করেন যে, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি ও অন্যান্য পার্থিব আরাম, আয়াশের উপকরণ, আখেরাতেও সুখ-সমৃদ্ধির কারণ হবে এবং সম্ভবতঃ মৃতদের সাথে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান পাথরসমূহ, এমনকি খাদ্যসমাগ্রী সমাধিস্থকরণের ব্যাপারটি এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা থেকেই উৎসারিত।

পবিত্র কোরান গুরুত্বারোপ করে যে, ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি স্বয়ং (তাদের কাজ-কর্ম বিবেচনা না করে) মহান আল্লাহর নৈকট্যের কারণ হবে না, [১] বা পরকালে কাউকে লাভবান করবে না।[২] মূলতঃ এ ধরনের পার্থিব সম্পর্ক ও উপকরণ পরকালে ছিন্ন ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে [৩] প্রত্যেকেই স্বীয় ধন-সম্পদ ত্যাগ করবে[৪] এবং সম্পূর্ণ একাকীই মহান আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে।[৫] কেবলমাত্র আত্মিক ও ঐশি সম্পর্কই প্রতিষ্ঠিত থাকবে । সুতরাং যে সকল মু'মিন তাদের স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ঈমানী সম্পর্ক স্থাপন করে থাকেন, তারা বেহেশ্‌তে একত্রে বসবাস করবেন [৬]।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, পৃথিবী ও আখেরাতের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক পার্থিব বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের মত নয় এবং এমনটি নয় যে, যে কেউ পৃথিবীতে ক্ষমতা ও শক্তিধর, সুন্দর, প্রফুল্ল, ভাগ্যবান ও অনন্দচিত্তের অধিকারী, তিনি পরকালে ও সেরকমই পরিগণিত হবেন। নতুবা ফেরাউন ও কারুনরা অধিকতর পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হত। বরং যারা পৃথিবীতে অক্ষম, দরিদ্র,কষ্ট-ক্লীষ্ট জীবন-যাপন করেন কিন্তু প্রভুর প্রতি সকল দায়িত্ত্ব সম্পাদন করেন, তারা পরকালে সবল, সুন্দর, সক্ষম বলে পরিগণিত হবেন এবং অনন্ত বৈভবের অধিকারী হবেন।

১। সাবা- ৩৭।
২। শুয়ারা-৮৮, লুকমান -৩৩, আল ইমরান-১০,১১৬, মুজাদিলাহ-৯৭।
৩। বাক্বারা-১৬৬, মু'মিনুন-১০১।
৪। আনআম-৯৪।
৫। মারিয়াম-৮০, ৯৫।
৬। রা'দ- ২৩, গাফির-৮, তূর-২১।

ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى و اضلّ سبيلا

আর যে ব্যক্তি এখানে অন্ধ, সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট। (ইসরা-৭২)

কোন কোন ব্যক্তি ধারণা করেছেন ঃ উপরোল্লিখিত আয়াতটি দলিল প্রদর্শন করে যে, পার্থিব সুস্থতা ও সৌভাগ্য পরকালীন সুস্থতা ও সৌভাগ্যের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছেন যে, উপরোক্ত আয়াতে অন্ধত্বের মানে বাহ্যিক চক্ষুর অন্ধত্ব নয় বরং এর অর্থ হল অন্তরচক্ষুর অন্ধত্ব। যেমন ঃ অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فانّها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى في الصّدور

বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। (হাজ্জ-৪৬)

অপর এক স্থানে এসেছে ঃ

ومن اعرض عن ذكرى..............وكذلك اليوم تنسى

যে আমার স্মরণে বিমুখ তাহার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান। তিনি বলবেন, 'এরূপই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে। (তোহা- ১২৪-১২৬)

অতএব পরকালে অন্ধত্বের কারণ হল, ইহকালে মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে বিস্মৃত হওয়া, বাহ্যিকচক্ষুর অন্ধত্ব নয়। সুতরাং ইহ ও পরকালের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক, কারণ ও কার্যের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের মত নয়।

পার্থিব বৈভবসমূহ পরকালীন দুর্দশার কারণও নয় ঃ

অপরদিকে কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, পার্থিব বৈভব ও পরকালীন বৈভবের মধ্যে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক বিদ্যমান এবং তারাই পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হবেন, যারা পার্থিব বৈভব থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বিপরীতক্রমে যারা পার্থিব নেয়ামতসমূহের অধিকারী, তারা পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত

হবেন। প্রাগুক্ত ধারণাপোষণকারীরা ঐ সকল আয়াতের শরণাপন্ন হয়েছেন, যেগুলো এ যুক্তি প্রদর্শন করে যে, দুনিয়াপূজারীরা পরকালীন সুখ-সম্মৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হবে।[১] তারা ভুলে গিয়েছেন যে, দুনিয়াপূজারী হওয়া আর পার্থিব নেয়ামতের অধিকারী হওয়া সমান কথা নয়। বরং দুনিয়াপূজারী সে-ই, যে পার্থিব ভোগ-বিলাসকে স্বীয় প্রচেষ্টার লক্ষ্যরূপে স্থির করেছে এবং এগুলো লাভ করার জন্যেই সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে। যদিও নিজের চাওয়া-পাওয়া ও লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়ে থাকে। অপরদিকে পরকালপিয়াসু হলেন তিনিই, পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি যার হৃদয় লালায়িত নয় এবং তার লক্ষ্য হল পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধি, যদিও ইহকালে প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে থাকেন। যেমনঃ হযরত সুলাইমান (আঃ), আল্লাহর অনেক ওলী ও নবীগণ (আঃ) পার্থিব প্রাচুর্য ও নেয়ামতের অধিকারী ছিলেন কিন্তু এগুলোকে পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধি ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে ব্যয় করেছেন।

অতএব পার্থিব বৈভব থেকে লাভবান হওয়া ও পরকালীন বৈভব থেকে ভোগ করার মধ্যে যেমনি কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, তেমনি কোন ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক ও নেই। বরং পার্থিব সৌভাগ্য ও সুখ-সমৃদ্ধি এবং দুঃখ-দুর্দশা উভয়ই প্রভুর প্রজ্ঞার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে[২] আর এগুলোর সবকিছুই হল তাঁর পরীক্ষার উপকরণ[৩]।

সুতরাং পার্থিব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত বা লাভবান হওয়া, স্বয়ংক্রিয় ভাবে প্রভুর নৈকট্য বা প্রভুর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়া অথবা পরকালীন সৌভাগ্য বা দুর্ভাগের কোন নিদর্শন নয়।[৪]

উপসংহার ঃ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, পৃথিবী ও আখেরাতের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার সম্পর্ককে অস্বীকার করার

---

[১]। বাকারা-২০০, আল ইমরান-৭৭, ইসরা-১৮, শুরা-২০, আহকাফ-২০।

[২]। যুখরুফা-৩২।

[৩]। আনফাল-২৮, আম্বিয়া-৩৫, তাগবুন-১৫, আরাফ-১৬৮, কাহাফ-৭, মায়িদাহ-৪৮, আনআম-১৬৫, নামল-৪০, আলে ইমরান-১৮৬।

[৪]। আলে ইমরান- ১৭৯, মু'মিনূন- ৫৬, ফাজর (১৫-১৬)।

অর্থ হল পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা । অথচ পার্থিব নেয়ামত ও পরকালীন নেয়ামতের মধ্যে যেমন কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি পার্থিব নেয়ামত ও পরকালীন শাস্তির মধ্যেও কোন সম্পর্ক নেই, অনুরূপ এর বিপরীত ক্ষেত্রেও। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, পৃথিবী ও পরজগতের সম্পর্ক, পার্থিব বিষয়বস্তুসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের মত নয় কিংবা এ সম্পর্ক পদার্থ ও জীববিদ্যার কোন নিয়ম-কানুনের মধ্যেও পড়ে না। বরং যা পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধি অথবা শাস্তির কারণ, তা হল ঃ পৃথিবীতে মানুষের স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ড। তা-ও কেবলমাত্র শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় এবং বস্তুগত পরিবর্তন সংঘটনের দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং তা, ঈমান ও কুফ্রের দৃষ্টিকোণথেকে উৎসারিত হয়। আর এ কারণেই পবিত্র কোরানে পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধিকে, মহান আল্লাহর প্রতি, পুনরুত্থান দিবসের প্রতি ও নবীগণের (আঃ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং আল্লাহর তুষ্টিযুক্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে গণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ নামাজ, রোজা, জিহাদ, আল্লাহর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দান, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ অত্যাচারী কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি হল মহান আল্লাহর পছন্দনীয় কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে পরকালীন অনন্ত আযাব বা শাস্তি ভোগের কারণ হল কুফর, শিরক, অন্যায়কর্ম সম্পাদন, ক্বিয়ামত ও নবীগণকে অস্বীকার করা এবং বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি। এ ছাড়া অসংখ্য আয়াতে সামগ্রীকভাবে পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধির কারণরূপে বিশ্বাস ও সৎকর্ম সম্পাদন"[১] এবং দুর্দশার কারণরূপে "কুফর ও পাপাচারের" [২] কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১। বাকারা- ২৫, ৩৮, ৬২, ৮২, ১০৩, ১১২, ২৭৭, আলে ইমরান-১৫, ৫৭, ১১৪-১১৫, ১৩৩, ১৭৯, ১৯৫, ১৯৮, নিসা-১৩, ৫৭, ১২২, ১২৪, ১৪৬, ১৫২, ১৬২, ১৭৩, মায়িদাহ-৯, ৬৫, ৬৯, আনআম- ৪৮, তাওবাহ-৭২, ইউনুস- ৪, ৯, ৬৩, ৬৪, রা'দ- ২৯, ইব্রাহীম-২৩, নাহল- ৯৭, কাহ্ফ-২,২৯-৩০, ১০৭, তোহা-৭৫, হাজ্জ-১৪, ২৩, ৫০, ৫৬, ফুরকান-১৫, আনকাবূত- ৭, ৯, ৫৮, রূম-১৫, লুকমান-৮, সাজদাহ-১৯, সাবা-৪,৩৭, ফাতির-৭ সাদ- ৪৯, যুমার-২০, ৩৩- ৩৫, গাফির-৪০, ফুসসিলাত-৮, শুরা-২২,২৬, জাসিয়া-৩০, ফাতহ-১৭, হাদীদ-১২, ২১, তাগাবুন- ৯, তালাক- ১১, ইনশিকাক- ২৫, বুরূজ- ১১, তীন- ৬, বায়্যিনাহ (৭-৮)।

২। বাকারা- ২৪,৩৯, ৮১, ৮৬, ১০৪, ১৬১, ১৬২, আলে ইমরান- ২১, ৫৬, ৮৬- ৮৮, ৯১, ১১৬,১৩১, ১৭৬, ১৭৭, ১৯৬, ১৯৭, নিসা- ১৪, ৫৬, ১২১, ১৪৫, ১৫১, ১৬১, ১৬৮,১৬৯, ১৭৩, মায়িদাহ –১০, ৩৬, ৭২, ৮৬, আনআম-৪৯, তাওবাহ –৩, ৬৮, ইউনুস-৪, ৮ রা'দ- ৫, কাহ্ফ ১০৫-১০৬, হাজ্জ- ১৯, ৫৭, ৭২, ফুরকান- ১১, নামল-৪-৫, আনকাবুত- ২৩, সাদ- ৫৫, যুমার-৩২, গাফির-৬, শুরা- ২৬, জাসিয়া-১১, ফাতহ-১৩, ১৭ হাদীদ-১৯, মুজাদিলাহ-৫, তাগাবুন-১০, মুলক-৬, ইনশিকাক ২২-২৪, গাশিয়াহ ২৩-২৪, বায়্যিনাহ- ৬।

পাঠ - ১৩

ইহ ও পরকালের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি

- ভূমিকা
- বাস্তব সম্পর্ক না কি স্বীকৃতিমূলক সম্পর্ক ?
- কোরানের বক্তব্য

ভূমিকা ঃ

ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, একদিকে ঈমান ও সৎকর্ম এবং অপরদিকে প্রভুর সান্নিধ্য ও পরকালীন নেয়ামতসমূহের মধ্যে, প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। অনুরূপ একদিকে কুফর ও পাপাচার এবং অপরদিকে প্রভুর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া ও অনন্ত নেয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান । আবার ঈমান ও সৎকর্ম, পরকালীন শাস্তির সাথে এবং কুফর ও পাপাচার চিরস্থায়ী নেয়ামতসমূহের সাথে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক রক্ষা করে। এ সম্পর্কসমূহের মূলনীতি সম্পর্কে কোরানের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই এবং এগুলোকে অস্বীকার করার অর্থ হল কোরানকে অস্বীকার করার শামিল।

তবে এ জরুরী বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা হয়। ফলে এ সম্পর্কে আলোচনা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন। যেমনঃ বর্ণিত সম্পর্কগুলো কি বাস্তব ও সুনির্ধারিত সম্পর্ক, না কি কেবলমাত্র কল্পিত বা স্বীকৃত সম্পর্ক ? ঈমান ও সৎকর্ম এবং তদনুরূপ কুফর ও পাপাচারের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি ? স্বয়ং সৎকর্ম ও কুকর্ম পরস্পরের উপর কোন প্রভাব ফেলে কি ?

আলোচ্য পাঠে প্রথম প্রশ্নটির উপর আলোচনা করতঃ ব্যাখ্যা করব যে, উপরোল্লিখিত সম্পর্কসমূহ কোন কৃত্রিম ও স্বীকৃতিমূলক সম্পর্ক নয়।

বাস্তব সম্পর্ক না কি স্বীকৃতিমূলক সম্পর্ক ঃ

ইতিপূর্বে আমরা একাধিকবার আলোচনা করেছি যে, পার্থিব কর্মকান্ড ও পরকালীন নেয়ামত ও শাস্তির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক, বস্তুগত ও সাধারণ সম্পর্কের মত নয় এবং একে পদার্থগত, রাসায়নিক ইত্যাদি কোন নিয়মের আলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষন করা সম্ভব নয়। এমনকি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনে মানুষের যে শক্তি ব্যয় হয়, শক্তি ও বস্তুর নিত্যতা সূত্র মতে এরা পরস্পর পরিবর্তিত হয় এবং পরকালীন নেয়ামত ও শাস্তিরূপে প্রকাশ লাভ করে -এমনটি ধারণা করাও ঠিক নয় । কারণ ঃ

প্রথমতঃ একজন মানুষের কথা ও কর্মে ব্যবহৃত শক্তি সম্ভবতঃ এমন

পরিমাণেও হবে না যে, একটি আপেলের বীজে পরিবতির্ত হতে পারে, অগণিত বেহেশ্‌তী নেয়ামত তো দূরের কথা ।

দ্বিতীয়তঃ বস্তু ও শক্তির পরিবর্তন, বিশেষ কারণানুসারে সম্পন্ন হয় এবং সুকর্ম, দুষ্কর্ম ও কর্তার নিয়্যাতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এ ছাড়া কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতেই আন্তরিকতাপূর্ণ ও ভণ্ডামীপূর্ণ কর্মের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভাব নয়, যাতে করে বলা যাবে যে, কারো শক্তি নেয়ামতে, আবার কারও শক্তি শাস্তি বা আযাবে পরিণত হয়।

তৃতীয়তঃ যে শক্তি একবার ইবাদতের পথে ব্যয় হয়, অন্যবার সে শক্তি পাপাচারেও ব্যয় হতে পারে।

কিন্তু এ ধরনের সম্পর্ককে অগ্রাহ্য করার অর্থ চূড়ান্তরূপে বাস্তব সম্পর্ককে অস্বীকার করা নয়। কারণ অজ্ঞাত ও অভিজ্ঞতা বিবর্জিত সম্পর্কও বাস্তব সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যেমনিকরে পার্থিব ও পরকালীন বিষয়সমূহের সাথে কার্যকারণগত সম্পর্ককে প্রমাণ করতে অক্ষম, তেমনি এ গুলোর মধ্যে বিদ্যমান কার্য ও কারণগত সম্পর্ককে অস্বীকার করতেও অপারগ। অপরদিকে এরূপ ধারণা করা যে, সৎকর্ম ও দুষ্কর্ম মানুষের আত্মার উপর সত্যিকারের প্রভাব ফেলে এবং এ আত্মিক প্রভাবই পরকালীন নেয়ামত ও শাস্তি লাভের কারণ হয়, (যেমন ঃ পার্থিব অলৌকিক বিষয়ের উপর কোন কোন আত্মার প্রভাব) তবে তা অযৌক্তিক নয়। বরং বিশেষ দার্শনিক নীতির মাধ্যমে তা প্রমাণ করা সম্ভব। তবে এ গুলোর আলোচনা এ পুস্তকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কোরানের বক্তব্য ঃ

কোরানের বক্তব্যসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, আমাদের মস্তিষ্কে কৃত্রিম ও স্বীকৃত সম্পর্কেরই প্রতিফলন ঘটে। যেমন ঃ প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ [১]। কিন্তু অন্যান্য আয়াতের সাহায্য

১। পবিত্র কোরানে (اجر) কথাটি প্রায় ৯০ বার এবং (جزاء) ও এর পরিবাবের সদস্যদের কথা শতাধিকবার এসেছে ।

নিয়ে বলা যায় যে, মানুষের কর্মকাণ্ড ও পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক স্বীকৃত সম্পর্কের উর্ধ্বে। অতএব আমরা বলতে পারি যে, প্রথম শ্রেণীর ব্যাখ্যা সহজবোধ্য এবং যেখানে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে, যাদের মস্তিষ্ক এ ধরনের অর্থ বা তাৎপর্যের সাথে পরিচিত।

অনুরূপ হাদীস শরীফেও এমন অসংখ্য সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে যে, মানুষের স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডসমূহ একাধিক মালাকুতী রূপ পরিগ্রহ করে, যে গুলো বারযাখে ও কিয়ামতে প্রকাশ লাভ করবে।

এখন আমরা যে সকল আয়াত, মানুষের কর্মকাণ্ডের সাথে পরকালীন প্রতিদানের বাস্তব সম্পর্কের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে, সেগুলো উপস্থাপন করব ঃ

وما تقدّموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله

তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু নিজেদের জন্যে প্রেরণ করবে আল্লাহর নিকট তা পাবে। (বাকারা-১১০) { এ ছাড়া সূরা মুযাম্মিল -২০ দ্রষ্টব্য }

يوم تجد كلّ نفس ما عملت من خير محضرا و ما عملت من سوء تودّ لو انّ بينها و بينه امدا بعيدا

যে দিন প্রত্যেকে, সে যে ভাল কাজ করেছে এবং সে যে মন্দ কাজ করেছে তা পাবে, সে দিন সে নিজের ও তার মধ্যে দূর ব্যবধান কামনা করবে। (আলে ইমরান–৩০)

يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه

সেই দিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে। (নাবা- ৪০)

فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرّا يره

কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে। যিলযাল (৭-৮)

هل تجزون الا ماكنتم تعملون

তোমরা যা করতে তার প্রতিফল ব্যতীত কিছুই তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে কি? (নামল- ৯০){ অনুরূপ কাসাস -৮৪ দ্রষ্টব্য }

انّ الذين يأكلون اموال اليتمى ظلما انّما يأكلون في بطونهم نارا

যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। (নিসা- ১০)

স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ পরকালে দেখবে যে, পৃথিবীতে কি কি কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছে, কেবলমাত্র তা-ই তাদের পুরস্কার ও শাস্তি নয়। বরং এগুলো হল মালাকুতি পাপসমূহ, যেগুলো বিভিন্ন নেয়ামত ও শাস্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করবে এবং ব্যক্তি ঐগুলোর মাধ্যমে নেয়ামত ও আযাব লাভ করবে। যেমন ঃ শেষোক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অনাথের সম্পদ ভক্ষণের অব্যক্ত রূপ হল অগ্নি ভক্ষণ করা এবং যখন অপর এক জগতে সকল বাস্তবতা ও সত্য আত্মপ্রকাশ করবে, তখন দেখতে পাবে যে, কোন হারাম খাবারের অব্যক্তরূপ ছিল অগ্নি। ফলে তখন অভ্যন্তরভাগে এর জ্বালা যন্ত্রণা সে অনুভব করবে এবং তাকে বলা হবে ঃ ওহে, এ অগুন সে হারাম সম্পদ ব্যতীত কিছু কি যা ভক্ষণ করেছিলে ?!

পাঠ – ১৪

অনন্ত সুখ ও দুঃখের ক্ষেত্রে ঈমান ও কুফরের ভূমিকা

- ভূমিকা
- ঈমান ও কুফরের বাস্তবরূপ
- ঈমান ও কুফরের পরিমাণ
- অনন্ত সুখ ও দুঃখের ক্ষেত্রে ঈমান ও কুফরের প্রভাব
- পবিত্র কোরানের বক্তব্য

ভূমিকা ঃ

অপর প্রশ্নগুলো হল এই যে, ঈমান ও সৎকর্ম উভয়েই কি অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধির পথে পরস্পর স্বতন্ত্র কোন নির্বাহী না কি সম্মিলিতভাবে অনন্তসৌভাগ্য ও সুখ-সম্মৃদ্ধির কারণ? অনুরূপ কুফর ও পাপাচারের প্রত্যেকটিই কি স্বতন্ত্রভাবে চিরন্তন শাস্তির কারণ না কি সম্মিলিতভাবে এ ধরনের প্রভাব ফেলে ? দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যদি কেউ কেবলমাত্র ঈমানের অধিকারী হয় অথবা সৎকর্ম সম্পন্ন করে থাকে, তবে তার বিচার কিরূপ হবে? তদনুরূপ যদি কেউ শুধুমাত্র কুফরি করে থাকে অথবা পাপাচারে লিপ্ত হয় তবে তার ভাগ্যে কি ঘটবে ? যদি কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি একাধিক পাপাচারে লিপ্ত হয় অথবা কোন অবিশ্বাসী ব্যক্তি একাধিক সুকর্ম সম্পাদন করে থাকে, তবে সে কি সৌভাগ্য বা সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হবে, না কি দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হবে ? উভয়ক্ষেত্রেই যদি কেউ স্বীয় জীবনের কিছু অংশ বিশ্বাস ও সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে এবং অপর কিছু অংশ কুফর ও পাপাচারের মাধ্যমে অতিবাহিত করে, তবে তার বিচার কি হবে ?

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম শতাব্দীতে আলোচ্য বিষয়ভুক্ত ছিল। খাওয়ারেজের মত কেউ কেউ বিশ্বাস করত যে, পাপাচারে লিপ্ত হওয়া অনন্ত দুঃখ-দুর্দশার জন্যে স্বাধীন নির্বাহী, যা অধিকন্তু কুফর ও ধর্ম ত্যাগের কারণও বটে। মুরজিয়াহ্‌দের মত অপর একদল বিশ্বাস করেছিলেন যে, অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে ঈমান থাকাই যথেষ্ট এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া বিশ্বাসীদের অনন্ত সৌভাগ্যের পথে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে না।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হল ঃ সকল পাপই কুফর ও অনন্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ নয়, যদিও পুঞ্জীভূত পাপ, ঈমান হরণের কারণ হতে পারে। অপরদিকে এমনটি নয় যে, ঈমানের উপস্থিতিতে সকল পাপ ক্ষমার্হ এবং কোন প্রকার অপপ্রভাব তাতে থাকবে না।

আমরা আলোচ্য পাঠে প্রথমেই ঈমান ও কুফরের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করব। অতঃপর অনন্ত সুখ ও দুঃখের পথে এগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করব এবং অপরাপর বিষয়গুলো সম্পর্কে পরবর্তী পাঠসমূহে বর্ণনা করব।

ঈমান ও কুফরের স্বরূপ ঃ

ঈমান হল অন্তর ও আত্মার এক বিশেষ অবস্থা, যা এক ভাবার্থ বা প্রবৃত্তি সম্পর্কে অবগত হওয়ার ফলে অর্জিত হয় এবং এতদুভয়ের প্রত্যেকটির তীব্রতা ও ক্ষীণতার কারণে আত্মা যথাক্রমে উৎকর্ষ বা বিকাশ ও অপূর্ণতা পরিগ্রহ করে। যদি মানুষ কোন কিছুর অস্তিত্ব (যদিও তা হয় আনুমানিক রূপে) সম্পর্কে অবগত না হয়ে থাকে, তবে সে এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। তবে ঐ বিষয় সম্পর্কে কেবলমাত্র জ্ঞান ও অবগতিই যথেষ্টে নয়। কারণ এমনও হতে পারে যে ঐ বিষয় ও এর অবিয়োজ্য বিষয়সমূহ তার হৃদয়গ্রাহী হবে না বরং তা তার প্রবনতার বিপরীত হবে; ফলে ঐ বিষয় সংশ্লিষ্ট বিষয় কার্যকর করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না এবং এমনকি এর পরিবর্তে বিপরীতধর্মী সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারে। যেমনঃ পবিত্র কোরান ফেরাউনিদের সম্পর্কে বলে ঃ

وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما و علوا

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এইগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (নামল-১৪)

এবং হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

لقد علمت ما انزل هؤلاء الا ربّ السموات والارض بصائر

তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে এইসমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। (ইসরা- ১০২)

যদিও ফেরাউন বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং সে মানুষকে বলত ঃ

ما علمت لكم من اله غيرى

আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলে জানিনা।(কাসাস-৩৮)

কেবলমাত্র যখন গভীর জলে নিমজ্জিত হচ্ছিল তখন বলেছিল ঃ

امنت انه لا اله الا الذى امنت به بنو اسرائيل

আমি বিশ্বাস করলাম যে বনী ইসরাঈল যাতে বিশ্বাস করে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। (ইউনুস- ৯০)

আমরা জানি যে, এ ধরনের জরুরী অবস্থার ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়

যদিও একে ঈমান নামকরণ করা যেতে পারে।

অতএব ঈমানের ভিত্তি বা আস্থা হল আন্তরিকতা ও স্বেচ্ছাপ্রবণতা, যা জ্ঞান ও অবগতির ব্যতিক্রম, যা অনিচ্ছাকৃতভাবেও অর্জিত হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমানকে এক স্বেচ্ছাধীন আন্তরিক কর্ম, বলে গণনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ 'কর্মকাণ্ডের' অর্থকে বিস্তৃত করতঃ ঈমানকেও কর্মকাণ্ডের, অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

অপরদিকে কুফর (كفر) শব্দটি কখনো কখনো বিশ্বাসের অস্থিতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এবং আস্থা বা বিশ্বাস না থাকার অর্থই হল কুফর, হোক তা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও নিরেট অজ্ঞতার ফলে কিংবা হোক তা যৌগিক অজ্ঞতার (مركب جهل) ফলে অথবা হোক তা নেতিবাচক প্রবণতার ফলে কিংবা হোক তা ইচ্ছাকৃতভাবে ও বৈরীতাবশতঃ অস্বীকারকরণের ফলে। এছাড়া কখনো কখনো শেষোক্ত প্রকারের কুফর অর্থাৎ হিংসা বিদ্বেষের মত বিদ্যমান বিষয় (امري وجودي) এবং ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীতার্থ বলে পরিগণিত হয়।

ঈমান ও কুফরের পরিমাণ ঃ

পবিত্র আয়াতসমষ্টি থেকে যা আমরা পাই, তার ভিত্তিতে বলা যায় পরকালীন অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে ন্যূনতম যতটুকু ঈমান থাকা প্রয়োজন তা হল ঃ মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি বিশ্বাস এবং যা কিছু মহান নবীগণের (আঃ) উপর নাযিল হয়েছে তাতে বিশ্বাস। আর এ বিশ্বাসসমূহের অপরিহার্য শর্ত হল মহান আল্লাহর আদেশানুসারে কর্ম সম্পাদনের সারসংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যার সর্বোচ্চ পর্যায় হল, মহান আল্লাহর আম্বিয়া ও আউলিয়ার (সালামুল্লাহ আলাইহীম আজমাইন) জন্যে নির্দিষ্ট।

অপরদিকে ন্যূনতম পর্যায়ের কুফর হল ঃ তাওহীদ নবুয়্যত ও মায়াদকে অস্বীকার করা বা এগুলো সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া অথবা এমন কিছুকে অস্বীকার করা, যার সম্পর্কে জানে যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর কুফরের নিকৃষ্টতম পর্যায় হল প্রতিহিংসাপরায়ণ বা অবাধ্য হয়ে এ সকল সত্যকে অস্বীকার করা, যদিও এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে সে অবগত এবং সত্যদ্বীনের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

এভাবে শিরক (বা তাওহীদের অস্বীকৃতি) কুফরেরই একটি দৃষ্টান্ত। আর নেফাক বা কপটতা হল অব্যক্ত কুফর, যা বাহ্যিক ইসলামের আড়ালে প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়। আর মুনাফিকদের (অপ্রকাশিত কাফের) পরিণতি অন্যান্য কাফের অপেক্ষা ভয়ংকর হবে। যেমনটি পবিত্র কোরানে বিবৃত হয়েছে ঃ

انّ المنافقين في الدّرك الاسفل من النّار

মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্ন স্তরে থাকবে। (নিসা- ১৪৫)

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, ফিকাহশাস্ত্রে যে কুফর ও ইসলামের কথা বর্ণনা করা হয় এবং যা তাহারাত (طهارت) , কুরবানীর বৈধতা, বিবাহ ও সম্পদের উত্তরাধিকারের বৈধতা বা অবৈধতার মত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আহকামের উদ্দেশ্য (موضوع) রূপে পরিগণিত হয়, তার সাথে দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহের আলোচ্য ঈমান ও কুফরের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ কেউ হয়ত শাহাদাতাইন (আল্লাহ ও তার রাসূলের (সঃ) প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করে) বলতে পারে এবং ইসলামের হুকুম-আহকাম তার জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে, যদিও আন্তরিক ভাবে তাওহীদ ও নবুয়্যত সংক্রান্ত বিষয়গুলোর প্রতি সে কোন আস্থাই স্থাপন করেনি।

অপর বিষয়টি হল, যদি কেউ দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোকে শনাক্তকরণে অক্ষম, যেমন ঃ উন্মাদ, নির্বোধ অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে সত্য দ্বীনকে চিনতে পারেনি, তবে সে তার অপরাধের পরিমাণে ক্ষমা পাবে। কিন্তু যদি কেউ পারঙ্গমতা সত্ত্বেও অবহেলা করতঃ দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায়ই থাকে, অথবা কোন প্রকার যুক্তি ব্যতীতই দ্বীনের জরুরী বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে থাকে, তবে সে ক্ষমা পাবে না এবং অনন্ত শাস্তিতে পতিত হবে।

অনন্ত সুখ ও দুঃখের ক্ষেত্রে ঈমান ও কুফরের প্রভাব ঃ

'মানুষের প্রকৃত উৎকর্ষ বা কামাল, প্রভুর সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে বাস্তবরূপ লাভ করে এবং বিপরীতক্রমে মানুষের অধঃপতন, মহান আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয় –এর আলোকে মহান আল্লাহ ও তাঁর সুনির্ধারিত ও বিধিগত প্রতিপালণত্বের উপর আস্থাপ্রকাশ, যা পুনরুত্থান ও নবুয়্যতের প্রতি বিশ্বাসের জন্যে জরুরী, তাকে মানুষের প্রকৃত উৎকর্ষ সাধনের

জন্যে বৃক্ষস্বরূপ মনে করা যেতে পারে, যার পত্র-পল্লব হল মহান আল্লাহর পছন্দনীয় কর্মসমূহ; আর চিরন্তন সুখ-সমৃদ্ধি হল ফলস্বরূপ, যা পরকালে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে। অতএব যদি কেউ ঈমানের বীজ স্বীয় অন্তরাত্মায় বপন না করে কিংবা এ কল্যাণময় বৃক্ষকে রোপণ না করে এবং এর পরিবর্তে কুফর ও পাপাচারের বিষবৃক্ষ স্বীয় অন্তরাত্মায় বপন করে থাকে, তবে সে প্রভু প্রদত্ত যোগ্যতাকে বিনষ্ট করেছে এবং এমন এক বৃক্ষের সেবা সে করেছে, যার ফল হল নারকীয় যাক্কুম। আর এ ধরনের ব্যক্তি অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধির পথে বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হয়নি এবং তার সুকর্মের প্রভাব পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করতে পারবে না।

আর এর গূঢ় রহস্য হল ঃ সকল স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মই চূড়ান্ত লক্ষ্যের পথে বা ঈপ্সিত লক্ষ্যের পথে, যা কর্তা নিজের জন্যে নির্ধারণ করেছে, তার জন্যে মানুষের গতিস্বরূপ। যদি কেউ অনন্ত জীবন ও আল্লাহর নৈকট্যের প্রতি আস্থা না রাখে, তবে এ ধরনের কোন ব্যক্তি কিরূপে বর্ণিত লক্ষ্যকে নিজের জন্যে স্থির করতে পারবে ? স্বভাবতঃই এরূপ ব্যক্তিরা মহান আল্লাহর নিকট পুরস্কারের আশা করতে পারে না। তবে কাফেরদের সুকর্মের সর্বোচ্চ প্রভাব শুধু এতটুকুই যে, তাদের শাস্তি কিছুটা হ্রাস করা হবে। কারণ এ ধরনের কর্মের মাধ্যমে আত্মপূজা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতার মাত্রা কিছুটা দুর্বল হয়ে থাকে।

পবিত্র কোরানের বক্তব্য ঃ

পবিত্র কোরান একদিকে মানুষের অনন্ত সৌভাগ্যের পথে ঈমানের মূল ভূমিকার কথা বর্ণনা করে। কয়েকদশক আয়াতে সৎকর্মকে ঈমানের পরপরই উদ্ধৃতকরণ ব্যতীত ও একাধিক আয়াতে অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধির পথে সৎকর্মসমূহের প্রভাবের জন্যে ঈমানকে পূর্ব শর্তরূপে গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছে । যেমন ঃ

ومن يعمل من الصالحات من ذكر اوانثى و هو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة.........

পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজ করলে ও মু'মিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে ... ... (নিসা- ১২৪) [এ ছাড়া নাহল- ৯৭, ইসরা- ১৯, তোহা- ১১২, আম্বিয়া-৯৪, গাফির- ৪০ দ্রষ্টব্য]

অপরদিকে দোযখ ও অনন্তশাস্তিকে কাফেরদের জন্যে নির্ধারণ করেছে এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে অহেতুক, অনর্থক ও নিষ্ফল বলে গণনা করেছে। অন্য এক স্থানে তাদেরকে এমন ছাই-ভস্মের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, তীব্র বাতাস ঐগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং কোথাও এগুলোর উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া যায় না । কোরানের ভাষায় ঃ

مثل الّذين كفروا بربّهم اعمالهم كرماد اشتدّت به الرّيح في يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على شيء ذلك هو الضّلال البعيد

যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের উপমা হল, তাদের কর্মসমূহ ভস্ম সদৃশ যা ঝড়ের দিনে প্রচণ্ড বাতাসের বেগে উড়ে চলে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তাদের কাজে লাগাতে পারে না। এটা তো ঘোর বিভ্রান্তি। (ইব্রাহীম-১৮)

অপর এক স্থানে বলা হয় ঃ কাফেরদের কর্মকাণ্ডকে ঘূর্ণবাতের মত ছড়িয়ে দিব।

وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করব। (ফুরকান-২৩)

অপর এক আয়াতে কাফেরদের কর্মকাণ্ডকে সেই মরীচিকার সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি তার দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু সেখানে যখন পৌঁছে কোন পানিরই অস্তিত্ব খুঁজে পায় না।

والّذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سريع الحساب

যারা কুফরী করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে তার নিকট উপস্থিত হলে দেখবে তা কিছু নয় এবং সে পাবে সেথায় আল্লাহকে, অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। (নূর- ৩৯)

এর পরপরই বলা হয় ঃ

او كظلمت.................................. من نور

অথবা গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার সদৃশ, যাকে আচ্ছন্ন করে তরংগের উপর তরংগ, যার উর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে, তা

আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্যে কোন জ্যোতিই নেই। (নূর- ৪০) [রূপকার্থে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের চলাফেরা হল অন্ধকারে এবং কোথাও পৌঁছতে পারে না]

অপর এক আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়াপূজারীদের প্রচেষ্টার ফল এ পৃথিবীতেই প্রদান করা হবে এবং পরকালে তারা সকল কিছু থেকে বঞ্চিত হবে। যেমনঃ নিম্নোল্লিখিত আয়াতে বলা হয় ঃ

من كان يريد الحيوة الدنيا و زينتها نوفّ اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون

যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে তবে দুনিয়াতে আমি তাদের কর্মের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেথায় তাদেরকে কম দেওয়া হবে না। (সূরা হুদ - ১৫)

اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

তাদের জন্যে পরলোকে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে পরলোকে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক। (সূরা হুদ-১৬) [১]

১। এ ছাড়া ইসরা-১৮, শুরা-২০, আহকাফ-২০ ইত্যাদি আয়াত দ্রষ্টব। এ আয়াতসমূহের আলোকে তাদের ইসলাম পরিচিতির মানদণ্ড সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, যারা পাশ্চাত্যের কোন কোন কাফের ও নাস্তিক পণ্ডিতদেরকে খাজা নাসিরুদ্দিন তুসী ও আল্লামা মাজলেসীর মত শিয়া আলেমগণের উপর প্রাধান্য দেয় ।

পাঠ - ১৫

ঈমান ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক

- ভূমিকা
- আমলের সাথে ঈমানের সম্পর্ক
- ঈমানের সাথে আমলের সম্পর্ক
- উপসংহার

ভূমিকা ঃ

ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধি ও দুঃখ-দুর্দশার পথে প্রকৃত নির্বাহী হল ঈমান ও কুফর। স্থায়ী ঈমান চিরন্তন সমৃদ্ধির দৃঢ় নিশ্চয়তা প্রদান করে যদিও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ফলে সীমাবদ্ধ শাস্তি ভোগ করতে হবে। অপরদিকে স্থায়ী কুফর, চিরন্তন দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয় এবং এর উপস্থিতিতে কোন প্রকার সুকর্মই পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধির কারণ হবে না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করেছিলাম যে, ঈমান ও কুফরের মাত্রা তীব্র ও ক্ষীণ হতে পারে এবং বড় রকমের পাপাচারের বাহুল্য, ঈমান হরণের কারণও হতে পারে। অনুরূপ সুকর্ম সম্পাদন কুফরের শিকড়কে দুর্বল করে ফেলে এবং এমনকি ঈমানের ক্ষেত্রও সৃষ্টি করতে পারে।

এখানেই ঈমান ও আমলের সম্পর্ক বিষয়ে প্রশ্নের গুরুত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং আলোচ্য পাঠে আমরা এ প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর প্রদান করতে প্রয়াসী হব ।

আমলের সাথে ঈমানের সম্পর্ক ঃ

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে স্পষ্টতঃই প্রকাশ পায় যে, ঈমান হল আত্মার এক বিশেষ অবস্থা, যা জ্ঞান ও প্রবৃত্তি থেকে উৎসারিত হয়। আর এর অপরিহার্য বিষয় হল এই যে, ঈমানদার ব্যক্তি এমন কর্ম সম্পাদনের জন্যে সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যা যে বিষয়ে সে আস্থা জ্ঞাপন করেছে তার অনুগামী। অতএব যদি কেউ কোন সত্য সম্পর্কে অবগত থাকে অথচ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কখনোই এর অপরিহার্য বিষয়গুলোর কোনটিই সে সম্পাদন করবে না, তবে সে এর উপর আস্থা প্রকাশ করবে না। এমনকি 'আমল করবে কি করবে না' যদি কেউ এ রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকে, তবে সে-ও তখন পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করেনি বলে পরিগণিত হবে। পবিত্র কোরান এ প্রসঙ্গে বলে ঃ

قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا لما يدخل الايمان في قلوبكم

আরব মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম, বল তোমরা ঈমান আননি বরং তোমরা বল, 'আমরা আত্মসমর্পণ করেছি; কারণ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। (হুজুরাত-১৪)

তবে প্রকৃত ঈমানেরও বিভিন্ন পর্যায় বিদ্যমান। দায়িত্ব ও কর্তব্যের জন্যে সংশ্লিষ্ট স্তর বা পর্যায়ের অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। কাম ও ক্রোধের বশঃবর্তী উত্তেজনা, দুর্বল ঈমানের লোকদেরকে গুনাহে লিপ্ত করতে পারে কিন্তু তা এমন নয় যে, সার্বক্ষণিক পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার অথবা তার বিশ্বাসের সকল অপরিহার্য বিষয়গুলোর বিরুদ্ধাচরনের সিদ্ধান্ত নিবে। তবে ঈমান যত শক্তিশালী ও পূর্ণতর হবে তা যথোপযুক্ত কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ততবেশী প্রভাব ফেলবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ঈমান অত্যাবশ্যকীয়ভাবেই এর অনুগামী সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের উপর আমলের দাবীদার। আর এই দাবীর প্রভাবের পরিমাণ, এর তীব্রতা ও ক্ষীণতার সমানুপাতি। সর্বোপরি কোন ব্যক্তির প্রত্যয় ও সিদ্ধান্তই কোন কর্ম সম্পাদন কিংবা বর্জন করার ব্যাপারটি নির্ধারণ করে।

ঈমানের সাথে আমলের সম্পর্ক ঃ

ইচ্ছাধীন কর্মকাণ্ড হয় যথাযথ ও বিশ্বাসাধীন অথবা অযথা ও বিশ্বাস বিরোধী হয়ে থাকে। প্রথমক্ষেত্রে বিশ্বাস দৃঢ় ও হৃদয় জ্যোতির্ময় হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে বিশ্বাস দুবর্ল ও হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অতএব মু'মিনব্যক্তি যে সুকর্ম সম্পাদন করে, যদিও তার ঈমানই এর উৎস, তথাপি বিপরীতক্রমে (ঐ সৎকর্ম) তার ঈমানকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে। ঈমানের পূর্ণতার ক্ষেত্রে সৎকর্মের প্রভাব সম্পর্কে আমরা নিম্নোল্লিখিত আয়াত থেকে জানতে পারি ঃ

اليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصّالح يرفعه

তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমুহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাকে উন্নীত করে। (ফাতির- ১০)

অপরদিকে যখন বিশ্বাস বা ঈমানের পরিপন্থী একাধিক প্রবণতার সৃষ্টি হয় ও অনর্থক কর্ম সম্পাদনের কারণ হয় এবং ব্যক্তির ঈমানের শক্তি যদি এমন

পরিমাণে না থাকে যে, ঐ সকল কর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম, তবে তার ঈমান দুর্বল ও অধঃমুখী হয়। ফলে পাপাচারের পুনরাবৃত্তি ঘটার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। আর যদি এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে তবে তা তাকে বড় ধরনের পাপাচারে লিপ্ত করে এবং এর পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। অবশেষে মূল বিশ্বাসই হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে এবং তা কুফর ও কপটতায় পরিবর্তিত হয় (মহান আল্লাহ আমাদেরকে আশ্রয় প্রদান করুন)।

যাদের কর্মকাণ্ড কপটতায় পরিণত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরান বলে ঃ

فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه و بما كانوا يكذبون

পরিণামে তাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করলেন আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত -দিবস পর্যন্ত, কারণ তারা আল্লাহর নিকট যে অংগীকার করেছিল তা ভংগ করেছিল এবং তারা ছিল মিথ্যাচারী। (তাওবাহ-৭৭)

ثمّ كان عاقبة الذين اساؤوا السوء ان كذبوا بايات الله و كانوا به يستهزءون

অতঃপর যারা মন্দকর্ম করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ; কারণ তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করত এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। (রূম-১০)

উপসংহার ঃ

ঈমান ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এতদুভয়ের ভূমিকার আলোকে সৌভাগ্যশালী জীবনকে এমন এক বৃক্ষের সাথে তুলনা করা যায়, যার মূলগুলো এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর প্রেরিত রাসুলগণ ও বাণীসমূহের প্রতি বিশ্বাস, প্রভুর নিকট থেকে পুরস্কার ও শাস্তি গ্রহণের দিবসের প্রতি বিশ্বাস থেকে রূপ পরিগ্রহ করে। আর এর (বৃক্ষের) কাণ্ড হল ঈমানের অপরিহার্য বিষয়গুলোর উপর আমল করার সামগ্রিক ও সরল সিদ্ধান্ত, যা কোন মাধ্যম ব্যতীতই তা (ঈমান নামক শিকড়) থেকে উদগত হয়। এর (বৃক্ষের) পত্র-পল্লবগুলো ঈমান নামক শিকড় থেকে উৎসারিত হয়। আর এর ফল হল অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধি। ফলে যদি শিকড়ই না থাকে তবে কাণ্ডে কোন

শাখা ও পত্রই জন্মাবে না। সুতরাং কোন ফলও ধারণ করবে না।

কিন্তু এমনটিও নয় যে, মূলের অস্তিত্বের সাথে সাথে অপরিহার্যভাবে যথাযথ শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব থাকবে এবং ফল প্রদান করবে। বরং কখনো কখনো পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রতিকূলতার জন্যে কিংবা বিভিন্নপ্রকার রোগ ব্যাধির প্রভাবে প্রয়োজনীয় পত্র-পল্লব জন্মাতে পারে না। এমনকি এর ফলে কেবলমাত্র ফল ধারণ করেনা যে তা-ও নয়; বরং কখনো কখনো বৃক্ষের শুকিয়ে যাওয়ারও কারণ হয়।

অনুরূপ কাণ্ড,শাখা, এমনকি মূলের কলমের ফলে অপর এক ধরনের বৈশিষ্ট্যও তা থেকে প্রকাশ লাভ করতে পারে এবং কখনো কখনো তা পরিবর্তিত হয়ে অপর এক ধরনের বৃক্ষেও রূপ নিতে পারে। আর এটাই হল সেই ঈমানের কুফরে (মুর্তাদ) পরিবর্তিত হওয়া ।

সিদ্ধান্ত ঃ

ঈমান হল মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির পথে মূল নির্বাহী। কিন্তু এ নির্বাহীর পরিপূর্ণ প্রভাব, কল্যাণময় কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ এবং পাপাচার থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে ক্ষতিকর দ্রব্য বর্জন ও মরক নিধনের শর্তাধীন। ওয়াজেবসমূহ পরিত্যাগ ও হারামকর্মে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো শুষ্ক বৃক্ষের রূপ ধারণ করে। যেমন ঃ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বন্ধনের ফলে ঈমানের সত্ত্বা ও স্বকীয়তা পাল্টে যায় ।

পাঠ – ১৬

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- ভূমিকা
- মানুষের প্রকৃত উৎকর্ষ বা কামাল
- বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা
- উদ্দীপক ও নিয়্যাতের ভূমিকা

ভূমিকা ঃ

ইসলামী সংস্কৃতির সাথে যাদের যথেষ্ট পরিচয় নেই এবং যারা মানবীয় প্রবৃত্তিকে বাহ্যিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে থাকেন; এ ছাড়া কর্তার প্রবণতা ও নিয়্যাতের গুরুত্বের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করেন না, অর্থাৎ পারিভাষিক অর্থে যাকে বলা হয় হুসনে ফায়েলী (হুসনে ফে'লীর বিপরীতে) নেই, অথবা কেবলমাত্র অপরের পার্থিব জীবনের সুখ-সমৃদ্ধিতে আপন কর্মের প্রভাবকেই কর্মের মানদণ্ড বলে মনে করেন, তবে এ ধরনের ব্যাক্তিরা ইসলামের অনেক বিশ্বাস ও পরিচিতির ব্যাখ্যায় ভ্রান্তপন্থা অবলম্বনে বাধ্য হয় অথবা ঐগুলোকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। যেমন ঃ ঈমানের ভূমিকা ও সৎকর্মের সাথে ঈমানের সম্পর্ক, কুফর ও শিরকের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা ইত্যাদি ব্যাখ্যা কোন কোন গরিষ্ঠ পরিমাণের ও বিস্তৃত সময়ের কর্মকাণ্ডের উপর লঘিষ্ট পরিমাণের ও ক্ষুদ্র সময়ের কর্মকান্ডের অগ্রাধিকারের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তারা বক্রচিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে। অর্থাৎ তারা এরূপ মনে করেন যে, মহান আবিষ্কারকগণ যে অপরের সুখ-সমৃদ্ধির উপকরণের যোগান দিয়েছেন অথবা মুক্তিকামীগণ যে তাদের জাতির মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করেছেন, তারা সঙ্গত কারণেই পরকালে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হবেন –যদিও আল্লাহ ও পুনরুত্থানদিবসের প্রতি তাদের কোন বিশ্বাস না থেকে থাকে। কখনো কখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছেন যে, প্রকৃত সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে জরুরী ঈমানকে, এ পৃথিবীরই শ্রমিক ও কর্মজীবী মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ও তাদের বিজয়ের প্রতি 'বিশ্বাস স্থাপন করার' কথা উল্লেখ করে থাকে । এমনকি 'খোদাকেও' তারা মূল্যবোধ ও চারিত্রিক আদর্শের তাৎপর্যের আওতায় ব্যাখ্যা করে থাকেন ।

যদিও পূর্ববর্তী পাঠসমূহের আলোচিত বিষয়বস্তু থেকে এ রকমের ধারণার দুর্বলতা ও আসরতা সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব, তথাপি আজকের যুগে এ রকমের ধারণার বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে তা যে, বিপর্যয় বয়ে আনতে পারে, তা বিবেচনা করলে, ঐগুলো সম্পর্কে অধিকতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করাটা সময়োচিত বলে মনে করি।

তবে এ সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ও সর্বাত্মক আলোচনার জন্যে যথেষ্ট সময় ও সুযোগের প্রয়োজন। ফলে আমরা এখানে ঐগুলোর বিশ্বাসগত দিকের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এ পুস্তকের বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে,

কেবলমাত্র মূল বিষয়সমূহের উল্লেখেই সচেষ্ট হব।

মানুষের প্রকৃত উৎকর্ষ বা কামাল ঃ

যদি আমরা একটি ফলবতী আপেল বৃক্ষকে একটি ফলবিহীন আপেল বৃক্ষের সাথে তুলনা করি, তবে ফলবতী বৃক্ষটিকে ফলবিহীন বৃক্ষটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যবান বলে গণনা করব। আর এটা কেবলমাত্র এ কারণেই নয় যে, মানুষ ফলবতী বৃক্ষ থেকে অধিকতর লাভবান হয় বরং এটা এ কারণে যে, ফলবতী বৃক্ষ অস্তিত্বের দিক থেকে পূর্ণতর এবং এর অস্তিত্বগত প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশী, ফলে সত্তাগতভাবেই মূল্যবান। কিন্তু এ আপেল বৃক্ষই যখন রোগাক্রান্ত ও পূর্ণতার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে তখন তা স্বীয় মূল্য হারায় এবং এমনকি অপরকে কলুষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করার উৎসেও পরিণত হতে পারে।

মানুষও অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় এরূপ। যদি সে তার উপযুক্ত উৎকর্ষে পৌঁছতে পারে এবং তার ফিত্‌রাত সংশ্লিষ্ট অস্তিত্বগত প্রভাব প্রকাশ লাভ করে থাকে, তবে সে অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অধিকতর মর্যাদা ও মূল্যমানের অধিকারী হবে। কিন্তু যদি সে ব্যাধিগ্রস্ত ও বিচ্যুত হয় তবে অন্যান্য প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্টতর ও ক্ষতিকারক হতে পারে। যেমন ঃ পবিত্র কোরানে কোন কোন মানুষকে সকল প্রাণীর চেয়ে নিকৃষ্ট ও চতুষ্পদ প্রাণীর চেয়েও মূঢ় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ان شرّ الدواب عند الله الصمّ البكم الذين لا يعقلون

আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব সে বধির ও মূক, যারা কিছুই বুঝে না। (আনফাল-২২)

اولئك كالانعام بل هم اضل

এরা পশুর ন্যায় বরং তা অপেক্ষাও অধিক মূঢ়। (আ'রাফ-১৭৯)

অপরদিকে যদি কেউ আপেল বৃক্ষকে কেবলমাত্র অংকুরিত অবস্থায়ই দেখে থাকেন, তবে তার ধারণা এই যে, এর বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায় হল অঙকুরিত হওয়াই এবং ততোধিক পূর্ণতা আর নেই। অনুরূপ যদি কেউ কেবলমাত্র মানুষের মধ্যম ধরনের পূর্ণতার সাথে পরিচিত হয়ে থাকেন তবে তিনি প্রকৃত কামাল বা পূর্ণতার সঠিক ধারণা লাভে ব্যর্থ হবেন। কেবলমাত্র তারাই

মানুষের সঠিক মূল্যায়নে সক্ষম হবেন, যারা তার চূড়ান্ত উৎকর্ষ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবেন।

তবে মানুষের প্রকৃত উৎকর্ষ বা কামাল বস্তুগত ও প্রকৃতিগত উৎকর্ষের মত নয়। কারণ যেমনি আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছিলাম যে, মানুষের মনুষ্যত্ব রূহে মালাকুতী বা আত্মার উপর নির্ভরশীল এবং বস্তুতঃ প্রকৃত মানবীয় উৎকর্ষ হল এ আত্মারই উৎকর্ষ যা স্বীয় ইচ্ছাধীন কর্মতৎপরতার মাধ্যমে অর্জিত হয় হোক তা অন্তর্গত বা আত্মিক তৎপরতা কিংবা হোক বাহ্যিক ও শরীরবৃত্তিক তৎপরতা। আর এ ধরনের কামাল বা পূর্ণতাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা ও সংখ্যাগত মানদণ্ডের ভিত্তিতে শনাক্ত করা যায় না বা অনুমান করা যায় না। ফলে স্বভাবতঃই এ উৎকর্ষ সাধনের পথও পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত উপকরণের মাধ্যমে অনুধাবনযোগ্য নয়। অতএব যিনি স্বংয় এ ধরনের উৎকর্ষ লাভ করতে পারেননি এবং একে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারেননি, তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে অথবা ওহী ও ঐশী গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে।

ওহীর মতে এবং কোরান ও পবিত্র আহলে বাইত ও মাসুমগণের (আঃ) বর্ণনা মতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, মানুষের চূড়ান্ত কামাল বা উৎকর্ষ হল তারই অস্তিত্বের একটি পর্যায় যা "প্রভুর নৈকট্য" রূপে বর্ণিত হয়েছে। আর এ উৎকর্ষের প্রভাব হল অনন্ত বৈভবসমূহ ও প্রভুর সন্তুষ্টি, যা পরকালে আত্মপ্রকাশ করবে। বস্তুতঃ এ উৎকর্ষের সামগ্রীক পথ হল প্রভুর ইবাদত বা উপাসনা ও তাকওয়া, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সকল স্ত রকে সমন্বিত করে।

তবে বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে, অনেক জটিল যুক্তি-প্রমাণও এ বিষয়ের উপর বর্ণনা করা যেতে পারে, যার জন্যে একাধিক দার্শনিক প্রারম্ভিকার প্রয়োজন হয়। ফলে আমরা এখানে সহজ-সরলভাবে বিষয়টি উপস্থাপনের চেষ্টা করব।

বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা ঃ

মানুষ ফিতরাতগতভাবেই অসীম কামাল বা পূর্ণতা কামনা করে।

জ্ঞান ও সামর্থ্য এর বহিঃপ্রকাশ বলে পরিগণিত হয়। আর এ ধরনের পূর্ণতা লাভই অসীম ভোগ-বিলাস ও চিরস্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি কারণ। মানুষের জন্যে এ পূর্ণতা বা কামাল তখনই সম্ভব হবে যখন অসীম জ্ঞান, ক্ষমতা ও পরমপূর্ণতার আধারের সাথে অর্থাৎ মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আর এ সম্পর্কই আল্লাহর সান্নিধ্য (قرب) নামে পরিচিত। [১] অতএব মানুষের প্রকৃত উৎকর্ষ বা পূর্ণতা, যা হল তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তা মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে ও তাঁরই নৈকট্যের ছায়ায় অর্জিত হয়। আর যে ব্যক্তি এই কামাল বা উৎকর্ষের সর্বনিম্নস্তরে পৌঁছতে ব্যর্থ হয় অর্থাৎ দুর্বলতম পর্যায়ের ঈমানও যার না থাকে তবে সে সেই বৃক্ষের মতই, যে বৃক্ষ এখনও ফলবতী হয়নি ও ফল প্রদান করেনি। আর যদি এ ধরনের বৃক্ষ মড়কের ফলে ফলপ্রদানের ক্ষমতা ও সার্মথ্য হারায়, তবে তা হবে নিষ্ফল বৃক্ষসমূহ থেকেও নিকৃষ্ট।

অতএব মানুষের কামাল বা পূর্ণতা ও সুখ-সমৃদ্ধি অর্জনের পথে ঈমানের ভূমিকা এ দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ববহ যে, মানুষের আত্মা বা রূহের মূলবিশেষত্বই হল মহান আল্লাহর সাথে সচেতন ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্পর্ক থাকা। আর এ সম্পর্ক ব্যতীত যথোপযুক্ত উৎকর্ষ ও তার প্রভাব থেকে বঞ্চিত হবে। অন্যভাবে বলা যায় ঃ কার্যক্ষেত্রে তার মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। আর যদি স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে এ রকম সমুন্নত যোগ্যতাকে বিনষ্ট করে তবে সে ভয়ংকরতম অত্যাচারের বোঝা স্বীয় স্কন্ধে ধারণ করল, যার ফলে সে অনন্ত শাস্তি তে পতিত হতে বাধ্য হবে। পবিত্র কোরান এ ধরনের ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলে ঃ

انّ شرّ الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون

আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না। (আনফাল –৫৫)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, পূর্ণতা ও সুখ-সমৃদ্ধির অথবা অধঃপতন ও দুঃখ-দুর্দশার পথে ধাবিত হওয়ার দিক নির্ধারণ করে, যথাক্রমে ঈমান অথবা কুফর। স্বভাবতঃই (ঈমান ও কুফরের মধ্যে) যে কোনটি সর্বশেষে অবস্থান নেয়, তাই চূড়ান্ত ও ভাগ্য নির্ধারণী ভূমিকা রাখবে।

১। লেখকের অন্য একটি পুস্তক "খোদ শেনাসী বারা'য়ে খোদসাজী" তে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ।

উদ্দীপক ও নিয়্যাতের ভূমিকা ঃ

উপরোল্লিখিত নীতির আলোকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের ইচ্ছাধীন কর্মকাণ্ডের প্রকৃত মূল্য নির্ভর করে সত্যিকারের পূর্ণতা বা কামাল অর্জনের পথে অর্থাৎ মহান আল্লাহর নৈকট্যের পথে, ঐ গুলোর প্রভাব বা ভূমিকার উপর। যদিও ব্যক্তির কর্মকাণ্ডসমূহ প্রকারান্তরে (এমনকি একাধিক মাধ্যমান্তে) অপরের পূর্ণতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে থাকে, তবে সেগুলো সুন্দর ও প্রকৃষ্টরূপে গুণান্বিত হলেও কর্তার অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ঐ কর্মগুলোর ভূমিকা নির্ভর করে, তার আত্মার উৎকর্ষ সাধনের পথে তার কর্মকাণ্ডের প্রভাবের উপর ।

অপরদিকে বাস্তব কর্মকাণ্ডের সাথে কর্তার আত্মা বা রূহের সম্পর্ক, ইচ্ছা বা ইরাদার মাধ্যমে অর্জিত হয়, যা হল তার প্রত্যক্ষকর্ম। আর কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা, কর্মফলের প্রতি তার ঝোঁক, প্রবণতা ও আকর্ষণ থেকে জন্ম নেয় । এ প্রবণতা বা ঝোঁকই উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তার আত্মায় গতিসঞ্চার করে এবং কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছারূপে প্রজ্জোলিত হয়। অতএব ইচ্ছাধীন কর্মসমূহের মূল্য কর্তার ঝোঁক ও নিয়্যাতের অনুগামী এবং কর্মের সততা (حسن فعلي) কর্তার সততা (حسن فاعلي) ব্যতীত আত্মার উৎকর্ষ ও অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে না। আর এ জন্যেই, যা বস্তুগত ও পার্থিব উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধির পথে তা কোন ভূমিকা রাখবে না এবং সামাজিক কল্যাণে বৃহত্তম কর্মতৎপরতাও যদি আত্মম্ভরিতাহেতু চালানো হয়, তবে পরকালে কর্তার জন্যে তা ন্যূনতম লাভও বয়ে আনবে না [১]। বরং তার জন্যে ক্ষতিকর ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে। এ কারণেই পবিত্র কোরান পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধির পথে সৎকর্মের প্রভাবকে ঈমান ও স্রষ্টার নৈকট্যলাভের আশা করার শর্তাধীন বলে উল্লেখ করেছে [২]।

وارادہ وجه الله و ابتغاء مرضات الله

অর্থাৎ 'আল্লাহর জন্যে ইরাদা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে প্রচেষ্টা।'

১। বাকারা-২৬৪, নিসা- ৩৮, ১৪২, আনফাল-৪৭, মাউন- ৬।
২। নিসা- ১২৪, নাহল- ৯৭, ইসরা- ১৯, তোহা-১১২, আম্বিয়া-৯৪, গাফির-৪০, আনআম-৫২ কাহফ- ২৮ , রূম- ৩৮, বাকারা-২০৭, ২৬৫, নিসা- ১১৪, আল্ লাইল- ২০।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, প্রথমতঃ সৎকর্ম, অপরের কল্যাণ সাধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দ্বিতীয়তঃ অপরের কল্যাণ সাধনও ব্যক্তিগত ইবাদতের মত তখনই চূড়ান্ত উৎকর্ষ ও অনন্ত সুখ- সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে যখন ঐশী উদ্দেশ্য থেকে উৎসারিত হবে।

পাঠ - ১৭

কর্ম নিষ্ফল হওয়া ও পাপমোচন

- ভূমিকা
- ঈমান ও কুফরের সম্পর্ক
- সুকর্ম ও দুষ্কর্মের সম্পর্ক

ভূমিকা ঃ

"পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধির সাথে ঈমান ও সৎকর্মের সম্পর্ক এবং অপরদিকে অনন্ত দুঃখ-দুর্দশার সাথে কুফর ও গুনাহের সম্পর্ক" শিরোনামে যে বিষয়টি আলোচিত হয় তা হল ঃ পরকালীন ফলাফলের সাথে ঈমান ও কুফরের প্রতি মুহূর্তের সম্পর্ক, অনুরূপ পুরস্কার ও শাস্তির সাথে সকল সুকর্ম ও দুষ্কর্মের সম্পর্ক কি চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী, না কি পরিবর্তনশীল? যেমন ঃ পাপাচারের কুফলকে, সুকর্মের মাধ্যমে পুষিয়ে নেয়া যায় কি? কিংবা বিপরীতক্রমে সুকর্মের সুফল পাপাচারের মাধ্যমে বিনষ্ট হতে পারে কি ? যদি কেউ জীবনের কিছু অংশ কুফর, পাপাচারে এবং কিছু অংশ ঈমান ও আনুগত্যের পথে অতিবাহিত করে, তবে কি সে কিছু সময় শাস্তি ভোগ করবে, আবার অপর কিছু সময় পুরস্কারের অধিকারী হবে? কিংবা এ দুয়ের সম্মিলিত চূড়ান্ত ফলাফলের মাধ্যমেই কি অনন্ত জীবনে মানুষের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য নির্ধারিত হয় ? না কি এর ব্যতিক্রম কোন বিষয় ?

প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টি হল তা-ই, 'যা হাবিত ও তাকফির'[১] নামে যুগ যুগ ধরে আশয়ারী ও মো'তাযেলী কালমশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে আলাপ-আলোচনার বিষয় বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। আমরা এখানে শিয়া মতবাদের দৃষ্টিকোণে এ বিষয়টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করব ।

ঈমান ও কুফরের সম্পর্ক ঃ

পূর্ববর্তী পাঠসমূহ থেকে আমরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি যে, কোন সুকর্মই মৌলিক বিশ্বাসসমূহের উপর আস্থা স্থাপন ব্যতীত, অনন্তঃ সুখ-সমৃদ্ধির কারণ হতে পারে না। অন্য কথায় ঃ কুফর, পুণ্যকর্মসমূহের নিষ্ফলতার কারণ। এখানে উল্লেখ করব যে, জীবনের শেষার্ধে যদি কেউ ঈমান আনে, তবে তা পূর্বকৃত কুফরীর সকল কুপ্রভাব মোচন করে এবং উজ্জ্বল-দীপ্তিময় শিখার মত পূর্বের সকল অমানিশাকে বিদূরিত করে। বিপরীতভাবে সর্বশেষে কৃত কুফর,

---

১। 'হাবিত্ত ও তাকফির' হল কোরানে বর্ণিত দু'টি পরিভাষা। প্রথমটির অর্থ হল সৎকর্মের নিস্ফলতা আর দ্বিতীয়টির অর্থ হল পাপাচারের ক্ষতিপূরণ।

পূর্বকৃত ঈমানের সকল সুফলকে বিনষ্ট করে এবং ব্যক্তির জীবনের সকল পাতাগুলোকে কালো ও দুর্ভাগ্যের তিমিরে পরিণত করে, আর খড়ের স্তুপে পতিত অগ্নিস্ফুলিংগের মত সর্বস্ব ভস্মিভূত করে। উদাহরণস্বরূপ ঃ ঈমান উজ্জ্বল দীপের মত অন্তরাত্মার ঘরকে উজ্জ্বল-দীপ্তিময় করে তুলে এবং অন্ধকার ও তিমিরকে হৃদয় গহ্বর থেকে দূরীভূত করে। অপরদিকে কুফর সে নির্বাপিত দীপের মতই যা আলোর অবসান ঘটিয়ে অন্ধকারের সূচনা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানবাত্মা এ পরিবর্তনশীল ও বস্তুগত বিশ্ব ও অস্থিতিশীল অবস্থার সাথে সম্পর্কিত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বদা অন্ধকার ও আলোর তীব্রতা ও ক্ষীণতার সীমায় অবস্থান করবে। আর এ অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এ ক্ষণস্থায়ী আবাসস্থল ছেড়ে পরপারে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হবে এবং ঈমান ও কুফরের পথ তার জন্যে বন্ধ হবে। তখন সে যতই পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে এসে অন্ধকার থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা করুক না কেন, তা তার কোন উপকারে আসবে না । [পাঠ- ৪৯ দ্রষ্টব্য] পবিত্র কোরানের মতে ঈমান ও কুফরের এ পারস্পারিক প্রভাব সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই এবং পবিত্র কোরানের অসংখ্য আয়াত এ বিষয়ের স্বপক্ষেই সাক্ষি প্রদান করে। যেমন ঃ

ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيّئاته

যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তিনি তার পাপ মোচন করবেন। (তাগাবুন- ৯)

অপর এক আয়াতে বলা হয় ঃ

و من يرتدد منكم عن دينه............هم فيها خالدون

তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দ্বীন হতে ফিরে যায় এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী রূপে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, ইহকাল ও পরকালে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (বাকারা- ২১৭)

সুকর্ম ও দুষ্কর্মের সম্পর্ক ঃ

ঈমান ও কুফরের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের মত সুকর্ম ও দুষ্কর্মের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের উদাহরণও বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু তা সামগ্রিকভাবে নয় এবং এ রূপে নয় যে, হয় মানুষের আমলনামায় সর্বদা

সৎকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ হয় ও পূর্ববর্তী অপকর্মসমূহ মুছে যায় অথবা সকল অপকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ হয় ও পূর্ববর্তী সকল সৎকর্ম মুছে যায় (যেমনটি কোন কোন মো'তাযেলী কালামশাস্ত্রবিদগণ মনে করেছেন)। কিংবা এ রকমটিও নয় যে, সর্বদা পূর্ববর্তী কর্মসমূহের গুণ ও মানের আলোকে মোট চূড়ান্ত ফল তার আমলনামায় লিপিদ্ধ হয় (যেমনটি অপর কেউ কেউ মনে করেছেন)। বরং মানুষের আমলের বিষয়টিকে আরও সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করতে হবে। অর্থাৎ কোন কোন সৎকর্ম (যদি সঠিক ও কাঙ্খিত রূপে সম্পন্ন করা হয়) পূর্ববর্তী সকল অপকর্মের ফলাফলকে দূরীভূত করে। যেমন ঃ তওবাহ যদি কাঙ্খিতরূপে সম্পাদন করা হয়, তবে ব্যক্তির পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[১] ঠিক আলোকচ্ছটার মত সরাসরি অন্ধকার বিন্দুতে আলোকবিম্ব ফেলে ও আলোকিত করে। কিন্তু সকল সৎকর্মই সকল প্রকার পাপাচারের কুফলকেই দূরীভূত করে না। ফলে এ দৃষ্টিকোণ থেকে মু'মিন ব্যক্তি পরকালে একটি বিশেষ সময় ধরে শাস্তি ভোগ করার পর, পরিশেষ চিরন্তন বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারে। যেন মানবাত্মার একাধিক দিক বিদ্যমান এবং প্রত্যেক শ্রেণীর কর্মকাণ্ড, সুকর্ম ও কুকর্ম এর বিশেষ নীতি-কৌশলের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন ঃ 'ক' নীতি-কৌশলের সাথে সংশ্লিষ্ট সৎকর্ম, 'খ' নীতি-কৌশলের সাথে সংশ্লিষ্ট পাপাচারের কুফলকে বিনষ্ট করে না, যদি না সৎকর্ম এতটা জ্যোতির্ময় হয় যে, আত্মার অপরাপর অংশেও বিচ্ছুরিত হয় কিংবা পাপ এতটা 'কলুষতা' সৃষ্টিকারী হয় যে, অপরাপর অংশকে ও কলুষিত করে। উদাহরণতঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, গ্রহযোগ্য নামায, পাপাসমূহকে ধৌত করে এবং পাপ ক্ষমার কারণ হয়। পবিত্র কোরানে বলা হয় ঃ

و اقم الصلوة طرفي النهار و زلفا من اليل انّ الحسنات يذهبن السيئات

> সালাত কায়েম করিবে দিবসের দুই প্রান্ত ভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে । সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয়।(হুদ- ১১৪)

পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও মদপানের মত কিছু কিছু পাপকর্ম নিদির্ষ্ট সময়ের জন্যে ইবাদত কবুলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কিংবা কারও প্রতি অনুগ্রহ করার পর তাকে ছোট করার ফলে ঐ কর্মের সুফল বিনষ্ট হয়ে যায়।

১। নিসা- ১১০, আলে ইমরান- ১৩৫, আনআম- ৫৪, শুরা- ২৫, যুমার- ৫৩ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

যেমনটি পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে ঃ

لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى

দানের কথা প্রচার করে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নিষ্ফল করনা।
(বাকারা- ২৬৪)

কিন্তু সৎকর্ম ও দুষ্কর্মের পারস্পরিক প্রভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পর্কে ওহী ও মাসূমগণের (আঃ) মাধ্যমে অবগত হতে হবে এবং এ গুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে কোন সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করা যায় না ।

সর্বশেষে এতটুকু বলার অবকাশ থাকে যে, সৎকর্ম ও অসৎকর্ম কখনো কখনো এ পার্থিব জগতেই সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের অথবা অপর কোন কর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য লাভ ও সামর্থ্য হারানোর কারণ হয় । যেমন ঃ অপরের প্রতি দয়াদ্র হওয়া, বিশেষ করে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার, দীর্ঘায়ু লাভের ও রোগ-বালাই দূর হওয়ার কারণ হয়। অপরদিকে বয়ঃজ্যেষ্ঠদের বিশেষ করে ওস্তাদ ও শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন, সামর্থ্য হারানোর কারণ হয়। কিন্তু এর প্রভাবের ফল চূড়ান্ত পুরস্কার ও শাস্তি লাভার্থে নয়। পুরস্কার ও শাস্তি লাভের প্রকৃত স্থান হল অনন্ত ও চিরন্তন জগৎ।

পাঠ - ১৮

বিশ্বাসীদের বিশেষ সুবিধা

- ভূমিকা
- পুণ্য বৃদ্ধি
- ক্ষুদ্র পাপসমূহের জন্যে ক্ষমা লাভ
- অন্যের কর্ম থেকে লাভবান হওয়া

ভূমিকা ঃ

খোদাপরিচিতি পর্বে [১] আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রভুর ইরাদা মূলতঃ কল্যাণ ও কামালের সাথেই সম্পর্কিত। আর অকল্যাণ ও অপূর্ণতা (মানুষের ইচ্ছার) অনুগামীক্রমে প্রভুর ইরাদার সাথে সম্পর্কিত হয়। স্বভাবতঃই মানুষের ক্ষেত্রেও প্রভুর মূল ইরাদা মানুষের উৎকর্ষ অনন্তসৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া ও চিরন্তন নেয়ামত ভোগ করার সাথে সম্পর্কিত। আর অনাচারিদের শাস্তি ও দুর্ভাগ্য, যা তাদের অপইচ্ছার ফল, তা অনুগামীক্রমে প্রভুর প্রজ্ঞাময় ইরাদার আওতাভুক্ত হয়। যদি শাস্তি ও দুঃখ দুর্দশা মানুষেরই কুপ্রবণতার অপরিহার্য বিষয় না হত, তবে প্রভুর বিস্তৃত রহমতের দাবী হত এই যে, সৃষ্টির কোন সদস্যই আযাব ও শাস্তিতে পতিত হবে না।[২] কিন্তু প্রভুর এ অসীম রহমতের ফলেই স্বাধীনতা ও নির্বাচনাধিকার সহকারে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। আর ঈমান ও কুফর এ দু'পথের যে কোন একটি নির্বাচনের অপরিহার্য ফল হল সৌভাগ্যময় বা দুর্ভাগ্যময় পরিণামে উপনীত হওয়া। তবে পার্থক্য শুধু এটুকু যে, সৌভাগ্যময় পরিণামে উপনীত হওয়া প্রভুর প্রকৃত ইরাদার সাথে সম্পর্কিত; আর দুর্ভাগ্যময় পরিণাম অনুগামীক্রমে প্রভুর ইরাদার সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং এ পার্থক্যেরই দাবী হল এই যে, সৃষ্টি ও বিধান উভয় ক্ষেত্রেই কল্যাণের দিকটি অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ অস্তিত্বগতভাবে মানুষ এমনভাবে সৃষ্টি হবে যে, কল্যাণকর্মসমূহ তার ব্যক্তিত্বে অপেক্ষাকৃত গভীর প্রভাব ফেলে, আর বিধিগতভাবে সহজ ও সরল দায়িত্ব লাভ করে, যাতে সৌভাগ্য ও চিরন্তন শাস্তি থেকে মুক্তির পথে কোন কঠিনদুরূহ দায়িত্ব পালণের প্রয়োজনীয়তা না থাকে। [৩] অপরদিকে পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে, পুরস্কারের ব্যাপার অগ্রাধিকার পাবে। আর রহমত ও ক্রোধের ক্ষেত্রে রহমত অগ্রাধিকার পাবে।[৪] রহমতের এ অগ্রাধিকারের স্ফুরণ যে সকল বিষয়ে প্রকাশ পায়, সে গুলোর মধ্যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরব।

১। খোদা পরিচিত , পাঠ- ১১ দৃষ্টব্য

২। দোয়ায়ে কোমাইলে আমরা পড়ি ঃ

فباليقين اقطع لو لا ما حكمت به.....لجعلت الناركلها بردا و سلاما وما كانت لاحد فيها مقرا و لامقاما

৩। وما جعل عليكم في الدين من حرج (হাজ্জ-৭৮) , يريد الله بكم اليسر ولا يرد بكم العسر (বাকারা- ১৫৮) ।

৪। তাঁর রহমত, ক্রোধকে অতিক্রম করে।

পুণ্য বৃদ্ধি ঃ

পরকালীন সৌভাগ্য কামনাকারীদের জন্যে মহান আল্লাহ প্রথম যে প্রাধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা হল ঃ কেবলমাত্র আমলের সমপরিমাণ পুণ্যই তাকে দেয়া হবে না, বরং বর্ধিত মানের পূণ্য তাকে দেয়া হবে। এ বিষয়টি পবিত্র কোরানে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ

من جاء بالحسنة فله خير منها

যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে। (সূরা নামল- ৮৯)

ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا

যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্যে তাতে কল্যাণ বর্ধিত করি। (শুরা- ২৩)

للّذين احسنوا الحسنى و زيادة

যারা মংগলকর কার্য করে তাদের জন্যে আছে মংগল এবং আরো অধিক। (ইউনুস- ২৬)

انّ الله لا يظلم مثقال ذرّة.........ويؤت من لدنه اجرا عظيما

আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ পুণ্য কার্য হলেও আল্লাহ তা দ্বিগুণ করেন, আর আল্লাহ তার নিকট হতে মহা পুরস্কার প্রদান করেন। (নিসা- ৪০)

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها......و هم لا يظلمون

কেউ কোন সৎ কার্য করলে সে তার দশগুণ পাবে এবং কেউ কোন অসৎকার্য করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে। আর তার প্রতি জুলুম করা হবে না। (আনআম- ১৬০)

ক্ষুদ্র পাপসমূহের জন্যে ক্ষমা লাভ ঃ

অপর প্রাধিকারটি হল মু'মিনগণ যদি বড় গুনাহসমূহ থেকে দূরে থাকেন, তবে দয়াময় আল্লাহ তাদের ক্ষুদ্র গুনাহসমূহ ক্ষমা করতঃ ঐগুলোর কুফল থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন । যেমন ঃ

ان تجتنبوا كبائرما تنهون عنه نكفرعنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما

তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা হতে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলো মোচন করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব। (নিসা- ৩১)

স্পষ্টতঃই এ ধরনের ব্যক্তিবর্গের জন্যে ক্ষুদ্র গুনাহসমূহের ক্ষমাকরণ তওবাহর শর্তাধীন নয় । কারণ তওবাহ্ বড় গুনাহসমূহ থেকেও মুক্তি লাভের কারণ।

অন্যের কর্ম থেকে লাভবান হওয়া ঃ

মুমিনদের অপর একটি সুবিধা হল, কোন ফেরেশ্‌তা ও আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তিরা যদি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে মহান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।[১] অনুরূপ অন্যান্য মু'মিনগণের দোয়া ও ইস্তিগফার তাদের জন্যেও মঞ্জুর করা হয়। এমনকি কোন মু'মিন ব্যক্তির জন্যে যদি কেউ কারও আমল উৎসর্গ করে, তবে তার নিকটও (অন্য এক মু'মিন) তা পৌঁছে।

আলোচ্য বিষয়গুলো অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এ বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে শাফায়াতের সাথে জড়িত সেহেতু এ বিষয়টি সম্পর্কে তুলনামূলক ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। ফলে এখানে আমরা এতটুকু ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি।

১। গাফির-৭, আলে ইমরান-১৫৯, নিসা-৬৪, মুমতাহিনাহ-১২, ইব্রাহীম-৪১, ইত্যাদি আয়াত দ্রষ্টব্য।

পাঠ – ১৯

শাফায়াত

- ভুমিকা
- শাফায়াতের তাৎপর্য
- শাফায়াতের মানদণ্ড

ভূমিকা ঃ

মহান আল্লাহ মু'মিনদের জন্যে অপর যে সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করেছেন, তা হল ঃ যদি মু'মিন ব্যক্তি আমৃত্যু স্বীয় ঈমানকে সংরক্ষণ করে এবং যদি এমন কোন গুনাহে লিপ্ত না হয়, যার ফলে সামর্থ্যহৃত হয়, দুর্ভাগ্যময় পরিণতির স্বীকার হয় ও অবশেষে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত হয় কিংবা সত্যকে অস্বীকার করে, এককথায় যদি বিশ্বাসী অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে, তবে চিরন্তন শাস্তিতে পতিত হবে না। তার ক্ষুদ্রপাপসমূহ, বড়গুনাহ থেকে দূরে থাকার কারণে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর বড় পাপসমূহ পূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য তওবাহর মাধ্যমে ক্ষমা করা হবে। যদি এরূপ তওবাহ করতে সক্ষম না হয় তবে, পার্থিব কষ্ট-ক্লেশের মাধ্যমে তার গুনাহের বোঝা লাঘব করা হবে এবং বারযাখে ও পুনরুত্থানের প্রারম্ভেই কষ্ট ভোগের মাধ্যমে তাকে কলুষতা থেকে মুক্ত করা হবে। এর পরও যদি সে তার গুনাহের কলুষতা থেকে মুক্ত না হতে পারে, তবে শাফায়াতের (মহান আল্লাহর অসীম ও বিস্তৃত অনুগ্রহের জ্যোতিকণা, যা নবীগণ (আঃ), বিশেষ করে মহানবী (সঃ) ও তাঁর মহান আহলে বাইতগণের (আঃ) উপর আপতিত হয়েছে) মাধ্যমে নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করবে।[১] অসংখ্য হাদীসে যে "মাকামে মাহমূদ"[২] বা প্রশংসিত স্থানের উল্লেখ রয়েছে, যার প্রতিশ্রুতি পবিত্র কোরানে মহান নবীকে (সঃ) প্রদান করা হয়েছে মূলতঃ তা এ শাফায়াতেরই স্থান। এ ছাড়াও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

ولسوف يعطيك ربّك فترضى

অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হবে। (যোহা- ৫)

উপরোক্ত আয়াতটি যারা শাফায়াতলাভের যোগ্য, হযরতের (সঃ) শাফায়াতের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে -এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

১। নবী (সঃ) বলেন ঃ শাফয়াতকে আমার উম্মতদের মধ্যে যারা বড় গুনাহে লিপ্ত হবে, তাদের জন্যে সংরক্ষণ করেছি (বিতার খঃ ৮ পৃঃ ৩৭-৪০)

২। ইসরা- ৭৯

অতএব মু'মিন পাপীদের সর্ববৃহৎ ও সর্বশেষ আশা হল শাফায়াত। তথাপি প্রভুর রোষানলে পতিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে এবং সর্বদা এ ভয় অন্তরে পোষণ করতে হবে যে, যদি বা এমন কোন কাজ করে ফেলে, যা দুর্ভোগময় পরিণাম ডেকে আনবে ও অন্তিমমুহূর্তে ঈমানহারা হয়ে যাবে; কিংবা যদি বা পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি হৃদয়ে এমন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় যে , (আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন) মহান আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে, আর তখনই জানতে পারবে যে, একমাত্র তিনিই (মহান আল্লাহ) তাদের ও তাদের মনোহারীদের মধ্যে মৃত্যুর মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করেন।

শাফায়াতের তাৎপর্য ঃ

শাফায়াত যা شفع প্রকৃতি থেকে, জোড়া বা 'যুগল' অর্থে গৃহীত হয়েছে। সাধারণের কথোপকথনে এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় যে, কোন সম্মানিত ব্যক্তি তার সম্মানের বিনিময়ে কোন অপরাধীকে তার শাস্তি থেকে নিস্কৃতি দিতে চায় অথবা কোন সেবকের পুরস্কার বৃদ্ধি করতে চায়। সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রে শাফায়াত শব্দের ব্যবহারের কারণ হল এই যে , অপরাধী ব্যক্তির একাকী, ক্ষমালাভের যোগ্যতা নেই অথবা সেবকের একাকী বর্ধিত পুরষ্কারলাভের যোগ্যতা নেই; কিন্তু সুপারিশকারী বা শাফী'র (شفيع) সাথে প্রাগুক্তদের যুগল আবেদনের কারণে এ যোগ্যতা অর্জিত হয় ।

প্রচলিত নিয়মে, যে ব্যক্তি সুপারিশকারীর সুপারিশ গ্রহণ করেন, তা এ কারণে করেন যে, তিনি ভয় করেন যদি সুপারিশ গ্রহণ না করেন তবে সুপারিশকারী বিব্রত বোধ করবেন। আর এ বিব্রতবোধের ফলে তার (সুপারিশকারীর) আন্তরিকতা ও সেবা থেকে সুপারিশ গ্রহণকারী বঞ্চিত হতে পারেন বা তার পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। মুশরিকরা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তাকে মানবীয় গুণে গুণান্বিত করে থাকেন । যেমন ঃ মনে করেন যে স্ত্রীর ভালবাসা, বিদূষক, সাহায্যকারী ও সহকারীর প্রয়োজন অথবা মনে করেন যে সৃষ্টিকর্তা অংশীদার ও সহকর্মীদের ভয়ে ভীত হন। তারা মহান আল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে কিংবা তাঁর রোষানল থেকে মুক্তিলাভের জন্যে কল্পিত খোদাদের আঁচলে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন এবং ফেরেশ্তা ও জিন্নদের পূজা-অর্চনায় আত্মনিয়োগ করেন; মূর্তি ও প্রতীমার নিকট শির নত করে, আর বলে ঃ

هؤلاء شفعاؤنا عند الله

এরাই আল্লাহর নিকট আমাদের জন্যে সুপারিশকারী। (ইউনুস-১৮)[৪]

কিংবা বলে ঃ

ما نعبدهم الاّ ليقرّبونا الى الله زلفى

আমরা তো এদের পূজা এই জন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে। (যুমার- ৩)

পবিত্র কোরান এ ধরনের অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণার জবাবে বলে ঃ

ليس لها من دون الله ولى و لا شفيع

আল্লাহ ব্যতীত তার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না। (আনয়াম- ৭০)

কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এ ধরনের সুপারিশকারী ও তার সুপারিশ অস্বীকার করার অর্থ চূড়ান্তরূপে সুপারিশের অস্বীকৃতি নয়। বরং পবিত্র কোরানে আল্লাহর অনুমতিক্রমে সুপারিশের স্বপক্ষে অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া সুপারিশকারী ও সুপারিশভুক্তদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আর অনুমোদিত সুপারিশকারীদের সুপারিশ মহান আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত হবে। তাদের (শাফায়াতকারীদের) ভয়ে ভীত হওয়ার কারণে কিংবা তাদের নিকট ঋণী বলে নয়, বরং এটা এমন এক মাধ্যম, যা মহান আল্লাহ তাঁর ঐ সকল বান্দাদের জন্যে উন্মুক্ত করেছেন যারা তাঁর পক্ষ থেকে ন্যূনতম করুণা লাভের যোগ্যতা রাখেন। আর এ জন্যে শর্ত ও মানদণ্ডসমূহও নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সঠিক সুপারিশ ও অংশীবাদী সুপারিশের প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য সেরূপই, যেরূপ পার্থক্য মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে বিলায়াত বা পরিচালনার বিশ্বাস ও স্বাধীনভাবে পরিচলানার বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে খোদাপরিচিতি পর্বে বর্ণিত হয়েছে[৫]।

শাফায়াত শব্দটি কখনো কখনো আরও বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং সকল কল্যাণকর্ম, যা অপরের জন্যে মানুষ কর্তৃক সম্পাদিত হয়, তাকেও

৪। অনুরূপ রূম- ১৩, আনয়াম- ৯৪, যুমার- ৪৩ দ্রষ্টব্য ।

৫। খোদাপরিচিতি, পাঠ- ১৬।

সমন্বিত করে। যেমন ঃ পিতা-মাতা সন্তানের জন্যে, কিংবা সন্তান পিতা-মাতার জন্যে যা করে থাকে। অনুরূপ শিক্ষক বা সতর্ককারী ছাত্রদের জন্যে, এমনকি মুয়ায্যিন তাদের জন্যে যা করে থাকেন, যারা তার আযান শুনে নামাযের কথা স্মরণ করতঃ মসজিদে গিয়ে থাকেন, এর সবই হল শাফায়াত। প্রকৃতপক্ষে যে সকল কল্যাণকর্ম পার্থিব জীবনে সম্পন্ন করা হয়েছে, তা-ই পরকালে শাফয়াতরূপে ও পথের দিশারূপে আত্মপ্রকাশ করে ।

অপর একটি বিষয় হল ঃ পাপীদের জন্যে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করাও এ পৃথিবীতে এক ধরনের শাফায়াত। এমনকি অপরের জন্যে দোয়া করা এবং তাদের অভাব পূরণ করার জন্যে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করাও প্রকৃতার্থে মহান আল্লাহর নিকট থেকে শাফায়াত বলে পরিগণিত হয়। কারণ এগুলোর সবকটিই অন্যের কল্যাণকরণ ও তাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষাকরণের জন্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মাধ্যমরূপে পরিগণিত হয় ।

শাফায়াতের মানদণ্ড ঃ

যেমনটি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, শাফায়াতলাভ ও শাফায়াতকরণের জন্যে মূল শর্ত, মহান আল্লাহর অনুমতি লাভ করা। যেমন ঃ পবিত্র কোরানে বর্ণিত হয়েছে ঃ

من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه

কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে ?" (সূরা বাকারা - ২৫৫)

ما من شفيع الا من بعد اذنه

তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই। (সূরা ইউনুস- ৩)

يومئذ لا تنفع الشّفاعة ا لا من اذن له الرّحمن رضى له قولا

দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত, কারও সূপারিশ সেই দিন, কোন কাজে আসবে না । (তোহা- ১০৯)

ولا تنفع الشّفاعة عنده الا لمن اذن له

যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। (সাবা- ২৩)

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে সামগ্রিকভাবে 'প্রভুর অনুমতির' শর্তটি প্রমাণিত হয়। কিন্তু অনুমতি প্রাপ্তদের শর্ত ও বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রমাণিত হয় না। তবে অন্যান্য আয়াতসমূহ থেকে দু'পক্ষের জন্যেই শর্তসমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় । যেমন ঃ

ولا يملك الّذين يدعون من دونه الشّفاعة الاّ من شهد بالحقّ وهم يعلمون

আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে তার সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত। (যুখরুক- ৮৬)

সম্ভবতঃ من شهد بالحقّ এ সাক্ষি বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা প্রভুর জ্ঞান ও শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের আমলসমূহ ও নিয়্যাতসমূহ সম্পর্কে অবগত হতে পারেন এবং তাদের আচরণের প্রকৃতি ও মূল্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারেন। যা হোক উল্লেখিত বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্ক থেকে আমরা পাই ঃ শাফায়াতকারীগণকে এমন জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে যে, শাফায়াত লাভের জন্যে মানুষের যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে সক্ষম। আর নিশ্চতরূপে যারা এ দু'শর্তের অধিকারী হয়েছেন তাদের অন্যতম হলেন মাসুমগণ (আঃ)।

অপরদিকে অন্য কিছু আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, শাফায়াত লাভকারীদেরকে মহান আল্লাহর প্রিয়ভাজন হতে হবে । যেমন ঃ

ولا يشفعون الاّ لمن ارتضى

তাঁরা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্যে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। (সূরা আম্বিয়া-২৮)

وكم من ملك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيئًا الاّ من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى

আকাশে কত ফেরেশ্তা আছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (নাজম- ২৬)

স্পষ্টতঃই শাফায়াতলাভকারীকে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হতে হবে। এর অর্থ এ নয় যে, তার সকল কর্মই মহান আল্লাহর পছন্দ অনুযায়ী হবে। তাহলে তো শাফায়াতের কোন প্রয়োজনই ছিল না। বরং দ্বীন ও ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বয়ং ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট অর্থে বুঝানো হয়েছে; যেভাবে হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে ।

অপরপক্ষে কিছু কিছু আয়াতে, যারা শাফায়াতলাভের যোগ্য নয় তাদের কথাও বর্ণিত হয়েছে । যেমন ঃ পবিত্র কোরানে মুশরিকদের কথা উল্লেখ করতে যেয়ে বলা হয় ঃ

فما لنا من شافعين

পরিণামে, আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। (শুয়ারা- ১০০)

এবং সূরা মুদাছ্ছিরের (৪০-৪৮) নং আয়াতে অপরাধীদের দোযখে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে (অপরাধীদেরকে) প্রশ্ন করা হলে তারা উত্তরে নামাযত্যাগ,[১] দুস্থ মানবতাকে সাহায্য না করা ও বিচার দিবসকে অস্বীকার করার মত বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা উল্লেখ করে। অতঃপর বলা হয় ঃ

فما تنفعهم شفاعة الشّافعين

ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবেনা।

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, মুশরিক ও ক্বিয়ামতকে অস্বীকারকারীরা, যারা মহান আল্লাহর ইবাদত করে না, অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য করে না ও সঠিক নীতিতে বিশ্বাস করে না, তারা কখনোই শাফায়াত লাভ করবে না । নবী (সঃ)-এর পক্ষ থেকে ইস্তিগফারও এ পৃথিবীতে এক প্রকার শাফায়াত বলে পরিগণিত হয় এবং তাঁর ইস্তিগফার, যারা তাঁর নিকট ইস্তিগফার ও শাফায়াতের আবেদন জানাতে অপ্রস্তুত তাদের জন্যে গ্রহণযোগ্য হবে না[২] –এর আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, শাফায়াতকে অস্বীকারকারীরাও শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়; যেমনটি হাদীসেও এসেছে [৩]।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, প্রকৃত ও চূড়ান্ত শাফায়াতকারীকে মহান আল্লাহর অনুমোদন প্রাপ্তি ছাড়াও স্বয়ং পাপাচারী হতে পারবেন না এবং তাঁকে অপরের আনুগত্য ও পাপাচারের সঠিক

---

[১]। ইমাম সাদিক (আঃ) তাঁর পবিত্র জীবনের অন্তিম মুহূর্তে বলেন ঃ আমাদের শাফায়াত তাদের জন্য নয় যারা নামাযকে লঘুভাবে নেয় । (বিহারুল আনওয়ার থেকে)

[২]। মুনাফিকুন ৫-৬।

[৩]। নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যারা আমার শাফায়াতে বিশ্বাস করে না মহান আল্লাহ তাদেরকে আমার শাফায়াতের অন্তর্ভূক্ত করবেন না (বিহার খঃ ৮)

মূল্যায়ন করার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। আর এ ধরনের ব্যক্তিদের (শাফী) সঠিক অনুসারীরাও তাঁর আলোকে সীমিত মাত্রার শাফায়াতকরণের অধিকারী হতে পারেন। যেমন ঃ শহীদ ও সিদ্দীকীনের মত তাঁর অনুসারীগণ এ যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হবেন।[১] অপরদিকে যারা মহান আল্লাহর অনুমতি ছাড়াও মহান অল্লাহ, তাঁর নবীগণ (আঃ) এবং যা কিছু মহান আল্লাহ তাঁর পরগাম্বরগণের (আঃ) প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যেমন ঃ শাফায়াত ইত্যাদির প্রতি সঠিক বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করবেন, আর এ বিশ্বাস, আমৃত্যু সংরক্ষণ করবেন, তারাই শাফায়াতলাভের যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন ।

---

[১]। যারা আল্লাহ ও তাঁর নবীগণের প্রতি ঈমান এনেছে তারা তাহাদের প্রভুর নিকট সত্যবাদী ও শহীদ বলে পরিগণিত হবেন। (সূরা হাদীদ – ১৯)

পাঠ - ২০

কয়েকটি সমস্যার সমাধান

- শাফায়াতকে প্রত্যাখ্যানকারী আয়াতসমূহের উপর আলোচনা
- মহান আল্লাহ্ শাফায়াতকারীগণ কর্তৃক প্রভাবিত হবেন না
- শাফায়াতকারীগণ মহান আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর দয়ালু নন
- শাফায়াত মহান আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতার পরিপন্থী নয়
- শাফায়াত আল্লাহর নিয়মের ব্যতিক্রম নয়
- শাফায়াতের প্রতিশ্রুতি মানুষের ঔদ্ধত্যের কারণ নয়
- শাফায়াতলাভের অধিকার অর্জনের জন্যে শর্তসমূহের যোগান হল সৌভাগ্য অর্জনের পথে প্রচেষ্টা

শাফায়াত সম্পর্কে একাধিক সমস্যা ও প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। আমরা আলোচ্য পাঠে এ অনুপপত্তিগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির উপস্থাপন ও জবাব দেয়ার চেষ্টা করব।

অনুপপত্তি –১ ঃ পবিত্র কোরানের বেশ কিছু আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিবসে কারও সম্পর্কেই সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। যেমন ঃ

وا تقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون

তোমরা সেইদিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না এবং কারও সুপারিশ স্বীকৃত হবে না এবং কারও নিকট হতে ক্ষতিপুরণ গৃহিত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না । (বাকারা- ৪৮)

জবাব ঃ প্রাগুক্ত ধরনের আয়াতসমূহ স্বাধীন ও শর্তহীন শাফায়াতকে অস্বীকার করণার্থে অবতীর্ণ হয়েছিল, যাতে কেউ কেউ বিশ্বাসী ছিল। এ ছাড়া উল্লেখিত আয়াতটি হল সর্ব সাধারণ অর্থের অধিকারী, যা আল্লাহর অনুমতিক্রমে ও নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে, শাফায়াতের স্বপক্ষে বর্ণিত আয়াতসমূহ কর্তৃক সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে; যেমনটি পূর্ববর্তী পাঠে ইঙ্গিত করা হয়েছে ।

অনুপপত্তি–২ ঃ শাফায়াতের বৈধতার অপরিহার্য অর্থ হল, মহান আল্লাহ শাফায়াতকারীগণ কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ তাদের শাফায়াতই ক্ষমা লাভের (যা একমাত্র মহান আল্লাহরই অধিকার) কারণ হয়ে থাকবে।

জবাব ঃ শাফায়াত বা সুপারিশ গ্রহণ করার অর্থ প্রভাবিত হওয়া নয়। যেমন ঃ তওবাহ্ ও দোয়া কবুলকরণের সাথে এ ধরনের আবশ্যকতা বিবেচনা করা সঠিক নয়। কারণ এ বিষয়গুলোর মধ্যে সবকটি ক্ষেত্রেই বান্দাদের কর্মই আল্লাহর করুণা বা রহমত বর্ষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অর্থাৎ পারিভাষিক অর্থে বলা হয় ঃ "যোগ্যের যোগ্যতার শর্তাধীন , কর্তার কর্তৃত্বের শর্তাধীন নয়।"

অনুপপত্তি-৩ ঃ শাফায়াতের অপরিহার্য অর্থ হল এই যে, শাফায়াতকারীগণ মহান আল্লাহ অপেক্ষা বেশী দয়ালু ! কারণ ধারণা করা হয় যে, যদি তাদের শাফায়াত না থাকত, তবে পাপীরা আযাবে পতিত হত কিংবা তাদের প্রতি আযাব অব্যাহত থাকত ।

জবাব ঃ শাফায়াতকারীগণের দয়া বা করুণা হল মহান আল্লাহরই অসীম রহমতের আলোকচ্ছটা অর্থাৎ শাফায়াত হল, এমন এক মাধ্যম, যা মহান আল্লাহ স্বয়ং তাঁর পাপিষ্ঠ বান্দাদেরকে ক্ষমা করার জন্যে নির্ধারণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শাফায়াতের অবস্থান হল প্রভুর করুণাময় জ্যোতির শীর্ষতম পর্যায়ে, যা তাঁর নির্বাচিত ও যোগ্য বান্দাগণের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে। যেমন ঃ দোয়া, তাওবাহ্ ও চাহিদার যোগানও ক্ষমাপ্রাপ্তির অন্য এক মাধ্যম, যা মহান আল্লাহই মানুষের জন্যে উম্মুক্ত রেখেছেন ।

অনুপপত্তি–৪ ঃ অপর একটি সমস্যা হল এই যে, যদি পাপিষ্ঠদের শাস্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার দাবী হয়ে থাকে, তবে তাদের (পাপিষ্ঠদের) সুপারিশ গ্রহণ করা হল ন্যায়পরায়ণতার ব্যতিক্রম। যদি শাস্তি থেকে অব্যাহতি দান (যা শাফায়াত গ্রহনের ফল) ন্যায়ভিত্তিক হয়ে থাকে, তবে শাস্তির আদেশ (যা শাফায়াতের পূর্বে ছিল) হবে অন্যায় কর্ম।

জবাব ঃ প্রভুর প্রত্যেকটি আদেশই (হোক সে শাস্তি শাফায়াতের পূর্বে কিংবা হোক সে শাফায়াতের পর শাস্তি থেকে মুক্তি দান) ন্যায় ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং উভয় ক্ষেত্রেই প্রজ্ঞা ও ন্যায়ভিত্তিক হওয়ার অর্থ পরস্পর বিপরীতের সমন্বয় নয়। কারণ ঐগুলোর উদ্দেশ্য (موضوع) বা ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। অর্থাৎ শাস্তির আদেশ হল, গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ফল , যা গুণাহগারদের ক্ষেত্রে শাফায়াত ও এর গ্রহণযোগ্যতার কারণের দাবীকে অগ্রাহ্য বা বিবেচনা না করে প্রদান করা হয়। আর শাস্তি থেকে অব্যাহতি প্রদান হল উল্লেখিত কারণের দাবীর বহিঃপ্রকাশ। তা ছাড়া উদ্দেশ্যের (موضوع) পরিবর্তনে বিধেয়ের (حکم) পরিবর্তনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা প্রকৃতি জগতে সৃষ্টির নিয়মে ও বিধিগত নিয়মে লক্ষ্য করে থাকি। অনুরূপ যথাসময়ে রহিত আদেশের ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারটি রহিতকরণের পর রহিতকারী আদেশের ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার সাথে কোন বিরোধ রাখে না। তদনুরূপ দোয়া বা সদকার পূর্বে বালা বা দুর্যোগ নির্ধারিণের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়তা, দোয়া বা সাদকার পর তা অপসৃত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়তার সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না।

সুতরাং শাফায়াতের পর পাপের ক্ষমাকরণও, শাফায়াতের পূর্বে শাস্তির আদেশের সাথে কোন বিরোধ রাখে না।

অনুপপত্তি-৫ ঃ মহান আল্লাহ শয়তানের অনুসরণকেই অপ্রত্যাশিত নরকযন্ত্রণা ভোগের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন । যেমন ঃ

انّ عبادي ليس لك عليهم سلطان الاّ من اتبعك من الغاوين وانّ جهنّم لموعدهم اجمعين

> বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না; অবশ্যই তোমার অনুসারীদের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম। (হিজর- ৪২, ৪৩)

প্রকৃতপক্ষে পরকালে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান, প্রভুর নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত এবং প্রভুর নিয়মে কোন পরিবর্তন নেই। যেমন ঃ পবিত্র কোরানে বলা হয় ঃ

فلن تجد لسنة الله تبديلا و لن تجد لسنّة الله تحويلا

> কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কখনো কোন পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখবে না। (ফাতির- ৪৩)

অতএব শাফায়াতের মাধ্যমে কিরূপে প্রভুর এ নিয়ম ভঙ্গ করা সম্ভব ?

জবাব ঃ পাপীদের জন্যে শাফায়াতগ্রহণ করা মহান আল্লাহর অপরিবর্তনশীল নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত। এর ব্যাখ্যা হল ঃ প্রভুর নিয়ম বাস্তব মানদণ্ড ও মাপকাঠির অনুগামী এবং কোন নিয়মই এর বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতার শর্ত ও কারণের উপস্থিতিতে পরিবর্তন যোগ্য নয়। কিন্তু যে সকল বক্তব্য এ সকল নিয়মের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে, সে গুলো সাধারণতঃ উদ্দেশ্যের (موضوع) বিভিন্ন শর্তের অবতারণা সর্বদা করে না। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে এমনটি দেখতে পাওয়া যায় যে, সংশ্লিষ্ট আয়াতের অর্থে একাধিক নিয়মের কথা উল্লেখ থাকে, যদিও প্রকৃতপক্ষে আয়াতের দৃষ্টান্ত হল স্বতন্ত্রতম কোন বিষয়, যা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী মানদণ্ডের অনুগামী। অতএব সকল নিয়মই এর উদ্দেশ্যের বাস্তব শর্তের ভিত্তিতে (কেবলমাত্র ঐ সকল শর্তসাপেক্ষেই নয় যা বক্তব্য বা বিবৃতিতে এসেছে) অপরিবর্তনশীল ও অনঢ় । যেমন ঃ শাফায়াত, যা বিশেষ ধরনের পাপীদের ক্ষেত্রে অপরবর্তনীয় ও অলংঘনীয় নিয়ম, যারা নির্দিষ্ট শর্তের অধিকারী ও নির্দিষ্ট মানদণ্ডের আওতাধীন ।

অনুপপত্তি -৬ ঃ শাফায়াতের প্রতিশ্রুতি, বিচ্যুতি ও পাপাচাবে লিপ্ত

হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের ঔদ্ধত্য ও সাহস বৃদ্ধি করে ।

জবাব ঃ এ সমস্যাটি, তাওবাহ্গ্রহণ ও পাপ মোচনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এর জবাব হল ঃ শাফায়াত ও ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত হওয়া এমন কিছু শর্তের শর্তাধীন যে, পাপাচারী ঐগুলো অর্জনের ব্যাপারে নিশ্চিত আস্থা জ্ঞাপন করতে পারে না। যেমন ঃ শাফায়াতের শর্তসমূহের মধ্যে একটি হল এই যে, ব্যক্তি জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত স্বীয় বিশ্বাস বা ঈমানের সংরক্ষণ করবে। আর কারো পক্ষেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। অপর দিকে যে ব্যক্তি কোন পাপাচারে লিপ্ত হল, যদি সে তার জন্যে ক্ষমা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রত্যাশাই না করতে পারে, তবে সে হতাশা ও নিরাশার জালে ধরা পড়বে। আর এ হতাশাই তার পাপকর্ম পরিত্যাগের প্রবণতাকে দুর্বল করে, তাকে বিচ্যুতি ও ভ্রান্তির পথে পরিচালিত করবে। এ কারণেই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত শিক্ষকগণের পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণের নিয়ম হল, মানুষকে সর্বদা আশা ও ভয়ের মাঝে রাখা – কেবলমাত্র রহমত ও করুণার ব্যাপারে আশ্বস্ত না করা, যার ফলে সে প্রভুর রোষানল থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে (امن) কিংবা কেবলমাত্র আযাবের ভয় প্রদর্শন না করা, যা প্রভুর করুণা থেকে তাদেরকে নিরাশ করে ফেলবে। আর আমরা জানি যে, প্রভুর রহমত থেকে নিরাশ ও হতাশ হওয়া মহাপাপ বলে পরিগণিত হয় ।

অনুপপত্তি–৭ ঃ শাস্তি থেকে মুক্তিদানের ক্ষেত্রে শাফায়াতের ভূমিকার অর্থ হল সৌভাগ্য ও দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তির ব্যাপারে অপরের (শাফায়াতকারী) কর্মের প্রভাব। অথচ নিম্নলিখিত আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাই যে, একমাত্র স্বীয় চেষ্টা ও শ্রমই, ব্যক্তিকে সৌভাগ্যশালী করে।

وان ليس للانسان الا ما سعي

এবং নিশ্চয়ই মানুষের জন্যে তার শ্রম ব্যতীত কিছুই নেই।

জবাব ঃ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও শ্রম কখনো কখনো প্রত্যক্ষভাবে সম্পন্ন হয় এবং পথের প্রান্তরেখা পর্যন্ত চলতে থাকে। আবার কখনো কখনো পরোক্ষভাবে সম্পন্ন হয় এবং শর্ত ও মাধ্যমের যোগান পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যে ব্যক্তি শাফায়াত লাভের অন্তর্ভুক্ত হয়, সে-ও সৌভাগ্যের সোপানে উন্নীত হওয়ার জন্যে প্রচেষ্টা ও শ্রম দিয়ে থাকে। কারণ ঈমান আনা ও

শাফায়াতলাভের শর্তাধীন যোগ্যতা অর্জন করা, সৌভাগ্যের পথে পৌঁছার জন্যে প্রচেষ্টা বলে পরিগণিত হয়, যদিও হোক সে প্রচেষ্টা আংশিক ও অপ্রতুল। আর এ কারণেই (কোন কোন শাফয়াতলাভকারী) বারযাখ ও পুনরুত্থানের ময়দানে কিছুটা কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করবে। কিন্তু যে কোন ভাবেই হোক না কেন, স্বয়ং ব্যক্তিই সৌভাগ্যের মূল, স্বীয় হৃদয়পটে বপন করেছে এবং কখনো কখনো স্বীয় সুকর্মের মাধ্যমে তাতে পানি সরবরাহ করেছে, যাতে পার্থিব জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত তা শুকিয়ে না যায়। অতএব চূড়ান্ত সৌভাগ্য, তার শ্রম ও প্রচেষ্টার সাথেই সম্পর্কিত, যদিও শাফায়তকীরগণও ঐ বৃক্ষেকে ফলপ্রসূকরণের ক্ষেত্রে এক প্রকার ভূমিকা রেখে থাকেন। যেমন ঃ এ পৃথিবীতেও কেউ কেউ অপরের হিদায়াত ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে থাকেন। কিন্তু তাই বলে তাদের ভূমিকা ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও শ্রমকে অগ্রাহ্য করে না।

সমাপ্ত